

તાણાશ્રુત જાતકાલ



મજા  
મજા

boiRati.net

૪૧૫

# ଅଜ୍ଞାତ ଅପରାଧ

[ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶନ (୧୯୭୫) 'ଅପରାଧ'ର  
ପରିଚାଳିତ ଓ ପରିସଂସ୍କୃତ ରୂପାନ୍ତର ]



ନାରାୟଣ ସାହୁ

୧: ୧୫, ୧୯୮୫

୧୫

୧

boiRboi.net

ଭାରତୀ ବୁକ୍ ଷ୍ଟଲ

ପ୍ରକାଶକ ଓ ମୁଦ୍ରକ-ମିତ୍ରତା

ଓ, ବରାକାସ୍ ମହାବଳୀ ମୁଣ୍ଡି

କଟକ-୨

মুদ্রানুষ্ঠান প্রথম প্রকাশ . আশ্বিন, ১৩৮০

সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬

দ্বিতীয় মুদ্রণ : কার্তিক, ১৩৮৬

মার্চ, ১৯৮০

তৃতীয় মুদ্রণ : কার্তিক ১৩৯০

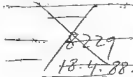
জানুয়ারি ১৯৮০

এই গ্রন্থের প্রচলনকাল ১৯৬৬ ১৯৭৬

১) প্রতীকিত্ব বান্ধা

মুদ্রা : চিত্র প্রকাশ

কলকাতা-১



M.B.S. PATHAGAR

Accn No. 4237

Call No. \_\_\_\_\_

প্রকাশক শ্রীমদ্বৈকেশ চারিত্রিক  
৬ বনানীপথ মধ্যস্থিত পল্লী  
কলিকাতা-১

মুদ্রক শ্রীমদ্বৈকেশ চারিত্রিক  
আলমদা প্রিন্টার্স, কলিকাতা-১

প্রচলন বৈশাখ-নারায়ণ বান্ধা  
৪৬-প্রতীকিত্ব মাধ্যম  
মুদ্রক-প্রিন্টার্স আর্ট  
কলিকাতা-১

boiRboi.net

# নিবন্ধ

ক্রম নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা	ক্রম নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা
১	অনুষ্ঠান প্যাস	২	৩৬	মোট পৃষ্ঠার প্যাস	৮০
২	প্রথম পৃষ্ঠার ক্রিডাংশের শেষ	৯	৩৯	সিদ্ধান্তের সিদ্ধান্ত—16/2A, B	৮৮
৩	অন্যদের বিশেষণ শেষ	১০	৪০	ঐ স্থানান্তরিত পৃষ্ঠা	
৪	প্রথম পৃষ্ঠার প্যাস	১২	16/2c		৮৯
৫	সম্পাদক জাতক 1/1	১৬	৪১	মজার ঐ প্রকল্পের—16/3F	১০০
৬	মজার জাতক 1/2A	২৫	৪২	সম্পাদক প্যাস	১০০
৭	মজার জাতক 1/2D	২৬	৪৩	উল্লিখিত মজার প্যাস—17/4	১০৯
৮	মজার জাতক		৪৪	কল প্যাস—17/8	১০৭
৯	মজার জাতক 1/7A	২৮	৪৫	মজার প্যাস—17/7	১০৯
১০	মজার জাতক 1/8	৩০	৪৬	মজার জাতক—17/10	১১১
১১	মজার জাতক 1/10	৩২	৪৭	মজার জাতক—17/11	১১০
১২	মজার জাতক 1/15	৩৪	৪৮	মজার জাতক—17/12	১১৫
১৩	মজার জাতক 1/21	৩৬	৪৯	ঐ প্রকল্পের—17/12	১১৫
১৪	মজার জাতক	৩৮	৫০	প্রকল্পের প্রকল্প	
১৫	ঐ প্রকল্প ও প্রকল্প	৪০	17/13		১১৭
১৬	মজার জাতক	৪১	৫১	মজার জাতক, মজার	
১৭	মজার জাতক 2/2C	৪৩	17/12C		১১১
১৮	মজার জাতক 2/2D	৪৫	৫২	ঐ প্রকল্পের মজার 17/14F	১২০
১৯	মজার জাতক 2/11	৪৬	৫৩	ঐ প্রকল্পের মজার	
২০	মজার জাতক 2/12	৪৮	17/14D		১২১
২১	মজার জাতক 2/13	৫০	৫৪	ঐ প্রকল্পের মজার 17/20	১২০
২২	মজার জাতক 2/14	৫২	৫৫	মজার জাতক ১২/১১	১২১
২৩	মজার জাতক 2/15	৫৪	৫৬	মজার জাতক ও মজার	
২৪	মজার জাতক 2/16	৫৬	17/24		১০২
২৫	মজার জাতক 2/17	৫৮	৫৭	মজার ও মজার 17/24	১০২
২৬	মজার জাতক 2/18	৬০	৫৮	মজার জাতক 17/25	১০১
২৭	মজার জাতক 2/19	৬২	৫৯	মজার জাতক ১৭/২৬	১০০
২৮	মজার জাতক 2/20	৬৪	৬০	মজার জাতক ১৭/২৬	১০১
২৯	মজার জাতক 2/21	৬৬	৬১	মজার জাতক ১৭/২৬	১০১
৩০	মজার জাতক 2/22	৬৮	৬২	মজার জাতক ১৭/২৬	১০১
৩১	মজার জাতক 2/23	৭০	৬৩	মজার জাতক ১৭/২৬	১০১
৩২	মজার জাতক 2/24	৭২	৬৪	মজার জাতক ১৭/২৬	১০১
৩৩	মজার জাতক 2/25	৭৪	৬৫	মজার জাতক ১৭/২৬	১০১
৩৪	মজার জাতক 2/26	৭৬	৬৬	মজার জাতক ১৭/২৬	১০১
৩৫	মজার জাতক 2/27	৭৮	৬৭	মজার জাতক ১৭/২৬	১০১
৩৬	মজার জাতক 2/28	৮০	৬৮	মজার জাতক ১৭/২৬	১০১
৩৭	মজার জাতক 2/29	৮২	৬৯	মজার জাতক ১৭/২৬	১০১
৩৮	মজার জাতক 2/30	৮৪	৭০	মজার জাতক ১৭/২৬	১০১
৩৯	মজার জাতক 2/31	৮৬	৭১	মজার জাতক ১৭/২৬	১০১
৪০	মজার জাতক 2/32	৮৮	৭২	মজার জাতক ১৭/২৬	১০১

স্মারক

কিউ-নং/নাম	বিষয়	পৃষ্ঠা	কিউ-নং/নাম	বিষয়	পৃষ্ঠা
৭৫	স্বাধীন বাংলা	১৫৮	১০১	স্বাধীন বাংলা চিত্রনাট্যের বিবরণ	১৫৯
৭৬	চলিত কবিতা	১৬০	১০২	কবিপ্রতিভা - পঞ্চদশ দৃষ্টান্ত	১৬০
৭৭	চলিত কবিতার সংগ্রহ	১৬০	১০৩	ঐ - পঞ্চদশদশক	১৬০
৭৮	চলিত কবিতার সংগ্রহ	১৬০	১০৪	স্মারক কবিতার সংগ্রহ	১৬০
৭৯	চলিত কবিতার সংগ্রহ	১৬০	১০৫	ঐ - পঞ্চদশ দৃষ্টান্ত	১৬০
৮০	চলিত কবিতার সংগ্রহ	১৬০	১০৬	ঐ - পঞ্চদশ দৃষ্টান্ত	১৬০
৮১	চলিত কবিতার সংগ্রহ	১৬০	১০৭	ঐ - পঞ্চদশ দৃষ্টান্ত	১৬০
৮২	চলিত কবিতার সংগ্রহ	১৬০	১০৮	চলিত কবিতার সংগ্রহ	১৬০
৮৩	চলিত কবিতার সংগ্রহ	১৬০	১০৯	চলিত কবিতার সংগ্রহ	১৬০
৮৪	চলিত কবিতার সংগ্রহ	১৬০	১১০	চলিত কবিতার সংগ্রহ	১৬০
৮৫	চলিত কবিতার সংগ্রহ	১৬০	১১১	চলিত কবিতার সংগ্রহ	১৬০
৮৬	চলিত কবিতার সংগ্রহ	১৬০	১১২	চলিত কবিতার সংগ্রহ	১৬০
৮৭	চলিত কবিতার সংগ্রহ	১৬০	১১৩	চলিত কবিতার সংগ্রহ	১৬০
৮৮	চলিত কবিতার সংগ্রহ	১৬০	১১৪	চলিত কবিতার সংগ্রহ	১৬০
৮৯	চলিত কবিতার সংগ্রহ	১৬০	১১৫	চলিত কবিতার সংগ্রহ	১৬০
৯০	চলিত কবিতার সংগ্রহ	১৬০	১১৬	চলিত কবিতার সংগ্রহ	১৬০
৯১	চলিত কবিতার সংগ্রহ	১৬০	১১৭	চলিত কবিতার সংগ্রহ	১৬০
৯২	চলিত কবিতার সংগ্রহ	১৬০	১১৮	চলিত কবিতার সংগ্রহ	১৬০
৯৩	চলিত কবিতার সংগ্রহ	১৬০	১১৯	চলিত কবিতার সংগ্রহ	১৬০
৯৪	চলিত কবিতার সংগ্রহ	১৬০	১২০	চলিত কবিতার সংগ্রহ	১৬০
৯৫	চলিত কবিতার সংগ্রহ	১৬০	১২১	চলিত কবিতার সংগ্রহ	১৬০
৯৬	চলিত কবিতার সংগ্রহ	১৬০	১২২	চলিত কবিতার সংগ্রহ	১৬০
৯৭	চলিত কবিতার সংগ্রহ	১৬০	১২৩	চলিত কবিতার সংগ্রহ	১৬০
৯৮	চলিত কবিতার সংগ্রহ	১৬০	১২৪	চলিত কবিতার সংগ্রহ	১৬০
৯৯	চলিত কবিতার সংগ্রহ	১৬০	১২৫	চলিত কবিতার সংগ্রহ	১৬০

কুন্ড ব্যক্তিগত পাঠাগার



www.Banglaclassicbooks.blogspot.in

## কৈফিয়ৎ

অলসতা দেখে এসে ‘অপরূপা অলসতা’ রচনা করতে আমার তিন বছর সময় লেগেছিল। আমি অলসতা দর্শন করি ১৯৬৫-তে এক ‘অপরূপা অলসতা’র প্রথম প্রকাশ ১৯৬৮-তে। সে-প্রশ্নের ভূমিকার আমি কৈফিয়তে বলেছিলাম, ‘সেবাস্তোভেরাও যেখানে সন্তপণ পদসঙ্করে সংকুচিত, সেখানে কেন হুড়হুড় করে ঢুকে পড়ছি, অর কৈফিয়ৎ দিতে কসে প্রথমে সেই সেবাস্তোভেরাই কৈফিয়ৎ দাবি করার ইচ্ছা জাগছে। পৃথিবী যদি আজ ভারতবর্ষকে লিঙ্কসে করে জেতার ওখানে কোন স্থাপত্যকীর্তি দেখতে হবে? তাহলে ভারতবর্ষ লাবণ্য বহন—এলসতা-ইলোর, কোথাকর আর তাকমহল। পৃথিবী তাই দেখতে আরও ভারতবর্ষ’ আসে। কিন্তু মৃত্যুত্যা আমাদের, সেই অলসতাকে দেখবার, বোকাবার কোন আরোহন আমরা করিনি। অলসতার প্রতি বছর লক্ষ্যবিন্দু দর্শক আসেন, অলসতার নামে সরকার লক্ষ্যবিন্দু মন্ত্র প্রতি বছর ব্যয় করেন, তবু অলসতা বিঘ্নে প্রকৃত পাইড-ই এখনও ছায়া হয়নি। প্রায় তিন বছর পূর্বে প্রকাশিত ডব্লিউ ইয়াচম্যানির যে গ্রন্থটিকে অলসতা-বিঘ্নে শেষ প্রামাণিক গ্রন্থ করতে পারি, তা দীর্ঘদিন ধাপা নেই; তার মূল্যও সহস্রাবিন্দু সঙ্কটমুক্ত। তুল তথ্য-ভরা কিছু নিম্নমানের পুস্তিকাভরে অলসতার কাছে-পিঠে পাওয়া যায়। ইউনেস্কোর এলসবামে অধ্যাপকসমী-প্রকাশিত চিত্র-সম্প্রদায়ের ছলো-ছলো ছবি আছে; কিন্তু তাদের কোন পরিচয় নেই। কাতক-কাহিনীগুলির মধ্যে ঐ চিত্রগুলির কী লক্ষণ, কোথায় তাদের অবস্থিতি, তা উপলব্ধি করা যায় না। ভার-না-করা ফেলিনি বা বোরিসঝানের চলচিত্র দেখে আপনি-আমি যতটা রস গ্রহণ করতে পারি, পৃথিবী আজ ওলার-হুড়হুড়-ফ্রান্সটালিনের বিনিময়ে শব্দ ততটাই রস আহরণ করে নিলে যায়।’

প্রথম প্রকাশিত ‘অপরূপা-অলসতার’ একটি কপি ঘটনাক্রমে আমাদের জাতীয় অধরপক প্রিন্সিপালিটিকুমের হাতে পড়ে। ঠিক জানি না, যেহেতু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ‘রবীন্দ্র-পুস্তকালয়’ কপিটিই তাকে সেই কপিটি পরিচয় দিয়েছিল। যাই হোক, ঐটি পড়ে তিনি আমাকে ডেকে পানেন এবং আমার গ্রন্থটির সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা করেন। আমার সে বিচিত্র ও দূর্বৃত্ত অভিজ্ঞতার বিবরণ আমার সম্প্রতি প্রকাশিত স্মৃতিচারণগ্রন্থ—‘পঞ্চাশোৎসব’-তে সন্নিবেশিত হয়েছে। পুনরুজ্জ্বল নিশ্চয়কেন। তাঁর নির্দেশ ও উপদেশ অনুসারে গ্রন্থটি আমি পুনর্লিখন করতে শুরু করি ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দেই। সে কাজ সম্পন্ন হতে দীর্ঘ সাত-আট বছর লাগল। যে-সব চিত্র অলসতা-প্রাচীরে বর্তমানে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে প্রথম প্রকাশকালে সেগুলি আমি অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিহার করে গিয়েছিলাম। আচার্য সুনীতিভূষণ আমাকে নির্দেশ যেন—প্রাচীন ও দৃষ্টাপ্য গ্রন্থ অলসতায় সেগুলির অনুলিপি করতে এবং তাদের শৈল্পিক মূল্যায়ন করতে। এ-কথা প্রথম প্রকাশকালে যেখানে চিত্র সংখ্যা ছিল ৬২ বর্তমানে সেখানে চিত্র-সংখ্যা স্ফিট—৯২। তাঁরই নির্দেশে অলসতা স্মৃতিচারণের বিবরণ, অলসতা চিত্রের ব্যাঙ্গ্য, বিলাস, রম্যোন্মাদন, অথবা এগার-শিল্পের পরিপ্রেক্ষিতে অলসতা-প্রকৃতি নতুন পরিচ্ছন্ন সন্মোজন করেছে। যত্নে গ্রন্থের কলসেরও প্রভূত পরিচয়, লক্ষ্যপ্রায় হয়েছে। পরিমার্জন ও পরিবর্তনের অনুসঙ্গা হিসাবে অনেক নতুন চিত্র সংযোজিত হয়েছে। তাই এটিকে একটি নতুন গ্রন্থ বলা যায়। তবু রেক্স-শ্রুতিক্রমে বিভ্রান্ত না হন, ঐই নামকরণে শব্দ বিশেষ-বিশেষের স্থান পরিবর্তনের মাধ্যমেই এর নাম-রূপের পরিচয় সীমাবদ্ধ রেখেছি।

এ-প্রশ্নে আঁকা ছবি সম্বন্ধে কিছু কৈফিয়ৎ আছে। সে-কথা ইতিপূর্বেও বলেছিলাম, আমার সবচেয়ে সঙ্কট, সবচেয়ে আপসোস চিত্রগুলির দ্বারা অনুভবের ব্যর্থতা। এলিস হালদার, নন্দলাল, জরায়ি লাজার, প্রভৃতির আঁকা ছবির পদাশ্রয় আমার স্বেচ্ছ-

গুলিকে দেখে ব্যরে ব্যরে মনে শিবা মেয়েছে—এগুলির রকু আঁকা করলে উচিত ঐক্য। প্রমাণক গ্রন্থ থেকে যত্নে নিয়ে গ্রন্থ করলে প্রায় অসম্ভব, কোন প্রকৃত অধিকারী, চিত্র-শিল্পকে নিয়ে এগুলি অনুকৃত করলে গ্রন্থের মূল্য চতুর্গুণ বৃদ্ধি পায়। তাই সর্বদা নিবেদন করব আমার আঁকা ছবিগুলিকে পাঠক যেন শব্দ নিবেদন-চিত্র বা ইন্ডেক্সের-সদৃশ-রূপেই গ্রহণ করেন। মূলের মতাল না গেলে অন্ততঃ প্রতিকৃতি, ছায়াছবি, ইত্যাদি নিয়ে ইউনেস্কো এলবামে শুল্কে নেবার কোনওই যেন আমার স্বেচ্ছামূলিকে কাজে লাগানো হয়। আমার আঁকা ছবি দেখে মূলচিত্রের চিত্র করলে ফসলে অসম্ভব জো বটেই, আমার উপরেও অধিকার করা হবে।”

প্রধান-পটে শিল্পী শ্রী শৈলেন্দ্র নাথ দত্ত যে বহু-রঙা চিত্রটি এঁকেছেন বাস্তবে তা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তার একটি ক্যবিন জায়গায় শব্দ, পাওয়া যায়। অসম্ভব চিত্রে আমরা সেই মকল্লুও চিত্রটিকে রঙে ও রেখার ভাষায় জোড়ার চেষ্টা করেছি মাত্র। অসলে কোথায় কী রঙ ছিল জানার উপায় নেই।

প্রকাশক গ্রীষ্মকোষ কারিক এবং তার পুত্র শ্রীমান জগদ্র বোভাবে যত্ন নিয়ে গ্রন্থটি ছেপেছেন তাতে তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞতা স্বীকার প্রসঙ্গে আরও একজনের কথা মনে পড়বে। কিন্তু তাহলে আমার একটি অভিজ্ঞতার কথা গল্পের আকারে শোনতে হয় :

এই বইটি রচনার জন্য ইয়াজদানির আট-খণ্ডে প্রকাশিত ছয় খণ্ড কিরণ, চার খণ্ড চিত্রশিল্পের) গ্রন্থটি অপরিহার্য ছিল। জাতীয় গ্রন্থাগারে সেগুলির লম্বাল পেরোছিলো, কিন্তু সে বই বাড়িতে আমার হুকুম নেই। এদিকে আমিও দশটা-পাচটা কাম-শুল্কে কল-বাত-বুই ভরসা। ফলে, কল হল না। অনেক অনুসন্ধানের পর কোনও পট্টের একজন পুত্রের বইয়ের বোকানের মালিক বইগুলির সম্মান দিলেন এবং দাম চাইলেন ‘মোলশ’ টাকা। তা আমার ক্ষমতার বাইরে। তাকে আমার সমস্যার কথা বলে অনুরোধ করলাম, ‘আমি মোলশ টাকা জমা রেখে বইগুলি নিয়ে যাচ্ছি এবং চার মাস পরে বইগুলি ফেরত দেব। আপনি চারশ’ টাকা কেটে রেখে আমাকে ‘কোরোশ’ টাকা ফেরত দেবেন।’ তিনি রাজী হলেন না, বললেন ‘আমি বই বিক্রি করি, ভাড়া খাটেই না।’ আমার উদ্দেশ্য ও অসহায়তার কথা বলিয়েও শুনিয়েও তাঁকে নরম করতে পারলাম না। ঐ ঘটনার মাস কতক পরে ‘এ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস’ ভবনে কথা প্রসঙ্গে লেডী রান্থ মুখোপাধ্যায়কে আমার অভিজ্ঞতার কথা জ্ঞানাই। সেখানে বলি, ‘দেখুন, সে-ভুলোকে পুস্তক বাক্যারী, এ-গেলে গবেষণামূলক গ্রন্থ-রচনা সে করিন, তা তিনি নিশ্চয়ই বোঝেন, তবু আমার প্রস্তাবের তিনি কর্পণাত করছেন না।’ লেডী মুখার্জী সহানুভূতি জ্ঞানিয়ে শব্দ নরকেলে বলেছিলেন, ‘উপায় কি কল্প?’

চার দিন কতক পরে। চাকরটা এসে বললে, আমার বাড়ির পায়নে নাকি একটা প্রকাণ্ড গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে, এবং একজন ভদ্রমহিলা আমার খোঁজ করছেন। দরজা খুলে খোঁজের এসে পৌঁছে তিনিই। বললেন, ‘এই দিন আপনায় বই। জাড়াবুকা নেই।’ আমার ব্যস্ততার সত্ত্বেও। কল শেষ হলে ফেরত দেবেন।

তার মাসেকপুর্বে ব্রাইজার তত্ত্বক্ষেপে আট খণ্ড বইয়ের জুরে ‘বুক স্টেশন’ ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে।

গল্পটি পরিবেশনের পরে কৃতজ্ঞতাচক কোনও ফলত্ব কথা লিখলে হরজো সৌন্দর্যের মর্যাদা রক্ষিত হয়—কিন্তু গল্পটির ‘প্রসার’ ঘটে। তাই গল্পের ব্রাইম্যাক্সেই পুঁথিছেন চীনতে হল।

উনিশ শ' শতাব্দী সালের একটি মনোনিবেশ।

হাস্টা আমাকে অসম্ভব-গুরুত্বপূর্ণের সামনে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল তার গন্তব্য পথে। সে বাস থেকে নামলুম আমি একাই। কী-বগলে বাগিয়ে ধরেছি বোর্ডিং, জান হুতে স্টুটেক্স। কয়েকদিন থাকতে হবে এখানে। হঠাৎ স্থির করেছি সেটা—রিসার্চেশন করানো নেই কোথাও।

গুরুত্বপূর্ণের বক্তব্য খেলে সকাল নয়টা, বসে বসে সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটার। লক্ষ্য করে সোঁপ, ইতিপূর্বেই খস চার-পাঁচ মোটরগাড়ি এসে দাঁড়িয়ে আছে। অর্থাৎ আমার আগেই অনেক এসেছেন আম। কিন্তু ওরা হচ্ছেন সৈনিক-বাহিনী। এসেছেন সবলে ঘিরে যাবেন সম্ভার। আমার তা নয়। প্রথমেই ইচ্ছা পেলাম একটা অস্ত্র খুঁজে নিতে হবে আমাকে। জলদায়ের ট্রান্সপোর্ট অফিসেই খোঁজ পেয়েছি সে, এখানে একটি ট্রান্সপোর্ট-লক্ষ্য সমগ্রসম্পত্ত। ফলে স্থানান্তর হবে না। তাছাড়া গুরুত্বপূর্ণ থেকে মাইন তিনেক গুরে মর্শপুত্রে ডাকবাংলো বা রেন্ট-হাউস আছে। কিন্তু সে-সব জারজার থাকতে হলে আগেভাগে নির্দিষ্ট অনুমতি আনতে হয়। আমার তা নেই। হাস্টা যেখানে গাড়িগো, সেখানে বেশি চমককার একটি স্থিতিশীল বাড়ী। শুনলাম, এটাই নবনির্মিত ট্রান্সপোর্ট-লক্ষ্য। কিন্তু কী মর্শপুত্রে আমার—শোনা গেল, সরকারী খাতিয় বাড়ীটি এখনও বাসোপযোগী বলে নির্দিষ্ট হয় নি। অর্থাৎ মর্শপুত্রে শেষ হলেও বাড়ীসের কি হারে জারজ সেওয়া হবে তার হিসাব এখনও কবে বার করা হয় নি। সমগ্রসম্পত্ত ট্রান্সপোর্ট-লক্ষ্যের জারপ্রাপ্ত ওজারসিয়ারবাবু যথা নেড়ে হিল্লিতে বললেন—আপনাকে এখানে থাকতে দিতে পারছি না বলে আন্তরিক মর্শপুত্রে। তাছাড়া কি বলেন, সেপটিক-ট্যাঙ্কের সঙ্গে স্যানিটারী প্রিভির কনেকশন পাইপটো...

আমি বাধা দিয়ে বলি—সেজন্য কি, চারদিনকেই ডের ফাঁকা মাত।

প্রকল্পভবের মধ্য নেড়ে ওজারসিয়ারবাবু বললেন—মাক্ কিলিরে সাধ। বহু নেহী হো সকাড। যবতক এলিগিন্সার সাধ হুতুম নেহী পেতে—জারপার একটু হেসে বলল : অল্প নেহী জানতে সাধ,—পি, জবল, কি কানুন বহুৎ কড়া হায়।

আমার মুখ দিয়ে অচমক্য বিস্ময় বর্ণনাজা বেরিয়ে গেল—হায়ের কাছে মাসীর গণো আর নাই কাড়লে জাই।

ওজারসিয়ারবাবু বললেন—কম মোলতে হে ?

আমি হে' হে' করে সামলে নিই নিজেকে। হিল্লিতে প্রশ্ন করি, বিন্দু-বিন্দুগের ডাক-বাংলোতে থাকা যাবে ?

: যেতে পারে। চেষ্টা করে দেখুন। কন-বিভাগের এলিগিন্সারের অগ্রাধিকার আছে। ওজারসিয়ারের ডি. এফ. ও পাঠে-সায়েন্সের রিসার্চেশন ছাড়া, তবে হ্যাঁ, ঘর খালি থাকলে চৌকিদার আপনাকে বিদ্যে নাও করতে পরে।

অসম্ভব একটি সোফার মাথার স্টুটেক্স বিছানা চাপিয়ে সৈদিক পানোই রওনা দিই। কন-বিভাগের ডাকবাংলোটি বাকের মুখে। সন্দের ছিমছাম। প্রথম দর্শনেই তার প্রথমে পাতে মেলুম। যেমন কংগ্রেই হোক এখানে রাস্তাবাসের ব্যবস্থা করে নিতে হবে। একটু ইকিহাটিক করতেই চৌকিদার মহাপ্রভু বেরিয়ে এলেন। স্থির করলুম, এবার আর ভুল করব না। প্রথম থেকেই আরম্ভাধক পশ্চিমে আসি চালনা করতে হবে। ট্রান্সপোর্ট-লক্ষ্যের ওজারসিয়ারবাবু

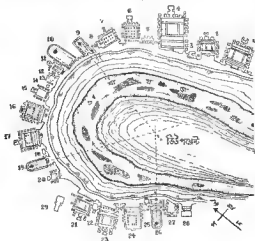


সশেষ আত্মসম্মানক ভূয়েল লাড়তে গিয়েই বেকারদার পড়েছিলুম। এবার হার গানে আত্মবিক  
অর্থে শব্দে বস! চৌকিদার বোরিয় আসতেই হিন্দীতে বলি—কেন? ঘর রিসার্ভেশন হয়েছে  
আমার জন্য?

চৌকিদার একটু হতভাক্ত। সামলে নিয়ে বলে অশ্রু কাঁহাসে আতে হেঁ সাব?

সাববে খেঁকিয়ে উঠি। কেন, পাটে-সাহেবের চিঠি পাও নি?

পাটে-সাহেবের নামোল্লেখই অর্থেক কাল হয়। চৌকিদার এবার আমাকে একটি সেলাম  
করে বললে—জী নেহী সাব।



চিত্র-১

আমি কণ্ঠস্বর একেবারে সশ্রমে ভূয়েল খাড়াগলে করতে শুরু করি। কড়া-মেজারী কন-  
বিভাগের একজন হোমরা-চোমরা অফিসারের ভূমিকায় অভিনয় করতে হচ্ছে আমার। শ্রবণী  
জাক-বিভাগ থেকে শুরু করে মায় আমার ভগ্নাকে গাল পাড়তে থাকি শুরু হুগুগুতে। আমি  
আন্তরিকতা থেকে খেলা শুরু করতেই দোঁধি চৌকিদার বাবাজীকে আত্মসম্মানক থেকে খেলাতে  
অবতরিত করবো। পদ্মাবতী প্রান্তভাগে মধ্যটা মুখে নিয়ে বলে—আপনি নারায় হছেন কেন  
সাব? ঘর তো চারটেই খালি পড়ে আছে। বেটে ইচ্ছে কখন কেনে না।

খাম দিয়ে হার ছাড়ে আমাব। বলি—চা খাওয়াতে পার?

: আতি লাভ হু সাব!

চৌকিদারটি লোক ভাল। শব্দ চা না, কিন্তুও খাওয়া। মধ্যাহ্নে কি খবর জেনে নিয়ে  
বললে রাতে একে কিন্তু হুটি দিতে হবে। নিজেই ব্যস্ত করে কারখানা। চৌকিদার শ্রাবণী  
দেখ। মাইল ভিনেক হুবে ফর্দাশুবে গর-বাড়ী। ওর শ্রী গ্রামে আছে। অসমপ্রসব।  
আজ সকালেই খবর এসেছে—রাতে একে বাড়ী যেতে হবে। এক কথায় রাজী হয়ে যাই।

জাপর্বা শেষ হতেই কোলা নদী বাজল। সেকচ-ঝই, নোট-ঝই ইত্যাদি কোলা বাজে ভরে নিয়ে ওকো হয়ে পড়ি গুহা-মন্দিরের উল্লেখ্যে। এখন থেকে অঙ্গ হাইলও হবে না। বাগোজ নদীটি এখানে অন্ধকারের আকারে মন্দ একটি বাক নিরুৎসে। হু-পাসেই বেঁধে-শুশ ফুট উঠে পাহাড়। এর নাম ইন্দ্রাণ্ডি পর্বতমালা। এই পর্বতমালায় একদিকে দক্ষিণাভিমুখে মালভূমি। অন্যদিকে জাপ্তা নদীর উপত্যকা। বাগোজ নদীটি এই পাহাড়ের বাক চির ছুটে গেছে গভীর বাহুর মুখ দিয়ে পথ কেটে। পর পর সাতটি জলা-প্রপাতের পথে নেমে এসেছে সমভূমে। তার শেষ ধারাটি যেখানে অন্ধকার চাঁদের মত বাক নিরুৎসে সেখানেই অজন্মতা-গুহা।

চিত-১-এ অজন্মতার একটি স্থান একে বোঝাবার চেষ্টা করছি। একবারে দক্ষিণ-পূর্ব কোণে যে ট্রিকিট-লকটি দেখানো হয়েছে ঐটিই সমভূমিসম্পন্ন বাহিরাবাস। চরমান ঐ পর্বত আসে জনগণকে থেকে। সেখান থেকেই হুহু হয়েছে সোপান। ঐ সোপান থেকে উঠে আসতে হবে গুহা-মন্দিরের সমভূমে যে পথটি আছে তার কাছে। গুহা-মন্দিরকে যত্ন করে ঐ পথটি নদীর বাক অনুসারে ঘুরে গেছে পূর্ব থেকে পশ্চিমে। প্যানের উপর থেকে দেখছি কল বৃক্ষের পার্শ্ব না যে জাপ্তাটি বাগোজ নদীর জনগল থেকে অনেক উপরে আছে। প্যানের দেখে, সর্বসম্মত ২১টি গুহা-মন্দির দেখা যাচ্ছে। বহুতর এখানে আরও কয়েকটি গুহা আছে, যা প্যানের দেখানো যায় নি। সর্বসম্মত গুহার সংখ্যা ৩০টি।

সোপান-প্রণালী হয়ে বাপে বাপে উঠে এলুম গুহার সমভূমিবর্তী ঐ পথটিতে। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ মন্দিরে অন্ধকার গুহার ভিতরে আছে অজন্মতার প্রস্তু চিত্র-সম্ভার। এই চারটি মন্দিরে বৈজ্ঞানিক আদ্যের সহায়কে স্বাভাবিক হাবিগুলি ভাল করে দেখানোর ব্যস্ততা আছে। সেজন্য পাঁচ টোকা দিবে একটি পৃথক চিত্রিত কিনে নিলুম।

অভিসম্ভার ছোটে লুপা এগিয়ে ছোটেই সম্মত অজন্মতা উপত্যকা হুহুতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল আবার দৃষ্টির সম্মুখে। ঠিক এই স্থানটিতে স্বাভাবিক অর্থ-শব্দাঙ্গী পূর্বে শিল্পী হুকুল দে তাঁর প্রথম অজন্মতা মর্শনের অভিজ্ঞতা কার্য করে লিখেছিলেন -

বাকের মুখে গুহা মন্দিরগুলি সর্বপ্রথম দেখে আমার মনে কী প্রাচুর্য অনুভব হইছিল তা আমার পঠিককে বোঝাতে পারি না। আমি ভবতমুখের দর দিখ হইতে দেখে। মর্শনপুঙ্খিত স্বাভাবিক পর্বত হইতে তার ছুই প্রকারিতা: পাহাড় দিকে অগাধে আলিঙ্গন করছে চাইছে। আমি এক ভাবের সহায়ী দীর্ঘ সময় এখানে নির্বাক মর্শনপুঙ্খিত। কখন হইল দীর্ঘ সময়ের না কিছু চাপিত বা কিছু পানি সব ঘন হয়ে মুখে নিঃশব্দ হয়ে গেল। আমি পরম্পরান্ত হইতে করুনে দীর্ঘ প্রবেশ করি পুর্বেই।

মেলবেলার হুচকতার পাড়ছি সোমার কটির হৌওজা শেষে পতাকাধীর নিয়া ছেয়ে রাকতুমারী চোখ মেলে চেয়েছিলেন। অজন্মতা যেন সেই হুচকতার হাকতুমারী। সহস্রাধীর নিয়া-অন্তে সভ্যজগতের বিকে চোখ মেলে হুইং সে জাকিরোজি ১৮১৭ খৃস্টাব্দে। ঐ সময় একজন ইরাক সৈন্য অজন্মতা পাহাড়ের অপর দিকে শিবির স্থাপন করেছিল। হুইং কয়েকজন লোক করে সেখান নদীর ওপারে পাহাড়ের গড়ে সাঁতার সাঁতার খিনা করে শতভূমি। দুঃসাহসী কয়েকজন সেই বাজা পাহাড় থেকে নামল নদীতে। নদীগুলি জাকিরে অপর উঠল এদিকের পাহাড়ে-ঐ গুহাগুলির সমভূমে। কয়েকজন জাকিরের আশ্রয় নদীর দিন পরে আমার পড়ল মালভূমির পাহাড়। ওরা শতভূমি হয়ে গেল।

কিছদিন পরে পঠিকের দল দিবে এল লোকালয়ে। তাদের কথা কেউ বিশ্বাস করে, কেউ করে না। গুহা-মন্দির সে না কেউ। শেষে পঠিক কয়েকজন বিদ্যেবোধ্যী বাগোজী হুইং কবতে গিয়েছে পড়ল। সেনাবাহিনীর লোকদের কছ থেকে তাঁরা পড়তে মোটামুটি নির্দেশও দেয়াইছিলেন। হারম্বাখন কয়েকর বাবেদন জেলায় ইন্দ্রাণ্ডি পর্বতমালায় একটি ঘাট বা উপত্যকা আছে। এই ইন্দ্রাণ্ডি পর্বতের ওপারে দক্ষিণাভিমুখে মালভূমি, ওপারে জাপ্তা নদীর অববাহিকা। বাগোজ নামক নদী এই পাহাড়ের দক্ষিণাভিমুখে এগিয়ে চলেছে। এই

কসোভোই সাতকুণ্ড তলপ্রপাতের কাছাকাছি একটি অশ্বখুরোক্তিত বাকি নিজেই। সেখানেই নাকি এই গৃহযুদ্ধের অবস্থান।

অনেক খুঁজে খুঁজে বিসোংসেরদীর দল অবশেষে এসে পৌঁছালেন অজ্ঞতা-গৃহঘর। সোকাগিরে গিয়ে গিরে তাঁরা তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা জালা এশিয়াটিক সোসাইটির কর্মিক বিবরণীতে প্রকাশ করেন। সেটা হল ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দে, অর্থাৎ অজ্ঞতা পুনরাবিস্কৃতের এক মাস পরে। কিন্তু তবু কলারসিক মহলে তখন উল্লেখযোগ্য কোন সাক্ষ্য জালা না। কার্টল আজও প্রায় দশ বছর। তারপর জেমস ফার্দুসনের নজরে পড়লো এই গ্রন্থটি। ফার্দুসন ছিলেন সত্যিকারের পণ্ডিত ও কলারসিক। তাঁর উল্লেখও ছিল প্রচণ্ড; বিশেষ করে ভারতীয় স্থাপত্যের বিষয়ে। শব্দে স্থাপত্যই বা কেন, জামদার, চিত্রকলা, পুরাতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস, ভূগোল, দ্রুত প্রকৃতি অনেক বিষয়েই তাঁর পার্শ্বভা ছিল প্রমাণ। এসব বিষয়ে তাঁর লেখা গ্রন্থ আজও প্রামাণ্য। এতদূর পণ্ডিত যখন শব্দে এই গৃহযুদ্ধের বিষয়ে এসে জালা এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থপত্রে প্রবন্ধ লিখলেন, তখন অজ্ঞতার পক্ষেও তার চোখ বুজে থাকে সম্ভবপর হলে না। তাঁর গ্রন্থটি প্রথমে প্রকাশিত হয় ১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টরদের এবার টনক নড়লো। তাঁকে মাত্রক পক্ষের সৈন্যব্যয়ক কার্টেন রবার্ট গিলকে পাঠালেন চিত্র-গুলির অনুলিপি তৈরি করার কাজে। মেজব গিল দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে অজ্ঞতার কাজ করেছিলেন। কী প্রচণ্ড অধ্যবসায় ছিল তাঁর জা কম্পনা করলে শর্তসত্ত্ব হতে হয়। তিনি বলতেন একাই কাল করেছিলেন সেখানে, এবং এই দীর্ঘ সময়ে ত্রিশটির ওপর বৃহদায়তন তৈরি-রত্নের ছবি এঁকে শেষ করেন। এগুলি হয়ে হয়ে বিলাতে পাঠানোর ব্যবস্থা হল। কিন্তু কী অজ্ঞতার কথা, ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে নিউইয়র্কমের স্ট্রিটল পাালে এসে একটি প্রবন্ধনীরূপে মাত্র পচিশটি পত্র ছাড়া বাকি পঁচিশখানি ছবি পড়ে ছাই হয়ে গেল। এমন সর্বনাশ জগদে কেন করে লাগল জালা না, শব্দে এটাই জালা যে, সে ক্ষতি অপরূপ। তার কারণ মেজর গিল যখন অজ্ঞতা-গৃহঘরে চিত্রগুলি দেখেছিলেন, তখন সেগুলি ছিল প্রায় অক্ষতই। আজকাল আমরা যে ক্ষতিগ্রস্ত-শাস্ত্রিত প্রাচীর-চিত্রগুলি অজ্ঞতার গিরে দেখতে পাই, তার অধিকাংশই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে গত সেত্ব বছরে। তাছাড়া মেজর গিল এমন করেকটি চিত্রের অনুলিপি করেছিলেন যেগুলি আজ বাস্তবে একেবারে অবলুপ্ত। মাই হোক, অবশিষ্ট পঁচিশখানি ছবি কেনসিংটনে সগ্রহস্থলার শ্বেনসেস্ত্রিত করা হয়। শব্দেই, সেখানে ভারতীয় শাখার এগুলি আজও দেখে রাখা আছে।

সে মাই হোক, মেজর গিলের পর এখানে যিনি এগিয়ে এলেন তিনি হচ্ছেন বোম্বাইয়ের শিপ বিদ্যালয়ের অধ্যাপক জর্জ গ্রিফিথ। এখানেও ফার্দুসন সাহেবের কাছে আমরা কথা; তারও বিবরণী অগ্নিকান্ডে মেজর গিলের ছবিগুলি পড়ে বাণীর পর সার জেমস ফার্দুসন ও জা বার্নেস জাখত সরকারকে এ গিরে পুনরায় গবেষণার কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য পীড়-পীড় করেন। তাঁদের উল্লেখই সরকার একদা উজা অনুমোদন করেন এবং অধ্যাপক গ্রিফিথ তাঁর বিদ্যালয়ের করেকজন উল্লাহী ছাত্রকে নিয়ে ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে পুনরায় জালা শব্দে করেন। প্রায় দশ বছর পরে (এর ভিতর বছর তিনেক অবশ্ব কাজ করা ছিল) তাঁদের বিদ্যালয় পরিভ্রমের ফলশ্রুতি দেখতে পাওয়া গেল ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে। ছাত্রদের জালা এই ছবিগুলি নিয়ে গ্রিফিথ গিরে এলেন সভ্যজগতে। সর্বসমেত চিত্রের সংখ্যা ৩০৫। গ্রিফিথ সাহেবের হিসাব অনুযায়ী দেখছি তিনি আঁকিয়েছিলেন -

গৃহ ১-১৭৭ টি	গৃহ ১০-১৮ টি	গৃহ ১৯-১ টি
" ২-৫০ "	" ১১-১ "	" ২১-২ "
" ৬-৫ "	" ১৬-১৮ "	" ২২-১ "
" ২-১১ "	" ১৭-৫১ "	মোট-৩০৫ টি

মহানগরে অথাক প্রসিদ্ধ এই অমূল্য চিত্রসম্ভার পাঠিরে বিলেন বিজ্ঞেতঃ। পশ্চিম অগ্নঃ  
সম্বৎসর একাদ অজন্তার স্বরূপ। সাউথ কেমিস্ট্রন সঙ্গ্রহশালায় অতি যত্নে নিয়ো গাওর  
হল সেগুলিকে।

কিন্তু ভাগের কী নিম্নে পরিহাস। আবার এক কিছুকী আশ্চর্যকণ্ঠে ১২ই জুন,  
১৮৮৬ তারিখে এই জাবল চিত্রসম্ভারের অধিকাংশ চিহ্নই নষ্ট হয়ে গেল। ৮৭-খানি সম্পূর্ণ  
ভস্মীভূত; আর ১৯১-খানি আংশিকভাবে কলমে গেছে, অবশিষ্ট ৫৬-খানি ছবি ভিত্তিরিয়া  
ও এ্যালবার্ট সঙ্গ্রহশালায় জরতরী শাখার অঙ্কও শোভা পায়।

অন্য টাংসাই বলতে হবে প্রসিদ্ধ সংস্করণ। এই সর্বনাশা আশ্চর্যকণ্ঠের পূর্বেও তিনি  
একবারে ভেঙে পড়েন নি। সেখানি, তা সত্ত্বেও এই আশ্চর্যকণ্ঠের এগারো বছর পরে তিনি  
ভাঁড় অথবা প্রাচীরের প্রকাশ করেছেন—The Paintings in the Buddhist Caves of  
Ajanta, London 1896 যে ছবিগুলি বন্ধ পেয়েছিল এবং যে সব স্কেচ ওর কাছে  
ভারতবর্ষেই ছিল তারই উপর নির্ভর করে দু'বন্ধে প্রকাশিত এই গ্রন্থটিই অজন্তার বিষয়ে  
প্রথম প্রামাণিক দলিল। বইটির ভূমিকা ও সম্পাদনার পরিপাটি দেখলেই বোকা যায় যে,  
এই পিছনে কী পরিমাণ পরিশ্রম, পাণ্ডিত্য আর অসম্মিষ্টতা আছে। জাতকর কাহিনী-  
গুলির অধিকাংশই প্রকৃত জানতেন না তাই অনেকক্ষেত্রে সেখানি তিনি চিত্রগুলির নমুনা  
প্রবেশ করতে পারেন নি। তবু অজন্তা-ভ্রমের যে তিনিই পথিকৃৎ, এ-বিষয়ে সন্দেহের  
অবকাশ নেই। কয়েকটি বিখ্যাত চিত্রের অক্ষত অবস্থার কী রূপ ছিল, তা শূন্য তাঁর গ্রন্থের  
আগম্যেই আজ জানতে পারি। বর্তমান গ্রন্থে অনেকগুলি চিত্র প্রসিদ্ধ সাহেবের মূল গ্রন্থ  
অবলম্বনে আঁকবার চেষ্টা কবেই—যেলে সেগুলি প্রায়শই অক্ষত। বাক্তরে আর অজন্তার  
ছবিগুলি এ-রূপে প্রসিদ্ধ চিত্রের মত অক্ষত নয়।

ইতিমধ্যে কিন্তু অজন্তার লুপ্তাবার কল মহানগরে লুপ্তের কাজে লেগে গেছে। অবশিষ্ট  
কথা থেকে তাবা ছবি চুরি করবার মতলবে ছিল। কিন্তু এ তো আর সঙ্গ্রহশালায় দেওয়ালে  
উঠানো কেঁচে-বাঁধানো ছবি নয়—এ চুরি করা হবে ভেমন করে? ওরা তাই ছুটে এল  
কোমল আর ছুরি দিয়ে—প্রেক্ষাগার-লম্বিত ছবিগুলিকে কেঁচে তুলে নিয়ে গেল। এ দলব  
মধ্যে নিজামের কর্মচারীরাই শব্দ নল, বোম্বাইয়ের একজন প্রত্নভিত্তিক ডাঃ বার্ড-ও ছুটে  
গিরিয়েলেন। অবশ্য, এই সব জবাবদলের ভাঙে লাভের অনেক পরোক্ষা শব্দই কয়েক  
সের হঠিন ধ্বংস; আর বিশ্লেষণতত্ত্বাব জেনকামের খতিয়ানে যে অশ্রুটি পড়লো তা  
সুখীজন নিশ্চয় অনুমান করতে পারবেন।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে হিজ এন্টলট্টেট হাইনেস নিলাম বাহাদুরের  
ঐচ্ছ্য ছিল—তিনি আইন করে এই লুপ্তাবারের চেষ্টা করলেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই  
অজন্তা, কতকালের অভ্যাস, আব লুপ্তাবারের কেরামতিতে অজন্তার অনেক ছবিই নিঃশেষ  
হয়ে গেছে।

১৯০৬-৭ খ্রীষ্টাব্দে লেডী হেরিয়ারোম জরতরী আসেন এবং অজন্তা লুপ্তাবার হয়ে  
হয়ে যান। তিনি অসত্যিকস্বেই শিখরী ও ভূতীর কল ভূতরতরী জিরে আসেন এ  
চিত্রগুলির নকল করাসেব প্রজ নিয়ে। তাঁরই উদ্যোগে অজন্তার অধিকাংশ লুপ্তাবারের নকল  
করা হয়। এই নকলগুলি লেডী হেরিয়ারোম লুপ্তাবার ইতিমধ্যেই সোমাইটিক উপহার দেন।  
১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে ঘোলাইণ্ট সেগুলি দু'বন্ধে প্রকাশ করেন—“অজন্তা কেবলকাস” নামে।

কাজের শেষের বিলম্বসময়ের কালেও অজন্তার মৌরবমিষ্ট চিত্রসম্ভারের কথা এসে  
পৌঁছল। ফলে শিল্পকর্মে নন্দনাল, অসিত হালবার সমরেল পুস্ত, মূলক সে প্রভৃতি  
রঙা হলেন অজন্তার জিহ্মাশ্র। এরাও নির এসেন অজন্তা অমূল্য।

লেডী হেরিয়ারোমকে তাঁর গ্রন্থ-রচনার যাক প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে  
মিস্ জেরারি ল্যাণ্ডারের নাম সর্বপ্রথমে করতে হয়। নন্দনাল, অসিতকুল, সমবন্দ পুস্তের  
চিত্রও তাঁর গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। এ-ছাড়া মৈদা আইম্বাও হুন্ডর ফজলখানবন অমূল্য।

আছে তাঁর গ্রন্থে। পরোক্ষভাবে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন গুপ্তী নিবেদিতা, রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ।

শিল্পী হুতুল দে আসেন তাঁর অল্প কিছুদিন পরে। প্রথমবার ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে ও দুই বছর পরে দ্বিতীয়বার। বিখ্যাত জাপানী শিল্পী আর আই-এর সঙ্গে তাঁর অজন্তাতেই সাক্ষাৎ হয়।

তাঁর অনেকগুলি চিত্রের অনুলিপি ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে লন্ডন থেকে প্রকাশিত 'মাই পিলাগ্রিমেজ টু অজন্তা এ্যান্ড বাথ' নামে একটি গ্রন্থে স্থান পায়।

হাবরবার্গারের নিজস্ব ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর সরকারে একটি পুরাতত্ত্ব বিভাগ খোলেন এবং অজন্তার গুহাচিত্রগুলি সরকারে যত্নবান হন। বিশেষত্বের অবসানে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত নিজস্বের প্রচেষ্টার ও অর্থে দু'জন ইটালিয়ান বিশেষজ্ঞ, প্রফেসর সেরেন্থো চেচোলি আর ক্রিস্টো অলিমি বহু পরিচয় করে গুহা-চিত্রগুলিকে সাফ করেমন। ইতিমধ্যে চিত্রগুলিকে মোড়ানত করবার মদুন্দেশ্যে যে সব নিরুপ্ত শিল্পী বৈরাগ্য-খুশিমত কাজে রত লাগিয়ে অজন্তার চিত্রগুলিকে অনেকদূরবর্তী সর্বনাশের পথে ঠেলে দিয়েছিল, এই দু'জন তাঁদের সেই অশ্রুচর্মগুলি, অর্থাৎ দু'জন বড়োর আশ্রয় খুঁজে খুঁজে তুলে ফেললেন। তার উপর অষ্টার মন্ত শব্দ এসে একটি প্রলোপ দিলেন, যাতে রতগুলি জুড়ে না যায়, সেখানে থেকে ওসে না পড়ে। এরা দু'জনেই ছিলেন এ কাজে অভিজ্ঞ। ইটালিতে এই জাতীয় কাজ ইতিপূর্বেও হয়েছে লিম্বিন চ্যাপেলে। ইটালির একটি মনস্টারির সার্বসেতে খরের সেখানে অর্থাৎ সেওনার্দি না ভিকির বিন্ধাবিখ্যাত শৈব সায়মাশ প্রাচীর-চিত্রটিকে এভাবেই উদ্ধার করা হয়েছিল।

নিজস্ব সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগ আরও একটি ভাল কাজ করলেন। ডাঃ গোলাম ইরাজমানির সম্পাদনায় ক্রিষ্ট চার খণ্ডে অজন্তার একটি আলবাম প্রকাশ করা হল। প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে, শেষ খণ্ডটি ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে। এই চার খণ্ডে চিত্রসম্ভারের অধিকাংশ ছবিই ইংল ভেসি নামে একজন অভিজ্ঞ আলোকচিত্রশিল্পীর রঙিন ফোটোগ্রাফ থেকে নেওয়া। গ্রিকিং তাঁর গ্রন্থে চিত্রসম্ভার-পূর্ণ প্রত্যেকটি গুহার প্লান ছাড়া সেগুলোর এলিমেন্টশন-ও এঁকে দিয়েছিলেন, ফলে চিত্রগুলির অবস্থান বুঝে নেওয়া সহজ হয়েছিল। অনেক পরে প্রকাশিত হলও ইরাজমানি সরকারে চিত্রগুলির অবস্থান দেখিয়ে সাম্প্রতিক নক্সা সেন দি। ফলে, তাঁর গ্রন্থ অনুসরণে বাস্তবে চিত্রগুলিকে সনাক্ত করা শর হইত পড়ে। তবে গ্রিকিংয়ের চেয়ে ইরাজমানির একটা বড় সুবিধা ছিল। ইতিমধ্যে পুরাতত্ত্ব ও ইতিহাসের পণ্ডিতগণ সেরেন্থোগুলির সঙ্গে ভাটক-বর্ণিত কাহিনীর সম্পর্ক অধিকার করে ফেলেছেন। ফলে গ্রিকিংয়ের চেয়ে ইরাজমানির পক্ষে চিত্রের সমালোচনা করা সহজ হয়েছিল।

এছাড়া ইউ-এন-ই-এস্-সি-ও বা ইউনেস্কো অজন্তা সম্বন্ধে ৫২টি বক্তৃতা হাবরবার্গ একটি চমৎকার আলবাম প্রকাশ করেছেন। শূন্য ভাই নয়, এর মূল্য বেশী হওয়ার ইউনেস্কো সেই গ্রন্থটির একটি সালসমুদ্রের পকেট এডিশন-ও প্রকাশ করেছেন। মূল্যের দিক থেকে বিচায করলে পকেট বইটিকে অশ্রু করা যেতে পারে।

স্বাধীনতার পূর্ব ভারত সরকারের মনিতকলা প্রকল্পটির অঙ্গসম্ভার উপর একটি আলবাম প্রকাশ করেছেন ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে। এতে আছে কৃত্রিমী-খব ১৪"×১২" মাপের। মূল্য মাত্র দশ টাকা। অষ্ট অনার এ মাপের একখানি রঙিন ছবি নিশ্চয়ই খুব সম্ভব। কিন্তু ভাব কলম এতে যে সব রঙ ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলি ঠিক বাস্তবানুগ হয়নি সব ক্ষেত্রে। সহজলভ্য করতে পারে প্রাকৃতিকের এ-জাতীয় রঙের স্বেচ্ছাচারিতা না করলেই ভাল করতেন। যেন তাঁর, এর চেয়ে শূন্য কোথার অধিকাংশ চিত্র এঁকে নমুনাস্বরূপ দু'একখানি রঙিন চিত্র লিখে খুব ভাল হত—এক বাদি সেই দু'একখানি রঙিন চিত্র গ্রিকিং, ইরাজমানি বা ইউনেস্কোর গ্রন্থের মতো বাস্তবানুগ হত! তবে, মনিতকলা প্রকল্পেই যে অজন্তার

বিষয়ে একটি সহজলভ্য প্রাণবান প্রকাশ করেছেন, এমনকি তাঁরা ধন্যবাদার্থী। গত দশকে 'আর্কিওলজিকাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া' 'অজন্মতা ম্যুজিয়াম্' নামে একটি প্রাণবান প্রকাশ করেছেন। তাকে জাতক-কাহিনীগুলি নাই, গৃহ্যের সন্ধানও নাই।

একটা কথা ভাবলে অবাক লাগে। অজন্মতা পুনরাবিস্কৃত হয়েছে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে—কিন্তু সেখানে তখন কি দেখতে পাওয়া গিয়েছিল তার বিজ্ঞান-সম্মত আলোচনা পাই না। সেটা পাই প্রায় ছাট বছর পরে। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ডঃ বার্নেস গৃহ্যগুলি পরিচালনা করে লিপিবদ্ধ করেছেন যে, তিনি তখন ১৬টি গৃহ্যের ভিতর চিত্র দেখতে পেরেছিলেন। সেই যেগুলি গৃহ্য হচ্ছে—১, ২, ৬, ৬, ৭, ৯, ১০, ১১, ১৫, ১৬, ১৭, ১৯, ২০ ২১, ২২ আর ২৬। আগেই বলছি, এর ভিতর ১১টি গৃহ্য থেকে ত্রিবিধ সাহেব তাঁর ছবিগুলি এঁকেছিলেন। সেই হিসেবে ত্রিবিধ যে গৃহ্য থেকে কোন চিত্র অঁকেন নি, সেগুলির সংখ্যা হচ্ছে ৪, ৭, ১৫ ও ২০। ত্রিবিধ ও ডঃ বার্নেস প্রায় সমসাময়িক, ফলে অনুমান করতে পারি, ত্রিবিধ এই চারটি গৃহ্য থেকে চিত্র অঁকেন নি ইচ্ছা করেই, চিত্রগুলি নষ্ট হয়ে গেছে বলে নয়। কিন্তু আজ বিশ্লেষণ করি এখন পর্যন্ত চিত্রের বৃত্তি, তখন দেখছি মাত্র ছটি গৃহ্যের আগে দর্শনীয় চিত্রসংস্কার। সেগুলি ১, ২, ৯, ১০, ১৬, আর ১৭। তাহলে অবশ্যই কি পাঁচটা? অজন্মতার চিত্রগুলির জন্য ছাট পত্র শিবতীর শতাব্দী থেকে খৃষ্টাব্দোত্তর সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত। এয়ারশ বছর অজ্ঞাত হয়ে পড়েছিল অজান। আর অবশ্যই সত্যজগৎ তার সন্ধান পরওয়ার পর, তার সন্ধান খর করতে শব্দ, কবীর মাত্র সেদৃশ বছরের মধ্যেই শব্দের যেতে বসেছে অজন্মতা।

জার্মি, জার্মান বলকেন এর জন্য দারী সন্ধ্যা (?) মানুষের কালাপাহাড়ী অত্যাচার। উনিশশে শতাব্দীর শেষদিকে থেকে বর্তমান শতাব্দীর অশ্বমেধ, পৃথিবী পরিচালনা বছরের মানুষের অভ্যাসেরই যেগুলি গৃহ্যের চিত্র কমে এসে বাঁকিয়েছে মাত্র ছটিতে। হতে পারে। এর জন্য নিতে গেলে জানতে হয়, নিজাম সরকার ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে আইন করে এখন অজন্মতা সংরক্ষণের আয়োজন করলেন, তখন কতগুলি গৃহ্যের চিত্র দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। ইহুত পুরাতত্ত্ব বিভাগের বিশেষজ্ঞরা সে সংখ্যাটি জানেন—আমি জানি না। কিন্তু তবু আমি বলব শব্দ, তাও নয়। আমার ছাটের সঙ্গে আমি লেডী হেরিয়ারাম ও শিল্পী মকুল সেন গ্রন্থে দুটি রাখি করতে চাই। এ দুটি গ্রন্থে যে সব চিত্র দেখছি তার অনেকগুলি জো আজ বাস্তবে নেই। জরোথি লার্চার, নললাল বসু, সমরেশ পুস্ত, মকুল সেন, অসিত হালদার প্রভৃতি এখন ছবি এঁকেছেন, তখন তেঁা কালাপাহাড়ী অত্যাচার বন্ধ হয়ে গেছে। তাহলে?

বিশেষজ্ঞ আর বৈজ্ঞানিকের দল বলেছেন এ নিয়ে মাথা ঘামাতে। আমি বিশেষজ্ঞ নই, বৈজ্ঞানিকও নই—তাই আমার কল্পনার রাস আশ্রয় বলে সেওয়ার কেউ বাধা নিতে আসবে না। আমার জো মনে হয়, বৈজ্ঞানিক প্রথার আলোর সলগেবেই শব্দ, না, আধুনিক মনুষ্যের গয়ের গম্বুজ এই চিত্রগুলির রত জড়লে আছে। হিলোর উদ্দেশ্য এই আধুনিক পৃথিবীর খোর কুটিল পথ আর লোভ—জাতি জীবনমাত্রা বরনস্ত করতে পুঞ্জীভূত অজন্মতা। তাই সে শব্দের আছে, করে খসে আছে—তাই তার অসংসৃষ্টতার অতি সবার সংরক্ষণের স্বাক্ষর করা সত্ত্বেও বারে বার অজন্মে পড়ে নিঃশেষ হইতেছে সেগুলি।

অজন্মতার সর্বসম্মত ত্রিশটা গৃহ্য-বর্ণনার আছে। এখানে একটা কথা বলে রাখি। অনেক সময়ের লোকের ধারণা, বৌদ্ধ শিল্পীরা বুদ্ধি প্রাকৃতিক গৃহ্যের কিছু ফেঁদালা-চিত্র এঁকেছিলেন—আর তাকেই বলা হয় অজন্মতা-চিত্র। মোটেই তা নয়। এগুলি প্রাকৃতিক গৃহ্য মোটেই নয়। স্বাভাবিক পাথর কেটে গৃহ্যগুলিকে ওরা খুঁড়ে বার করেন। অজন্মতা পরিচয় ভারতের অমল্য পাথরের দেওয়ালকে ঘসে-ঘসে মণ্ডন করে জোশন। আর ভারতের সেখানে অঁকেন ঐ ছেঁকেসেগুলি। কিন্তু তেঁা তাঁরা এগুলি খনন করতেন, সে সলগেবে পরে আলোচনা করব। অজাভাত সেক্ষা থাক।

এই ত্রিংশটি মন্দিরের ভিতর মাত্র পঁচিশটি (২, ১০, ১২, ২৬, ও ২৯) হচ্ছে ঠোঙ বা উপাসনাগৃহ। বাকি পঁচিশটি বিহার বা সন্ধ্যারাম। শোভারঙ্গগুলি বৌদ্ধ প্রহরদের আবাস-স্থল। এর ভিতর প্রদত্ত গৃহ-মন্দির লোহের দশম ঠোঙটি। যেটি কথা, ১০, ৯, ৮, ১২, ১০ ও ০০ এই ছটি গৃহ-মন্দিরই প্রাচীনতর বৃগের। এই ছটি গৃহ-মন্দির চারশ বছর পূর্বে থেকে দুশ বছর পূরে—মোটমুটি এই চারশ বছর সময়ের ব্যবধানে নির্মিত। বাকিগুলি সপ্তম শতাব্দীর ভিতর তৈরী। অর্থাৎ হিসাবে দাঁড়াল-অজন্তা তিল তিল করে গড়ে উঠেছিল প্রায় হাজার বছর ধরে ; আর অজন্তা অবলম্বিত হয়ে পড়েছিল আরও প্রায় হাজার বছর।

কে বা কারা অজন্তা পাহাড়ের বুকে গৃহ-মন্দিরের বাক প্রথম শুরু করেন, আর আর তা মানবার উপায় নেই। সম্রাট অশোকের আমলে গ্যার কাছে চারটি গৃহ-মন্দির তৈরী হইতছিল—শূন্যম, কণ-কোণ্ড, লোমশ-কণি আর বিন্দু-কোণ্ড। এগুলি প্রাকৃতিক গৃহ নয়—মানুষের তৈরী। অশোকের সময় বৌদ্ধধর্ম নতুন করে প্রাণ পেয়েছিল, একথা আমরা জানি। বৌদ্ধ ভিক্ষুর দল লোকলজ্জা জ্ঞাপ করে নির্জন প্রান্তরে তাঁদের উপাসনা-মন্দির এক সম্ভারাম তৈরী করতে প্ররাসী হলেন। মৌর্য বৃগের অববাহিত পরে সত্যবাহন যুগে বৌদ্ধ বৌদ্ধধর্মের কাছাকাছি নাসিককে কেন্দ্র করে অনেকগুলি গৃহ-মন্দির তৈরী হচ্ছে ; জালা, নাসিক, কার্ণা প্রভৃতি স্থানে পশ্চিমঘাট পর্বতমালায় বুকে একদল বৌদ্ধ প্রহর অলপ পরিগ্রমে গড়ে তুলেছেন কতকগুলি গৃহ-মন্দির। প্রায় সেই সময়েই অজন্তার দশম গৃহ-মানবর্তি নির্মাণ শুরু হয়। সে বৃগকে আমরা বালি হীনবান বৌদ্ধ বৃগ। তখন বৃগধর্মের মূর্তি খোদাই করা হত না। শাক্যমুনিকে বোকাবার জন্য ব্যবহার করা হত কতকগুলি সাম্প্রতিক চিহ্ন—পদ্মফুল, ধর্মচক্র, শূন্য, চক্র-চিহ্ন, বোধিবৃক্ষ বা শূন্য সিংহাসন অবস্থায় শূন্য রাক্ষস। অজন্তার অষ্টম, নবম, দশম, শ্রাবণ ও ব্রহ্মাবশ গৃহ-মন্দিরগুলি সেই বৃগের। এসব ভিতর যদি বৃগধর্মের কোন মূর্তি বা চিহ্ন দেখেন, বুঝবেন সেগুলি পরবর্তী মহাবান বৃগের সময়ের।

উত্তর ও মধ্য ভারতের বহন গুপ্ত সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগ, তার প্রায় সমন্বয়ে দাক্ষিণাত্যে কতকগুলি শক্তিশালী রাজ্যের স্থাপন পাই ইতিহাসে। কাকটিক ও পরে বাসিমির চালুক্য রাজবংশ (বর্তমান মহীশূরে) এবং রাস্তকুটরা। বৌদ্ধ ধর্মের তখন মহাবান যুগ। অর্থাৎ তখন শাক্যমুনির মূর্তি তৈরী করার রোগাক শূন্য হয়েছে। অজন্তার অধিকাংশ গৃহ-মন্দির এই মহাবান যুগে।

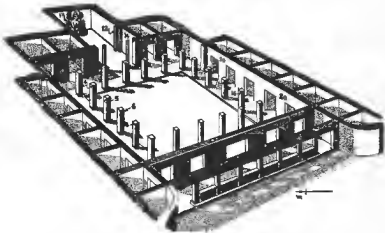
দীর্ঘ সাত-আটশ বছর ধরে তিল তিল করে গড়ে উঠেছিল অজন্তা। প্রথমে হুয়াজে ছিল কয়েকজন একান্তবাসী বৌদ্ধ ভিক্ষুর নির্জন আবাসস্থল, নান্দ্যর ঠোঙাটিকে ঘিরে। ক্রমে হুয়াজে এর স্থান-মহাভোগে যুগ্ম হয়ে আসতে শুরু করেন ক্যান্ডি ভিক্ষু এবং অর্জুনের। মহাবান যোগাচারের প্রবর্তক মহাভিক্ষু আসল যে দীর্ঘদিন এখানে বাস করে যদি তার প্রমাণ পাওয়া যায় বৌদ্ধ শাস্ত্রে। সে-যুগে অজন্তার কী নাম ছিল, তাকে খুঁজি তা জানবার উপায় নেই। সপ্তম শতাব্দীর চৈনিক পরিব্রাজক হিউ-এন-সুংয়ের অজন্তার সন্ধানও করেন নি, তবে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের কাছ থেকে শুনে তিনি এর উল্লেখ করেছেন তার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে।

নবম বা দশম শতাব্দীতে অজন্তা সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কৃত হইয়াছিল বলে অনুমান করা হয়। কিন্তু কেন, তা অজ্ঞাত জানা যায় নি। প্রাক্তর ধর্মের ধর্মপ্রচারক অথবা মুসলমানরা এসে এই নির্জন গৃহোবাসী বৌদ্ধ প্রহরদের যে অক্রমণ করে নি, তা অনুমান করা শক্ত নয়। মূর্তিগুলির বাক জগা নয় ; দেওয়াল-চিত্রগুলি অক্ষত অবস্থায় আছে—অশ্লীলকণ্ড, লুপ্ত-ভগ্নাঙ্গের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় নি। যদি মনে করি কোন সাম্প্রতিক কারণে অল্প কোন ব্যাপক মহাভারতের ভয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুর দল কোনও নিরাপত্তা আশ্রয় পালিয়ে গিয়েছিল—আর কিংবা আসার সুযোগ পান নি, তাহলেও প্রমাণ থাকে, সেক্ষেত্রে গৃহ-মন্দির-গুলি তাঁরা অজ্ঞান্য পাথর ঘিরে বস করে গেছেন না কেন? কতকলম্বু ও পাথর অজাচার

থেকে গৃহাভিগৃহীতকে রক্ষা করার এ সহজ ব্যবস্থাইটুকু নিশ্চর ভীষ্ম সেক্ষেত্রে করে যেতেন। তা ভীষ্ম করে বান নি। প্রায় হাজার বছর পরে হঠাৎ বেদিন অঙ্কুরাশয় পুনরাবিষ্কৃত হল, সেদিন গৃহাভিগৃহীত খোলাই পাওয়া গিয়েছিল; অথচ বৌদ্ধ শ্রমণদের ব্যবহৃত কোন কলু পাওয়া গেছে বলে শূন্য নি। তিষ্কাপাত, জপের মালা, বাঁশ, বাসনপত্র—কই কিছই তো ছিল না গৃহা-অশ্মিরে! কেন?

একের পর এক গৃহা-অশ্মিরগৃহীত দেখতে থাকি। ভবিষ্যৎ যাত্রীর সূচিকা হবে মনে করে বিচিত্রিত গৃহা-অশ্মিরগৃহীতের একটি করে শ্রাণ্য এবং বিখ্যাত শিল্প-নির্দর্শনগৃহীতের অবস্থান যতদূর সম্ভব এখানে সজীবোপিত করে দিচ্ছি। আরো বাড়ীর শ্রাণ্য দেখতে অসম্ভব, তবে শ্রাণ্য কালতে কি বোঝার একটু অলোচনা করে নেওয়া উচিত।

প্রথম গৃহা-অশ্মিরগৃহীত যদি আমরা মাটির সমান্তরালে কল্পনায় কেটে দেখাখণ্ডে করত পারি এবং উপরের আখ্যানা সিরে কেলতে পারি, তাহলে এরোপেন থেকে গৃহা-অশ্মিরগৃহীত আলাকর্ষিত নিলে সেটি চিত্র—২ এর মতো দেখতে হবে। এটাকেই আমরা লাক্ষনিক চিত্র—৪-এ শ্রাণ্য বলে বোঝাতে চেষ্টাছি। চিত্র—২ ও চিত্র—৪ মিলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে শ্রাণ্যে বলতে কি বোঝায়। নেহাৎ অসুচিকা হলে কোন এজিনিয়ার বা ওভারসিয়ার কলুকে বলুন ব্যাপারটাই বুঝিয়ে দিতে। এটা না বুকে নিলে শ্রাণ্য দেখে পরে শিল্প-নির্দর্শন-গৃহীতকে সনাক্ত করতে পারবেন না। মনে রাখবেন, অঙ্কুরাশয় অশ্মিরকে নিশ্চর যেতে হবে একদিন, আর তখন হাতে সময় থাকবে অসম্ভব অল্প। ফলে, শ্রাণ্যে দেখে কেমন করে বস্তুত অবস্থান চেনা যায়, সেটা শিখে নিতেই হবে।

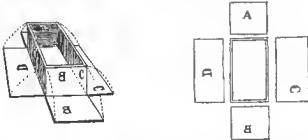


চিত্র—২ঃ প্রথম গৃহা-অশ্মিরের উপরের পর্দার সিরে নিলে দেখা দেবে।

কিন্তু মনুষ্যিকি হচ্ছে, শ্রাণ্যে তো মনুষ্য মেজাজকেই দেখছি অথচ শিল্প-নির্দর্শনগৃহীত আছে দেখাচ্ছে। শ্রাণ্যে জে দেখায়েই ছবি দেখা যায় না। তাই এখানে শ্রাণ্যের চার-পাশে চারটে দেখায়ে একে দেখা হতেছে। ব্যাপারটাই কেমন জানেন? মনে করুন চিত্র—



৩-এ একটি কাচের ব্যাক দেখা যাচ্ছে, যার উত্তম, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের ভিতর-দিকে A, B, C, D—এই চারটি অক্ষর যথাক্রমে লেখা আছে। এই কাচের ব্যাকটির প্ল্যান হচ্ছে নিচের কেন্দ্রস্থলে অঙ্কিত অমতকোচের। কিন্তু প্ল্যানে আমরা দেওয়ালের লেখগুলো দেখতে পাবি না। এবার যেনে কল্পে, এই কাচের ব্যাকটির চারটি দেওয়াল খুলে খাটিতে গেলে দেওয়া হয়েছে। আর তারপর আমরা তার প্ল্যান এঁকেছি। তাহলে এই কেন্দ্রস্থলের প্ল্যানের চারপাশে চারটি দেওয়ালকে দেখতে পাব। খাটিতে গেলে দেখার পর অক্ষরগুলি কোথায়



চিত্র-৩

কেন্দ্রস্থলে দেখা যাবে, লক্ষ্য করে দেখুন। অর্থাৎ, ব্যাকের মাঝখানে পাঁড়িয়ে উত্তর দিকের দেওয়ালের দিকে তাকালে 'A' অক্ষরটিকে দেওয়ালে দেখানো দেখবে, প্ল্যানের উপর্যুপরে তাই দেখানো হয়েছে। এবার দক্ষিণ দিকে মূখ্য করে দক্ষিণের দেওয়ালটিকে কেন্দ্রস্থলে দেখতে পাব জানতে হলে, ছবিটা উল্টিয়ে 'B' অক্ষর-চিহ্নিত চতুর্ভুজটিকে দেখুন।

এ ব্যাপারটা যদি বুঝতে পারেন, তাহলে চিত্র-৪-এর সাহায্যে প্রথম গুরু-মণির পাঁড়িয়ে কোন্ দেওয়ালে কোন্ ছবিটি কোথায় আছে, তা খুঁজে বার করা নিশ্চয় কঠিন হবে না আপনার কাছে।

## শিখরীর পরিচয়

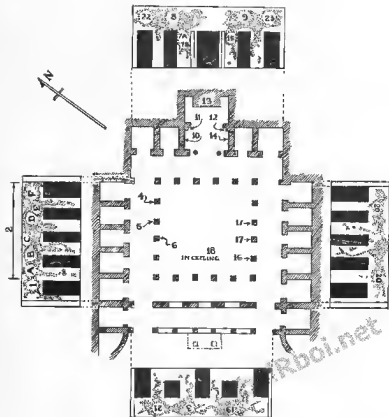
### প্রথম গৃহা-বিহার

অজ্ঞাতব্য প্রথম বিহারটি ৬৫০ থেকে ৬৬২ খ্রীস্টাব্দের ভিতর নির্মিত। 'প্রথম' বলতে মনে এটাকে অবিস্মৃত্যে মনে করবেন না। অবস্থান অনুসারে এটা প্রথমে দেখা হয় বলেই এর নাম 'প্রথম গৃহা-বিল্লি'। এটি জালুকা রাজ্যের আকলে তৈরী। মহাবান বৌদ্ধ বুদ্ধে। গৃহ্যের সম্মুখে একটি গাড়ি-করাঙ্গা বা পোড় ছিল—এখন তার চিহ্নমাত্র নেই। প্রথমেই একদার স্তম্ভ। ছুটি পূর্বকার স্তম্ভ আর দুটি অর্ধকার, অর্থাৎ প্রাচীর-গায়ে অর্ধ-প্রতিষ্ঠিত পিজ্যণ্টের স্তম্ভগুলি চতুষ্কোণ উপরান্নে আটকোনা। প্রবেশপথের দু'দিকে অর্থাৎ মাজার স্তম্ভ দুটিতে আলংকরণ অন্য ছুটি স্তম্ভের চেয়ে বেশী। ঘের শিল্পী আদম্ভুক ব্যতীত দু'টি প্রবেশপথের দিকে কেন্দ্রীভূত করবার জন্যই এভাবে আলংকরণ করেছেন। অলিঙ্গ পার হয়ে প্রধান প্রবেশপথের দিকে এবার গৃহ্যের প্রবেশ করা গেল। ভিতরটা বেশ অলো-অঁধারি। কিন্তু এ গৃহ্যেতে কৈদুতিক আলোর ব্যবস্থা আছে। চিকিট স্কেলেই জরপ্রাপ্ত কর্মচারী একটি জেরেলো ব্যতি নিয়ে ঘুরে ঘুরে প্রাচীর-চিহ্নগুলি আপনাকে দেখিয়ে দেবে। শ্রাব্য পরেই থেকে লীর্থ জেরেল তত দিয়ে ব্যাখ্যা করত। ফলে, বিভিন্ন উল্লেখ সম্ভবতঃ সত্যকবলী। অর্থাৎ, প্রাচীর-চিহ্নগুলির অবস্থান সম্বন্ধে যদি আপনার পূর্ব-অভিজ্ঞান না থাকে, জাতক-বর্ণিত কাহিনীগুলি যদি আপনার আগে থেকে না শেনা থাকে, তাহলে এই অল্প সময়ের চিত্র-কাহিনীগুলি সনাক্ত করা দু'বার এবং তার পূর্ব হসান্ধান অসম্ভব। আর কী বুদ্ধের কথা, যে করিনন আদি সেখানে ছিলো, সেখানি অসংখ্য ব্যতী আসছেন, আর হলে বসছেন। এই বিশ্ব-বলিত চিত্রশিল্পের পূর্বের জীরা পছন্দ না। এবং তাঁর কি হারান্ধন তাও তাঁর জানেন না।

চিত্র-কাহিনীগুলি অঁকাশেই জাতকের গল্প। হোত্তরবুদ্ধ পূর্ব পূর্ব জন্মে যে সব লীলা করেছেন, সেই জাতিস্মর মহাপুত্র-বর্ণিত সেই সব কাহিনীই জাতকের গল্প নামে পরিচিত। সর্বসময়ে পতিপত উপর জাতকের গল্প আছে। এক এক বুদ্ধ নিয়ে বুদ্ধদের বহুবারে অবতীর্ণ হয়েছেন—তাঁরা পূর্ব বুদ্ধ মন,—তাঁরা বোধিসত্ত্ব। বুদ্ধ লাভের পথে বিভিন্ন জন্মজন্মের মধ্য দিয়ে তাঁরা হলেছেন এ মর্ত্যভূমে নানান লীলা করে, মহাপুত্রিনির্বানের পথে। জাতক-বর্ণিত চিত্র-কাহিনী বর্ণনা করার সময় প্রথমে আমাদের মনে কাহিনীটি জানতে হবে—তারপর তার চিত্রনাট্যকে এবং সবচেয়ে তার সমালোচনা বা রসোপলব্ধির প্রয়াস। এই পথেই অগের হতে হবে আমাদের।

প্রথমেই নজরে পড়লো সঞ্চপাল জাতকের কাহিনী (১/১) :

বারাণসী মহারাজের পুত্ররূপে জন্ম নিলেন বোধিসত্ত্ব। তিনি উপসুত্র হলে তাঁকে সিংহাসনে বসিয়ে কাশ্যরাজ বানপ্রস্থ নিলেন। একটি নির্জন হ্রদের তীরে স্থিতি তৈরি করে তিনি সন্ন্যাস-জীবন বাপন করতে থাকেন। সেই হ্রদে বাস করতেন নিম্নলিখিত সঞ্চপাল। তিনি প্রত্যহ এই সন্ন্যাসীকে কাছে বসে কথা শুনতে আসেন। একদিন প্রত্যহে দেখতে এসে বোধিসত্ত্ব দেখতে পেলেন নাপরাজ সঞ্চপালকে। তাঁর মনে নাপরাজ হবার বাননা আসে। ফলে, পরজন্মে বোধিসত্ত্ব সত্যই নাপরাজ হয়ে জন্মগ্রহণ করেন ; কিন্তু নাপরাজের বিলাস-বৈভব—নাগ-রাজ-প্রাসাদের ঐশ্বর্য কিছুই তাঁর ভাল লাগল না। বোধিসত্ত্ব বুঝতে পারলেন—বুড় থেকে মনে হলেছিল যদি নাপরাজকেই আছে অপার শান্তি, বিরাট আনন্দ। কিন্তু তা প্রাপ্তজনক। ভোগে বুঝ নেই, ভোগেই বুঝ। রাজার মনে প্রসঙ্গিত নেই, আছে সর্বভোগী সন্ন্যাসীর মনে। বোধিসত্ত্ব স্থির করলেন, জন্মজন্মের হিতার্থে তিনি আত্মত্যাগ করবেন। নাপরাজক ত্যাগ করে তিনি প্রানের পথে একটি কর্মীর উপর বিভ্রাস নিতে থাকেন। মনে মনে বলেন,



চিত্র-৬ ৩ তম তলায় রাজাবাই মহলের প্ল্যান।



মিথিলায় মহামন্ত্রী চেদিলাকুমারের কর্মক্ষেত্রে নিবেদন করেন। আগনি উত্তেজিত হইলেন না কুমার। আগনি বিম্বান্ পণ্ডিত-সর্বিদ্যাশালকগণ। এক উদ্ভিন্নবোধিত চণ্ডা নারীর গানের উত্তর দেওয়া আগনির পক্ষে অসম্ভব হবে না নিশ্চয়ই।

আখণ্ডবংশী জৈমিন্যাকুমার বলেন, আগুনও অহেতুক চক্কর করেন না মহামশী। আগুন ছাড়া, রাজ্যান্তঃপুর থেকে হোক দিয়ে আসুন পর্য্যটনশ্রমী আপনাদের রাজকন্যাকে। আহমদের প্রয়োজন হয় না। জাতোদ্ভূত-সদৃশ উশীরভানিকার অবরোধ দখিরে হাফিল্পিত করে পদার্থ করেন মিথিয়ার রাজনন্দিনী বিশ্ববিন্দা সীকলী।

নিম্নবর্গীয় ধর্ম্মেতে সেই নারীমূর্তির দ্বিত্যে ত্রিকোণে হৃদয় চৌকুমার নির্বাণ; হয়ে যান।  
 কুলে যান, গিহুহীন এই বিদ্যুৎ কল্যাণি হোলে করেছ তর্কশূন্যে যে কেউ থাকে পরমত  
 কর্ত্তে পারবে জাই কত বরমান দেবে সে। কুলে যান, পাণ্ডিত্যে কত রাক্ষসে, কত  
 পাণ্ডিত্য, কানী তর্কশীলার কত সেয়া ছাড়ে দল এখানে এসে অপমানিত হয়ে ফিরে গেছে।  
 পান্ডিত্যবিশ্বের তিন দেহকর্ত্তে থাকেন স্বতঃস্ফূর্ত্তানির্গত স্বতঃস্ফূর্ত্ত সাক্ষীর হৃদয়। স্বতঃ  
 স্ফূর্ত্ত, স্বতঃস্ফূর্ত্তে বেন শোনা গা-সমস্ত তর্কশূন্যে আজ সর্ববর্ণের সৃষ্টি হইছে।

মহাজানকী জাতিগত গুণতত্ত্ব, মিথিলাখণ্ডিতের আবেগ। শব্দ, হৃদয় নয়, গুণে-ও তিনি সেন-  
বাহিনী। যার কণ্ঠদেশে এই করবর্ষিনী নারী বয়স্ক্য মেয়ে সেই হবে  
মিথিলায় অধিষ্ঠিত। আই বাব বার হৃদয় হ্রময়ের দল ছুটে আসে মিথিলায়—ঐ হৃদয়বর্ষি-  
শিখার পদশব্দে পুরাতনের স্বাক্ষর রেখে ছিঁড়ে বার অব্যয় দম্বশক গুণতত্ত্বের দল।

সাঁইলনী বলে—আৰ্হ, মৃত্তকৰূপে শূন্যেই আপনি নাকি অজ্ঞান প্রশ্নের উত্তরদানে প্রয়াসী?  
কুণ্ডলবর ঘোষ বল, যেন বাঁধার কলকর!

ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ—ସବୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରି, ଘଣ୍ଟା କର ।

এক একে শীতলী শৈশব কল্পিত থাকে আর কঠিন প্রশংসাদায়ী। সমস্ত শিলা, সমস্ত বিশা  
একত্র করেও ডেনিকুমার আর সম্যকান ঝুঁকে পানে না। মনে হয়, বুড়াই তক্ষীলাল এতদিন  
হয়ত-জ্ঞানস্বপ্নে।

କଳାକାଢ଼େ ହୋଇ ଓଢ଼େ ମାବଳୀ : ବଜ୍ର—ମହାଶୟେ ମର ହଲ ଆର୍ଷପ୍ରାପ୍ତେ ।

દર્શિયમાન માથાને આગ પુલાવે જાવ્યો ના ।

কিন্তু এক্ষেপে তো রাজ্য চলে না। মিথিয়ার সিংহাসন শূন্যে। অনতিবিলম্বে সে সিংহাসন পূর্ণ করতে হবে। মহামন্ত্রী বলেন—রাজকুমারী, আমি শিরদাঁড়ার ধুকোঁচি তোমার প্রাণ সম্বলনের অতীত। আমি বরং স্বদেশের সত্যের আয়োজন করি। তুমি নিজ অস্তিত্বই অনুমোদন থাকে ইজ্জা বরমণী হান কর।

সীমণী হোসে বসে—তা জে হয় না মহামন্ত্রী। আমার প্রতিজ্ঞার আমি অটল। আমার শ্রমশীলগণকে কোন না করে কেউ আমার অপসারণ করতে পারবে না।

ସହାୟତା ଡେକ ଆମେନ ଗ୍ରହାଚାର୍ଯ୍ୟକେ ; ଧନେନ, ବ୍ରାହ୍ମଣସିନ୍ଧୁନୀର କରକୋଷିଷି ପିତ୍ରର କେତେ ଆମିନି  
କଲେ ଏକ ବିଦାୟ ହେବ କି ନା ଏବଂ ଏକ ଗୋଡ଼େ କନ୍ଧ ଲେବ କି ନା ଶିବିନିର ଉଦିନି-ନୀତି ।

সীমাবদ্ধ সাক্ষ্যাদেশ প্রসঙ্গিত করে শেষ লক্ষ্যকারকত্ব্য আর কাম্বুজ। গ্রহাচার্য সে বৈশা  
বিচার করে বলেন—সাক্ষ্যাদেশীর বিবাহ অসম। কিন্তু দ্বিধিত্য আর কাম্বুজকে ইনি নিরবধি  
মহার প্রবাহিত করে যেতে পারেন না।

কলকণ্ঠে হোসে চুঠে সীকলী; কল-কলন গ্রহাচার্য? জামি কি শেষ পর্বন্ত কোন  
মণ্ডলেকের কণ্ঠে করামা। গিজে বসব?

ভদ্রদেবী প্রবলভাৱে গ্ৰহাচাৰ্য কণিকেশ্বৰ জনা বেনে আকৰ্ষিত হৈ পৰে। কঠিন-কঠে  
বালেন—না গজকুম্ভাৰী, তুমি যাক বিবাহ কৰিব, তিনি পদ্যক্ৰমত। তিনি জনক হৰ  
দেৱালয়—তিনি ব্ৰাহ্মণক। কিন্তু তুমিহি তাক ভুগ কৰতে পাৰিব না।

শিউরে উঠেন মহামান্য। কিন্তু তৎক্ষণাৎ রাজকুমারী হেসে বলে—আবার প্রশ্ন করছি, কেন

প্রহাচর্য? এই অধম রত্নপীর রূপের ঘোরে শূন্যতে পাই আজ সমস্ত জন্মশ্রীপ উদ্ভাসিত। স্বারা আমাকে প্রত্যাক করে নি, অত্যাও আমার রূপবর্ণনা শুনেন প্রেমোৎসাহ। আর যে হত-ভাগ্যকে আমি আমার এই দুই মৃণাল ভূজশ্বরে কদমী কর্তার সামাজিক অধিকার পাব, সে তুষ্ট হবে না আমাকে সেরে? কেন?

প্রহাচর্য! বলেন, কেন জানতে চাও রাজপুত্রী? শোন তার কারণ! এ হবে তোমার অহমিকার লজ্জাভোগ। রূপের অভিমানে সৌন্দর্যের অহম্ব্যস্তে তুমি এতাব্যকালে মত্ত শাশি-প্রাচীর হুকে পেন হেনেছ, জগতের দীর্ঘশ্বসের অভিশাপ নাগবে না ভেবেছ তোমার জীবনে?



চিত্র—এ হ. সম্মানাল দায়কের অঙ্কন—১৩১।

মহামন্ত্রী দুই বছর প্রসারিত করে বলে ওঠেন—কালত হন প্রহাচর্য!

সীকলী কিন্তু অসম্মিত। কোতুক ছলে প্রথলুজ নরী হলে বলে আশ্বিন অহেতুক দুর্দশগ্রস্ত করলে না মহামন্ত্রী! জগদীশ্বর যদি এই স্বন্দ প্রহাচর্যের কোটরগত চক্রেতে দিয়ে থাকেন অশ্বের ভবিষ্যৎ দেখার উপহৃত শক্তি, তাহলে এ রাজকন্যার নয়ন-কোণেও তিনি দিয়ে রেখেছেন নিজের ভবিষ্যৎ নিরূপণের উপহৃত নিয়োগ-কটাক।

গ্রাহ্যার' সে ব্যঙ্গ-বিদ্যুৎে কর্ণপাত না করে বলেন—মহামশী, আপনি রাজহস্তীকে সুসজ্জিত করে রাজপথে ঘুরে করে দিন। মানুষের পায়ে নি কিন্তু সে পারবে। রাজহস্তীই নির্বাচন করে দেবে এ রাজ্যের অধীশ্বরকে।

রাজপুত্রী হেসে বলে—আর আমার প্রসন্দের উত্তর?

গ্রাহ্যার' বলেন—এনে আছে রাজমন্ডিনী। জোমার শর্তপত্র না করে বিবাহ করতে ব্যর্থ করব না আমরা।

কাহিনীর দ্বিতীয় দৃশ্য মিথিলার জনাকীর্ণ এক গ্রামস্থল। পঞ্চপ্রান্তে ঘৃণিশঙ্কর শুরে আসেন একজন শূলগ্রাস্ত্র মহাভূত যুগপদ্বয়। কিন্তু তাঁর বসন ছিন্ন, ঘৃণিমলিন। তিনি হ্রতসর্বশ এক সাহাব্য বণিক। শুরে শুরে ভাবছেন নিজ দুর্ভাগ্যের কথা। এ ঘৃণিজার আজ আর তাঁর জপন করতে কিছু নেই। এক আছেন জননী—সুদূর চম্পনগরে। জননীকে সেই পর্ণভূটীরে রেখে অর্ধরূপেতে বশিষ্ঠা-সম্ভার সাজিয়ে সমুদ্রযাত্রা করেছিলেন দীর্ঘদিন পূর্বে। দুঃস্বপ্ন সমুদ্র-কটিকায় ভরপূর হ্রতসর্বশ হয়েছেন। আজ তিনি পথের ভিখারীয়াত। অথচ যাত্রের করছে শুনছেন, তিনি নাকি এক রাজার কুমার। তাঁর পিতৃব্য অজ্ঞাতভাবে অস্ত্রের সিংহাসন অধিকার করেন—হত্যা করেন তাঁর পিতাকে। সাম্রাজ্যবিরে দুঃখ-গ্লানতে তাঁর গর্ভবতী জননী একাকিনী হৃদয়েশে পলারন করেছিলেন রাজপুত্রী থেকে। গভীর ওরয়ে শেষে জ্ঞান নিরেছিলেন তাঁকে। পিতৃব্য সমস্ত রাজ্য তন্ন তন্ন করে অন্বেষণ করেছেন, সেই পলাতক্য নারীর সন্ধান—কিন্তু কিছু খুঁজে পান নি তাঁকে। দুর্ভাগিনী নারী এক পর্ণভূটীরে সূচ্যপনে তাঁকে মানুষ করে তুলেছেন দীনদরিদ্রের মত। গোপন রেখেছেন তাঁর পরিচয়। জননীর মৃত্ত বিশ্লেষণ ছিল, তাঁর পুত্র একদিন পুনরুদ্ভাব করবে পিতৃব্যকে। হাস, যাত্রের সে লব্ধ সফল করতে পারেন নি তিনি—হয়েছিলেন বণিক—জাপ-বিপণ্যেরে আজ দীন ভিখারী।

সহস্রা বণিকের কানে মন্ত্র বিসের কোলাহল। উঠে বলে দেখেন—এক পোতাঘায়ে আসছে রাজপথ দিয়ে। তাঁর শুরোভয়ে বর্ণবর্ণিত্যে সুসজ্জিত এক রাজহস্তী। তাঁর পুত্রে সুসজ্জিত এক সিংহাসন, উপরে রাজমন্ত্র। কিন্তু সিংহাসন শূন্য। কৌতূহলী বণিক সত্তরে উপলব্ধি করেন রাজহস্তী তাঁরকেই ছুটে আসছে তাঁকে লক্ষ্য করেই। মহমত হস্তীর পন-তলে পিষ্ট হবার অশঙ্কার বণিক গাঢ়োচ্চান করতে বান, কিন্তু ভৎসুর্বেই সেই রাজহস্তী তাঁকে শুরেও অলিপ্সনবন্ধ করে তুলে নেয় নিজ পুত্রে। অতি মত্তে তাঁকে বসিরে সের সেই শূন্য সিংহাসনে। জরনি চতুর্দিকে বেলে ওঠে কড়ো-কোড়ো-মল্লশল্য। স্তম্ভিত বণিকের সমুদ্র প্রস্থানর প্রণতি জানিয়ে মিথিলার মহামশী বলেন—ভগ্ন, আপনার পরিচয় আমরা জানি না, কিন্তু আপনিই অল্প মিথিলারাজ্যের নির্বাচিত মহান্ অধিপতি। বণিক বিস্মিত হয়ে বলেন—সেঁকি? কেন? কোন্ অধিকারে? মশী বলেন—মিথিলার অধীশ্বর গোপ-জনক দীর্ঘদিন গতয়ে। তাঁর একমাত্র অজ্ঞাতর গন্য উপযুক্ত সুপাতের সন্ধানে বার হয়ে অবশেষে আমরা এই রাজহস্তীকে সে কার্ণে নিরোগ করেছিলাম। রাজহস্তী আপনকেই নির্বাচন করেছে।

বণিক বলেন—এমন অবদূত নির্বাচনের কথা হো কখনও শুনি নি।

মহামশী বলেন—আপনার নাম এবং পরিচয়?

বণিক বলেন—পিতৃপরিচয় জানি না। বিসের ব্যাপ্তে জননী তা গোপন রেখেছেন। আমি করিম, নাম মহাজনক।

মশী বুঝতে পারেন রাজহস্তী নির্বাচনে ভুল করে নি। গ্রাহ্যার' বলছিলেন বট শীকলীর সীমন্তে যিনি সিদ্ধবিলুদ্ব অশ্লকত করে দেবেন তিনি জনক হবার উপযুক্ত, তিনি 'মহাজনক'।

কিন্তু বাদ সাধে মত্তে শীকলী। বলে—জগাতকুলশীলে আপত্তি নেই আমরা; কিন্তু আমার প্রসন্দের সমাধান?

মহাজনক এগিরে এসে বলেন : কী তোমার প্রশ্ন সূচীক্ষিতে? সীলী এতক্ষণে আগন্তুকের দিকে ফিরে তাকায়। এবার স্তম্ভিত হয়ে বেতে হয় তাকে। প্রভাতসূর্যের মত শীতলমান এই শালগ্রামে মহাত্মক কে? ইনি কি চন্দ্রবেশী কল্যাণ, অথবা স্বর্গের সিংহাসন শূন্য করে নেমে এসেছেন স্বয়ং শরীপতি শর? রাজকন্যা উপলব্ধি করে ইনিই তার কাছিত বলভ, এতই প্রতীক্ষার এতদিন সে ভ্রমগত প্রত্যাখ্যান করেছে আসন্নপ্রসঙ্গের অমৃত পাণ্ডিত্যকে। কিন্তু যদি ইনি তার প্রশ্নের উত্তরদানে অপর হন? যে কঠিন প্রশ্নাবলীকে রাজকন্যা এতদিন তার কৌমার-রক্ষার গুণেদ্বারা বর্ম বলে মনে করত, সে-গুণকেই অকস্মিক প্রিয়ামলন-অন্তরার লৌহ-শৃঙ্খল বলে মনে হতে পারে।

মহাজনক বলেন : পেশ করতে অহেতুক ক্লিষ্ট করছ কেন সূচীক্ষিতে?

রীতিমত সীলী সর্বেক ফিরে পার। রাজকন্যা কল্পকণ্ঠে একে একে পেশ করে তার কুটপ্রশ্নাবলী।

কিন্তু মহাজনক হলেন বহুভাষী শব্দ বোধিসত্ত্ব। জ্ঞানের আকর তিনি, স্বপ্নদেবের অতুল লব্ধ তার। হোসে বলেন : কি আশ্চর্য রাজকুমারী, তুমি এতদূর বিখ্যাত্যাস করেও এই সহজ সরল প্রশ্নাবলীর সমাধান জান না?

স্তম্ভিত সীলী শোনে ক্রোধের ছত্রির অশনি-আঘাতে চূর্ণ-কিন্দু হয়ে যায় তার কঠিন প্রশ্নাবলী।

ধীরে গিয়ে এগিরে আসে লম্বাবনতা কুমারী। পরিচয় নেয় অজ্ঞাতকুলশীল মহাজনকের কণ্ঠে নিজকণ্ঠের মণিগীত শতনরী।

বেজে ওঠে লম্বাগলম্ব, নহতে রাজ্যে থাকে মিলনলগ্নিভের তান। মহাজনক বলেন—বিবাহে আমার আগতি নেই, কিন্তু তৎপূর্বে চম্পানগরে পল্যাঙ্কিতা পারিও। আমার জননীকে নিয়ে এসে এখানে।

গ্রাহ্যচার্য আগতি জানিয়ে বলেন—তা যে হবার নয় মহারাজ। চম্পানগর সমুদ্রপারে, বর্ষ-দিনের পথ। অথচ গগনায় দেখছি আজ ঋতি প্রভাতের মধ্যে বধি রাজপুত্রীর বিবাহ না হয়, তাহলে আর তাঁর বিবাহযোগ্য নাই।

মহাজনক আর কি করেন? ভাষার হাতে নিজেকে সমর্পণ করে গেল। বন্ধতে পালেম, জননী এ সবোলে শূন্যই হলেন নিষ্কর। সূত্রকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখার স্বপ্ন তিনি দেখে আসছেন আজ বর্ষা পল্লববর্ষিত বর্ষকাল। এইবার তাঁকে ভেদে নিতে হয়ে তাঁর পিতৃগরিচ। এখন আর তিনি অরক্ষিতা পৃথকুটীরকাসিনী পলাতকর অলসার পুত্র নন যে, তাঁর পরিচর প্রকাশিত হয়ে পড়লে শূন্যতাক তাঁর কণ্ঠ করবে। এবার মিথিলার সৈন্য-বাহিনী নিয়ে তিনি পিতৃকুলের বিরুদ্ধে স্বপ্নযাত্রা করবেন—পুত্রহত্যার করবে অজ্ঞাত পিতৃরাজ্য।

মহা আত্মহুরের উপলব্ধিত হয়ে খেল বিবাহ উল্লেখ। মহাজনক স্বপ্নমগ্নিত শিথিল পাঠিতে দিলেন চম্পানগরে—জননীকে বসবাসে মিথিলার অনরণের উল্লেখ।

আমর আজও স্পষ্ট মনে আছে কাহিনীর ঠিক এইখানে আমি, কইলকে ধামিয়ে গিয়ে বলছিলাম, ইস্‌মাইল সাব, গঙ্গের ব্যক্তিটুকু আমি অন্তর্যসেই অনুমান করে নিতে পারছি। এবার গল্প ধামিয়ে ছবিগুলির ব্যাখ্যা করুন বর।

আমর অলম্ব-গাইত মীর্জা ইস্‌মাইল স্বপ্ন। বাড়িতে হাত হুলিরে মিটি মিটি হাসতে হাসতে বলছিলেন, বেশ জে, কখন না বাবা, গল্পটা কী ভাবে শেষ করেছেন জাতককার?

আমি বলি, সেটা তে বোঝই হচ্ছে। মহাজনক মিথিলার রাজা হলেন, জননীর কাছ থেকে পিতৃবীর পতিচর সন্তোষ করে তাকে বধ করলেন এবং ইংরেজী বৃশকথার কাকে বলে 'and lived happily ever afterwards' তাই করলেন, অর্থাৎ সীলীকে রানী করে সুখে-স্বচ্ছন্দে কল্যাণপাত করতে থাকেন।

মীর্জা ইস্‌মাইল বলছিলেন, উহু! না, বাবা, ঠিক ঠিক মেলেনি। এ গল্প ঢেক, গল্পটা—০



সোপানী, টুপেনিভ সেধেন বি তা মানছি; তবে দুর্ভাগ্য হাজার বছর আগে লুপ্ত কাহিনীটা ছোট গল্প হিসাবে উৎসর্গে ভলাই। শেষ পর্যন্ত শুনতে হচ্ছে আপনাকে।

অপাতা তাই শূন্যছিলদর ব্যাপ্ত হয়ে। আপনাতত্ত্ব শুনুন :

পলান্ধিকা এসে উপনীত হল রাজ্যপ্রাসাদের কক্ষগুহে। মহাজনক সন্দীপ এসে প্রণাম করলেন জননীকে। কিন্তু এ কী? রাজমাতা তো আনন্দের আভিপ্রায়ে লীড়রে ধরলেন মা ওদের? তাঁর দৃষ্টি কিছুতেকুলার স্বটিকাজড়িত বিহবীর মত বিহবল, তাঁর সমস্ত শ্রুতাবলম্বনে যেন এক কিন্দু রক্ত নাই।

জননীকে দুই শালগ্রামশূ ভুলক্ষণে লেটন করে মহাজনক বলেন—তুমি কি অনুভব? পথপ্রমোহে কি ভোমার এ ধরা?

সে কথার প্রত্যুত্তর না করে জননী প্রতিপ্রশ্ন করেন—বিকারকর্মে কি সম্পূর্ণ হয়ে গেছে?

হ্যাঁ মা। কিন্তু তুমি কি সুখী হও নি আমার রাজ্যপালে? এ অর্নিম্যকান্তি রমণী-রক্তে পুরেক হিসাবে ঘাট করে তুমি কি তৃপ্ত নও?

জননী কোন প্রত্যুত্তর করেন না। নীরবে প্রবেশ করেন কক্ষগুহে, তাঁর নির্দিষ্ট কক্ষে। মহাজনক আহত হন জননীর এই নিরুতাপ উপাসীনতার—অতীতিক মর্মাহত হল সীতলী, এ উপেক্ষার।

নৃপাধিক্ত রাজমাতার সেবকব্রের কোন দৃষ্টি হল না রাজ্যকক্ষগুহে; কিন্তু শ্রুত জন-লক্ষ্যমাত্র করলেন না। কক্ষগুহীর মধ্যে সংবাদ পেয়ে ছুটে এল সীতলী, বলে—মা আপনি নাকি সন্ধ্যতে মিন উপবাসী আছেন অসে?

অজন্মত আশ্রয়গারির মত খেটে পড়েন রাজমাতা, বিজ্ঞার গিরে ওঠেন—দূর হয়ে যা রাক্ষস।

স্ফীকৃত সীতলী শব্দমাতার এ সশোষণে বিশেষত্ব হয়ে পড়ে। বুঝতে পারে, মহাজনক-জননী বিকৃতমস্তিষ্ক।

সৌদীন গভীর রাতে গ্রহচ্যবর্ষে এক পড়ল রাজমাতার নিছক কক্ষে। শ্রুত অর্চ্য দীর্ঘকাল এ রাজপরিবারের শ্রুতাক্ষী; যুগে যুগে তাঁকে আসতে হয়েছে এভাবে রাজ্যকক্ষগুহে—খণ্ডা করে কপতে হয়েছে পুরকামিনীদের ললাটালবন। তাই রাজমাতার আহবানমাত্রে আরও তিনি এসে বীড়ালেন তাঁর শ্রুতাবলম্বন নিছক কক্ষে। অনবদ্যুতিত রাজমাতা মর্দনীয় তুলে করে বলেন—অম্যকে চিনতে পারেন মিথিলারাজের একান্ত লগ্না মহারাজাচার্য?

এ কক্ষুত ব্যতরণে নিম্মিত হন অর্চ্য, রাজমাতার বিকৃতমস্তিষ্কের কথা ইতিমধ্যেই কর্ণশোচের হয়েছে তাঁর। ভরে ভরে বলেন : পারি খই কি রাজমাতা? আপনি চাপানগর থেকে সন্ধ্য-অগস্ত মহারাজ মহাজনকের জননী।

রাজমাতা হাসেন। বলেন—আপনি কি শ্রুত ভবিষ্যৎ দেখতে পান অর্চ্য? অতীতকেই কি দেখতে পান না একেবারেই?

এবার চমকে ওঠেন শ্রুত। শ্রুত রক্তপীপের মত আলোর বিন্দুবোঁকাই ওঁ শ্রোতার মূখের উপর ফুটে উঠতে দেখেন দীর্ঘ পল্লবিশিষ্টবর্ষ শ্রুতকৃত আর একটি পুরলঙ্কার মত। তাকে যেন এখানে, এই করেই সেবোঁচ্চলেন একমিমা। স্ফীকৃত গ্রহচ্যবর্ষ বলেন—আপনি কি...আপনি কি...

সহায় শ্রুত শ্রুতের পথপ্রান্তে ছিমলতার মত লুপ্তিরে পড়েন রাজমাতা, আর্তকর্মে পলে ওঠেন : হ্যাঁ তাই। আমিই সেই অভাগিনী নারী। আপনার প্রিয় বন্দুর পলাতকা স্ত্রী।

ভুলক্ষণস্পন্দিত ভূমির মত একবারায় কোঁপে উঠেই শ্রুত হয়ে বান গ্রহচ্যবর্ষ। বলেন—ভাষের কী বিজ্ঞা খেলা। মিথিলাবিশিষ্ট অরিষ্টজনকের নিরুদ্বিগ্ন পুত্র মহাজনক আর তার পিতৃনিহাসনে উপবিত, অরত মহারাজের পলাতকা রাজমহাবী সেন আনন্দের মিনে ভুলুদ্বিগ্নতা কেন? না, মহাজনক বিবাহ করেছে জর পিতৃহন্তা গোপালনকের কন্যাকে—আপন পিতৃহন্ত-কন্যাকে।

সাপ্রদেয়সে রাজমাতা বলেন—আপনি আমাকে পথের নির্দেশ দিন আজ্ঞাব। এ অবসামাজিক অসিপ-বিবাহ কেমন করে মেনে নেব আমি?

গ্রহচ্যাব তাকে বাহু-মূল ঘরে তুলে বসান, বলেন—তুমি বুঝা মনস্তাপ করছ রাজমাতা। তুমি আমি কুশলীব মাত, সে বিভিন্ন নটাকার অলঙ্কারে বসে এই অপূর্ণ নটকটি রচনা করেছেন—তিনি আমাদের নাপ্রদেয়সে লাইরে। অপ্রতিবাসে তাঁর নটকে আমাদের অভিনয় করে ছোতে হবে শূদ্র।

রাজমাতা বলেন—কিন্তু আমার স্বামীহস্তা পোষণকর কন্যা তার পিতৃকণ শেখ করবে না?

: করবে বৈক রাজমাতা।

: কেমন করে? মহাজনকর মত স্বামী, মিথিলা-ব্রাহ্মণের মহারাবীর বিলাসবাসনের বিশৃঙ্খল আয়োজন—তার দণ্ডভোগ হবে কেমন করে?

গ্রহচ্যাব হেসে বলেন—হ্যাঁ রাজমাতা, বিলাসবাসনের মতোই সে দণ্ডভোগে করে থাকে। এ বিলাসবাসন বিধ হয়ে উঠবে তার কাছে। তার কামনার ধন সে কিছুতেই পারে না।

: আর কি কামনা থাকতে পারে তার?

: নারীজন্মের যা প্রেস্ত সম্পদ। সন্তান।

চমকিতা রাজমাতা বলেন—সে কি? কেন?

: কারণ আপনার পুত্র মহাজনক স্বয়ং বোধিসত্ত্ব। কোনও অনাচার তাঁর পক্ষে সম্ভবপর নয়। নিজ ভগ্নীর গর্ভে তাঁর সন্তান হবে কেমন হবে?

রাজমাতা বলেন—ঠিক কথা। আমি পুত্রের শিবতীষ্যার বিবাহ দেব।

গ্রহচ্যাব নিরুত্তর থাকেন।

পরদিনই রাজমাতা তাকে পাঠলেন পুত্রকে। বলেন—সীলনীরে ত্যাগ করতে হবে। আমি পুত্রের তোমার বিবাহ দেব।

মহাজনক প্রশ্ন করেন—সীলনীর অপরাধ?

: সে কথা শোনার কোন প্রয়োজন নেই তোমার। এ তোমার প্রতি আমার মাতৃআজ্ঞা।

মহাজনক এক মূর্খত নীরব থেকে বলেন—আমাকে মাফনা কর। তোমার এ আদেশ আমি মানতে পারব না।

শতশিত রাজমাতা বলেন—তোমার আজ্ঞা সহচর মায়ের চেয়ে আজ নববধূই বেশী মূল্যবান? এই তোমার শিক্ষা?

মহাজনক বলেন—তুমি তুলে করছ মা। জননীর আদেশের চেয়ে এ ধুনীয়ায় আমি কোন কিছুকেই বেশী মূল্যবান বলে মনে করি না। শূদ্রের একটা স্ত্রীতরম আছে তার।

: কী সেই স্ত্রীতরম?

: আশা ধর্ম। মাতৃআজ্ঞার আমি ধর্মকে বিদগ্ধন নিতে অক্ষম।

নিরুপায় রাজমাতা আবার তাকে পাঠলেন গ্রহচ্যাবকে। বলেন—মহাজনক সীলনীরে ত্যাগ করতে রাজী নয়। কিন্তু এ অসামাজিক বিবাহ কেমন করে মেনে নেব আমি?

গ্রহচ্যাব বলেন—তোমার এ প্রশ্নের উত্তর তো আমি কিছুই নিজেই রাজমাতা। মহাজনক স্বয়ং বোধিসত্ত্ব। সংসারে থাকবে না। কামিনীকণ্ঠনে তার কোন মোহ নেই। নারী-মাতৃকেই সে জননীজনে, ভগ্নীজনে, প্রাণ্য করবে। এমনকি সীলনীর গাঢ়স্পর্শও সে করবে না কোনদিন।

সহসা ধলিতা ভূতপণীর মত অজ্ঞানভাবে উঠে দাঁড়ান রাজমাতা। বলেন—হা। আমি তা হতে দেখে না। স্বামীর বংশ আমি নির্বংশ হতে দেখে না। স্বয়ংস নিতে দেখে না পুত্রকে। এ অসামাজিক বিবাহের কথা শূদ্র আমিই জানি। সমাজ জানে না। গাণ যদি কারও হয়, তবে হবে আমার। আমি তার প্রায়শ্চিত্ত করব—কিন্তু পুত্রকে শূদ্রী করতেই হবে।

গ্রহচ্যাব মৃদু হাসলেন শূদ্র।

নিরুদ্ভাস হয়ে রাজমাতা তাকে পাঠালেন পুত্রকল্যুকে। সন্তরে সুসজ্জিতা নবকন্যা বেশে সীতলী আবার এসে দাঁড়ায়। কিন্তু আশ্চর্য, এবার আর কোন তিরস্কার শ্রুতে হলে না থাকে। পুত্রকল্যু চিত্তক্লম্পিত করে ভ্রমণ করেন রাজমাতা, স্নেহপ্রসূত বসনে—সব কথা তোমাকে বলতে পারব না। শব্দ এটুকু ফেনে রাখ- আমার পুত্রের লগাটিলখন সে অফালে সরাসরি নেবে। যেমন করে পাব সে ডায়াটিলখন কার্য কর্তব্য হবে তোমাকে। এই তোমার প্রত! এই তোমার ধর্ম!

সীতলী শিউরে উঠিলেন লোকটা শ্রুত। তার মনে পড়ে যার প্রহরচার্যের অভিশাপের কথা। মনে পড়ে যার, গত ত্রিছত্র শতাব্দীর ক্রান্তিকর অভিজ্ঞতার কথা। মহামানব এখনও গাঢ়স্পর্শমাত্র করে নি এই ভুবনব্যক্তিরা কুশলীপিত্ত করায়।

এর পর থেকে শব্দ হতে যার এক নতুন অধার এই হত্যাকাণ্ড নারীর জীবনে। ক্রীতদাসের ঐক্যবন্ধের আড়ম্বরে অগোচরনের ছুটি নাই। কিন্তু রাজা মহাজনক যেন শব্দে রাজহসে। সঙ্গোপের জলপিত্ত মলিন করে না তার কুশলিত্ত পালক। তিনি সর্বস্বাই কোন যেন উলসী অসামান্য। স্বর্গদীপ্ত প্রমোদভবনের নিভুতে বিকচযোবন দেবব্যক্তিরা সীতলী প্রগায়কর কলনে মহারাজকে কাছে টানবার চেষ্টা করে, নৃত্যোপলিতে হাসো-হাসো কুশলরসে এই অসামান্য স্থিতপ্রভর মানবচৈতন্য বিহীন করে তুলতে চায়।—কিন্তু হার, মনোভাগিনী শব্দতাই লক্ষ্য তার কোন অসত্যক মুহুর্তে এই তরুণ তাপসের মনের কোণে ঘনিজে ওঠে আত্মলোকের জলকলতরঙ্গ তার হৃদিত্ত স্থির হয়ে যায়—কিন্দ্রতনিত্যক হৃদিত্তে, পার্থিব কোন কিছুই আর তখন নড়তে পড়ে না তার।

সীতলী বলে : তুমি কি আমাকে পেয়ে শব্দী হও নি রাজা?

মহাজনক বলে : তোমার স্নেহের মলানিকিত্তে অবলাহন করে আমি ধনা হরোঁই সীতলী। মনে হয়, আমার নিজেই কোন ভ্রমণী থাকলেও আমাকে এত স্নেহ করতে না!

স্বর্গদীপ্তের পুত্রলিঙ্গের মত স্থান হয়ে যার রাজকন্যা!

মুখালভবনের ছুটি বাহুতে মহারাজকে কলী করে বলে : কিন্তু আমার স্নেহমনের নিভুতে প্রেমাস্পর্শের জন্য কী সম্পদ জরি লুকিয়ে রেখেছি যা তো তুমি দেখতে চাইলে না কোন দিন।

মহাজনক বলে : শব্দ তোমার কোন সীতলী এই লগতের মর্মমূলে কোন্ গোপন প্রহর লুকায়িত আছে তাই যে আমি দেখতে চাই। বিশ্বাস কর, এই উপকরণের ধর্ম আমার যেন শ্বাসরোম হয়ে আসে, মনে হয় এ প্রাণেশ্বরের অবরোমের মধ্যে আমার স্থান নয়, আমাকে শব্দর যেন হাতছান দেয়!

সীতলী গোপনে অঙ্গু মোচন করে। নৃত্যর করতে চায় তার প্রেমের নিভু। পরিচারিকাকে বলে—নব আভরণে আজকে সাজিয়ে দাও কিন্তুর। নিজে এসে ইন্দ্রলীলমণিহার, পরিচয় দাও মণিচিহ্নিত স্বর্গমৈথলা, অলঙ্কারসাজিত আমার চরণে দাও কলহলেক্ষিত-নিশ্চলভবন শব্দর প্রসাবলকতার অনলস কুশলসম্মার কোন ছুটি থাকে না। রানীর সীতলী এই স্নেহে কলাকবিত্ত শব্দবাক্য মেঘভারের মত অলকল্যুই স্নেহ পল্যভরণ সৌন্দর্য শব্দ-কল-শব্দভের উপর রচনা করে কুশল-চলনের বিচিত্র আলিঙ্গন।

মহারাজ দেখে শব্দ হন, কলন—আহা কী শব্দব! কেন কলসের সোণী!

শ্রুত ময়মে যার যার শোষণকলনর। আত্মকলিত্তে চায়—ওগো না না, যেণী নর, স্নেহ দেখে, আমি মর্ত্যের সানন্দা মানবী। আমার প্রতি রোমকলপে কামনার শিহরণ, আমার প্রতি অজগা স্থিতের অভিল্যব, আমার সৌন্দর্য-সম্মারে অজ মিলন-ভূমিত যৌবন-সোমার!

কিন্তু অনাদ্রাতা কৃষাণীর অপরোহিত কিছুতেই উচ্চল করতে পারে না সেই নিলম্ব জঘা। বুক ফাটে, তবু তার শব্দ ফোটে না।

রাজনটীকে নির্দেশ দেয়—নিজা নবীন সাজে, নিজা নতুন নৃত্যভাষারো মহারাজের চিত্ত-অিনোদন কর্তে। কিন্তু রাজর্ষি মহাজনকের যৌবন প্রশান্ত ভাবে এককিঞ্চিৎ কিলিত্ত হয় না। দিন যায়, মাস যায়, কতুচর হয়ে য়ের আগে—উর্বশী-নিশিত রূপের শলগা সাজিয়ে সীতলী

বুধাই প্রহর গণে। মহাজনকের স্নেহ-কলুষলাভে সে বাঁজতা নয় ; কিন্তু সে যেন ভন্দীর প্রতি দ্রষ্টার প্রেম! এ লগ্নার কথা, এ পরানরের কথা কৃত্রিম বলতে পারে না প্রাণ খুলে—নিকটতম সখীর কাছেও নয়।

অন্তরঙ্গ্য স্বাস্যার হল প্রশংসাপে ভজ্জরিতা হবে তোলে তাদের প্রিয় সহচরীকে। তারা জানতে চার সন্ধ্যাবিহাভা মৌনবস্তীর প্রতি-রজনীর বিচিত্র আভিভূতের কথা। সন্ধ্যাতুকে ওরা কলকণ্ঠে প্রশ্ন করে : অত সংক্ষেপে কালে ঢেলে না রাজকুমারী, আরও বিস্তারিত করে বল। সে প্রশ্নে অন্যতর রাজনালিনীর হৃৎপিণ্ড যেন নিষ্পীড়িত হয়ে যায়। মনভাঙ্গনী মিথ্যার কুহক রচনা করে। স্বকপোল-কল্পিত মিলনের বর্ণনা দেয়—যে মিলন আরও হাবনি, বরং স্বপ্ন বেধে সে প্রতি রাতে মহারাজের পার্শ্বে একাকী জাগ্রতগণে।

কিন্তু তদপেক্ষা কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় ওকে যখন নিষ্পন্ন মিলন-রাত্রির অবসানে শ্বাস খুলে বোঁরে এসে বেধে অলিন্দের একান্তে অপেক্ষা করছেন মহাজনক-বন্দী। পূত্রকথকে বকে তেনে নিজে যখন তিনি একান্ত আগ্রহে প্রশ্নবাণ নিষ্পন্ন করতে থাকেন : আমার কাছে কিছ্র গোপন কর না মা, কল, রক্ত কত কল, কবে দেখতে পাব মিথিলারাজ্যের উত্তরাধিকারীকে? করে তুমি সফল করবে আমার স্বপ্ন!

সে প্রশ্নের পরসে ভজ্জরিতা হয়ে যার মৌনদ্বন্দ্বতা সীকণীর কলতন্দ্র।

মনভাঙ্গনী অনুভব করে আর কিম্বদন্তি করা অনুচিত। মহম্মদের এক পুর্বিমরারে সে যেন প্রগল্ভা বরষাবিহর মত উদ্যম হয়ে ওঠে। প্রশংসনক্ষর হৃৎসঙ্গকে নিষ্পন্ন করে ছুঁতে। ছুঁলে যেহে রক্তাভ্রা পটবস্ত্র, মার্ককণ্ঠিকা মেঘলাবসে, অন্তর্বাসের চম্পকচীনাংকুর। সন্ধ্যোদ্যাতা নিরাকরণর বেশে সঞ্জিত করে অলিন্দাসুন্দর বরতন্দ্র। মলিনতরকিত কোঁতে বের ইস্তনািলের চম্পক্য কলকণ্ঠে দু'লিগে দেয় মৌরিকনিবর্তন শতনরী, অগ্ন্যত পুষ্ক-নিভয়ে হুঁলিগে দেয় মালিক্যখচিত স্বকমেখলা!

মণিদীপকরণে প্রমোদকণ্ঠে বরষাভ্রাসনে যেখানে প্রতীকা করছিলেন মহাজনক ধীর গদে সেখানে এসে বাঁজত। অপর্যাবিশ্ব দুটি মৃৎখনজন কূলে মহারাজ বেধতে থাকেন এই অপরূপ নারী মূর্তিটিকে—নিরাকরণর স্কৃত লাগনর ভঙ্গী। সীকণী বলে পড়ে তার পাশে—দুটিগে পড়তে চার আশেপাশগণে ; কিন্তু বেধে উগসী অনমন্য হয়ে গেছেন মহারাজ!

আতঁকণ্ঠে রক্তাভ্রা সীকণী বলে আজ আমাকে বেধে তোমার ঘনে কেনে বাসনা—কোন কামনা জাগছে না মহারাজ?

বু-বিগলেশ-নিবন্ধদুর্ভিত্তি রাজর্ষি বলেন—জাগছে সীকণী! ইচ্ছা করছে আমার মননের মেবীপণ্ঠে ধসিয়ে তোমাকে আজ পূজা করি।

যেন এক আতঁ হাছাকারে ভেঙে পড়ে সীকণী। এতক্ষণে ঘনে হয়, সে রতি-মলির বর্ণনা-ভিলাবী ভীষ্মবিরাটর মত নিরাকরণ নয়, সে প্রগল্ভা নিলক্ষ্মা বাববিপতার মত নন্দিনীকি দু হাত বাঁজুর বঁজতে থাকে তার লালবস্ত্র!

কিন্তু কিছ্রুতেই কিছ্র হুগ না। একদিন গোপনে মহারাজ রেজির সোফেন ইন্দিপুটে হিমাবনী পর্বতের সান্দ্রসেধে এক সন্ধ্যাসীর বর্ণনামানসে। সন্ধ্যাসীর সপ্তে তাঁর সাক্ষাৎ হল। হৃদ-শিথো কি কথোপকথন হল জানি না, কিন্তু মহারাজ হ্রাসিয়ে ফিরে এলেন যেন অন্য মানুষ। রাজমাতার সীকণীকে কল্যাণিত্রকে তেকে বলেন : হি হি হি! কেন মৃহুতের জন্যও শিথিল করেছিলে তোমার আলিঙ্গনপাশে—কেন ওকে যেতে দিলে ঐ সন্ধ্যাসীর সান্দ্রসে?

কিন্তু যা হবার তা হয়ে গেছে। মহাজনক তাঁর মনোবাসনার কথা অলপটে অনালেন সীকণীকে। এতদিনে তিনি শেষের সন্ধান পেয়েছেন। এ রাষ্ট্রত্ববর্গের কল্যাসবাসনে তাঁর অভিমুখি নেই—তিনি সন্ধ্যা সেবেন। উপকরণে ও দুর্গটিকে ভাগ্য করে যাবেন তিনি।

সীকণী আতঁকণ্ঠে বলে : উপরত্বের দুর্গ কাকে বলে মহারাজ? এ রাজপ্রাসাদ, এ ঐশ্বর্য কেন ঘৃণার্থ?

মহাজনক বলেন—সে তো তুমি বুঝবে না সীকলী! সে তো আমার বোঝানো যায় না।

: তবে কেনন করে জোড়া দাও?

: সময় এখন হবে তখন অপর্ণিমা বুঝবে।

এ-ধর্মশিষ্টক দৃষ্টবশত মহাজনক-জননী শয্যা নিলেন। আর উঠলেন না! তবু মহাজনক রইলেন অটল। কদম্বালিনধনুসরশন্য সীকলীর অধুকেরার ভেসে গেল মেদিনী, তবু মহারাজ তাঁর সম্বলপে অটল। অশ্বপুর্নেষ্টে তিনি রাজধানী ত্যাগ করে গেলেন। তাঁর প্রিয় প্রজার দল শব্দঘট্টঘট্ট করে তাঁকে এগিয়ে দিয়ে এল রাজ্য-সীমাস্ত পর্বত। সংবোধ পেয়ে উদ্ভাবিনীর মত ছুটে এল ঔপেক্ষিতমৌরব্য সীকলী, আর্তকণ্ঠে বললে—আমাকেও সশা করে নাও। আমি তোমার সাফল্যের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হব না। বিশ্বাস কর।

মহাজনক বলেন—এ পথ তোমার নয় শূচিস্থিতে! এ যে আমার একলা চলার পথ!

আর্তকণ্ঠে সীকলী বলে—আমি এখানে কি নিয়ে থাকব? স্বামী বনবাসী, সন্তানল্যাভে বঞ্চিত এ নারী কি অকল্মশ করে বেঁচে থাকবে এর পর?

অভিলিখকণ্ঠে মহাজনক বলেন, 'যক্ষ'-ই যানকাত্তের অবলম্বন।

সীকলী শেষ আর্তনাদ করে ওঠে—আমি মানব নই মহারাজ, আমি মানবী। আমি সন্তান চাই, মাতৃর চাই—মানবীর তাই যে ধর্ম মহারাজ। আপনার স্বর্ণগজা জননীর কাছে আমি যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

হৃদয় লুটিয়ে পড়ে কঁদতে থাকে সীকলী। দীর্ঘ সময়। কেউ তাকে বাহুমূল ধরে উঠিয়ে কদার না। অবশেষে সে নিজেই উঠে বসে। দেখে, বিজন প্রান্তরে সে এককলী। মহাজনক চলে গেছেন তাঁর মধ্যপ্রাঙ্গণের পথে।

সীকলী উঠে দাঁড়ায়। জনশিষ্ট করে। মহাজনক যদি তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ করতে পারেন, তবে সে-ও সিদ্ধকর হতে পারবে সাধনার পথে। মহাজনক-জননীর কাছে সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, মহাজনক-পুত্রকে সে জঠরে বাস কল্পবে।

এক একে সীকলী বুলে ফেলে তার রক্তচরণ, কেহু-কর্তী-বর্ণিবলর-সীমন্তী-মেঘল্য। স্বর্ণবর্জিত চামাশেকের পরিবর্তে অশ্বা তুলে মের ডিম্বুখীর পীত আঁজন। জলদন্তবক-নির্মিত কেশভার ছুত হয় মল্লক থেকে। মুণ্ডিতশীর্ষা প্রমথীর বেশ প্রস্তুত হয় সে। বিদায় হয় নি, হুপে হয় নি, ভালকসার হয় নি—এবার অভাগিনী মেরেটি শেষ চেষ্টা করে দেখবে, তপস্যায় হয় কি না। মিথিলা-প্রজ্ঞার সীমন্তে এক আত্মকলনে, ঠিক যে স্বানিষ্ঠিত প্রজ্ঞার গ্রন্থকালে মিথিলাখিণি তাঁর রানীকে শেষ সন্ধ্যায় করে বিয়ার নিবেদিলেন, ঠিক তার পাশেই তাঁর করে মের মুস্তিকালিন্ত এক পর্ণকুটীর। ডিম্বুখীর আবাসস্থল।

সংবাদ পেয়ে ছুটে এলেন মহামন্ত্রী আর বৃদ্ধ গ্রহচ্যর্ক। মহামন্ত্রী বলেন, এ কঠোর তপস্বর্চার উদ্দেশ্য কী রানী?

সীকলী বলে, আর রানী নয় মহামন্ত্রী, আমি এক সমান্য ডিম্বুখী! গ্রহচ্যর্কের শিক ফিরে বলে, অনেক প্রাণলুপ্ত্য করছি, কমা করুন, তবু যাবার আগে বলে-হাঁ, আমি কি আমার উপসার সিদ্ধকাম হতে পারব না?

: কী তোমার কামনা সীকলী?

: মহারাজের পুত্রকে জঠরে ধারণ করা। স্বানিষ্ঠিত মহাজনক-জননীর কাছে আমি যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ!

গ্রহচ্যর্ক স্থান হেঁসে বলেন, তুমি কি ভেবে দেখছ সীকলী, তোমার সিদ্ধিলাভ মানেই মহারাজের রক্তলুপ্তি?

অচল দীপশিখায় মত্ত বুজকরে সীকলী বলে ওঠে : আচর্যনৈ! মহারাজের কী রক্ত আমি জানতে চাই না। আমি চলছি আমার ধর্মপথে। মাতৃক-ধর্মের চেয়ে নারীজন্মে কিছু ধর্ম নাই। অপর্ণিমা বলুন তিভুজনে কি এমন শক্তি আছে, যে আমাকে এই একনিষ্ঠ সাধনা থেকে ছাড় করতে পারে? আমার সিদ্ধিলাভে অন্তরঙ্গ হতে পারে?

গ্রাহ্যের অশীর্বাদ করে বলেন, তোমার মধ্যে আর স্বর্গের দ্বার্ত দেখতে পেরোই সীলনী! তোমাকে সম্প্রস্তুত করতে পারে কিছুকেন এমন শক্তি নাই। তুমি সিম্বকাম হওই।

মহামশী শিরের উঠে বলেন, কী কামেন অগ্ন্যেব? তাহলে কি রাজ্য হবেন মহাজনক? তিনি যে স্বয়ং বোধিসত!

: না। তিনিও সিম্বলাভ করবেন তাঁর কঠোর সাধনার। চিরকৌমার্যের অমলিন থাকবে তাঁর!

মহামশী বিষ্ময়ের মত বলেন, মার্জনা করকেন গ্রাহ্যের, একর যে অম্বাকেই বলতে হচ্ছে—অগ্ন্যনার ভাবম্বাশীর কোন সুজিনিতর পারম্পর্য থাকছে না!

এবার আর রাস করেন না গ্রাহ্যের। বলেন, অর্থাত্তিক কথা অর্থি বাঁশ নি মশীপ্রবর। জন্মদ্বন্দ্বের অমৃত প্যাপ্রাধীর কাছে যে সময়্য ছিল সমাধানের অতীত, সেখান নিশ্চয় মহাজনকের কাছে তা মনে হলে সহজ সরল। তেখনি তোমার-আমার কাছে যা নাকি মনে হচ্ছে সমাধানের অতীত সহস্যা—বিশ্বপ্রপাণের এক অলক্ষা নাট্যকরের কাছে তাই সহজ সরল। মহাজনক এ জন্মে চরমনিমিষ লাভ করতে পারকেন না। ওহু সাধনমাগে অগ্নির হয়ে থাকেন অনেককানি। বহু জন্ম পরে শূকবংশে তিনি জন্মগ্রহণ করকেন সিম্বার্থ গেতহরুপে। সেই জন্মেই তিনি পূর্ণ জ্ঞান লাভ করকেন—হবেন বুদ্ধদেব। মহাপরিণির্বাণ লাভ করকেন সেই জন্মে। তেখনি মা সীলনীও এ জন্মে পূর্ণ সিম্বলাভ করতে পারকেন না। তবে তিনিও অগ্নির হয়ে থাকেন অনেকটা গম্ব—তাঁর বাত্বক-তীর্থের পথে। বহু জন্ম পরে তিনিও অব্যার জ্যাক্ষুতা হকেন এই ধরাধামে সুপ্রবুদ্ধেন্দ্রা স্বশোধার কৃমিকার। সেই জন্মে মহাজনককে মিড়িয়ে দিতে হবে সীলনীর দরী। সীলনী সেই শেব জন্মে গঠরে ধারণ করকেন জালপদ্মকে। সেই ভুবন-বিমলী পুত্রের নাম হবে রাজুল!

সীলনী তার চরণে দ্বিড়িয়ে পড়ে বলে, রাজুল! রাজুল! এই অশীর্বাদই করুন।

মহামশী বলেন, কিন্তু এ পদ্যকুটির কেন মা? এ অপদৃশ চৈতন্যহের উপদ্রব স্বটিক-নির্মিত সঙ্করায় নির্মাণ করিয়ে দিই আমি। তুমি সেখানেই তপস্য কর।

সীলনী হেসে বলে : কিন্তু সে স্বটিকনির্মিত উপকরণের দ্বর্গে যে আমার শব্দে হৃদয় হয়ে আসবে মহামশী!

মহামশী বলেন : তোমার কথা যে আমি বুঝতে পারছি না মা। উপকরণের দ্বর্গে কাকে বলে?

জ্ঞিত হৃদয়েও সীলনীর ওষ্ঠপ্রান্তে ফুটে ওঠে অন্তরঙ্গের মত পান হাস্যরসে। বলে—এ কথার অর্থ যে কৃষি দিয়ে বোকা বার না বিস্তার।

মহামশী বলেন : তবে কী দিয়ে বুঝতে হয় মা?

সীলনী বলে : জ্ঞান দিয়ে।

জাতকবর্ণিত মূলকাহিনী এটাই। অজস্রের গিণী এই কাহিনীটুকু অকলঙ্ক করে স্থায়িত করকেন অপরূপ একটি চিত্র-কাহিনী (১।২ক—১।১৪)। সেখানে চিত্র তো না, বেন একটি পঙ্কজ নাটক।

প্রথম অঙ্কে দেখছি (চিত্র—৬ অর্থাৎ ১।২ক), অম্বিরীপিত প্রমোদভবনে একটি রক্ত-লিহোসে বলে আছেন মহাজনক এক রানী সীলনী। এখানে সেই মহামাসের বিচার পূর্ণিমা-রাত্রির ঘটনা। মহারাজের সর্বাধিকার মহামন্ত্রী অলম্বারের সমারোহ। কিন্তু রানীর অপেক্ষে সেই প্রসাধনদাক্ত নির্বাচিত শূন্য। তাঁদের দ্বিরে রয়েছে নরজন পরিহারিক—হস্তধারিণী, দাক্ষিনী, করম্বাবাহিনী ইত্যাদি। সীলনীর দক্ষিণহস্তে মহারাজের বামহস্তে নাস্ত, আশোষ-শ্রনা এই বিকল নারীর অপেক্ষা প্রতিটি রক্ত বেন মহারাজের দিকে দৃষ্টি বেতে চর। আত্মসমর্পণে উদ্ভব এক রত্নাভূষা পরমিত। কিন্তু রাজার দৃষ্টি শুনো দিব্য।

বেশ বোঝা যায়, সে দৃষ্টি উদাসীনের, বীতরাস নিম্প্রের। প্রমোদকে করেকটি



Fig. 1. A crowded temple—Bhakti movement in the temple (Bhakti movement—12A).

doi.net

অলংকৃত শব্দ, উপর থেকে কুলাছে মৃত্যুমালা। রাজার সম্মুখে একটি শিকানী, নিম্নাংশ ইটের ঘাঁহিয়ে মোড়ায়ের কাছ নিখুঁত। ঘুরে একটি প্রাসাদের ইঞ্জিনোয়। আলোদের এ প্রান্তের একটি শতকের কাছে দৃষ্টি সঞ্চিত কি নিয়ে বেন জলপান করছে, যেন তার ওরা রাজধানীর অন্তর্ভুক্তের কিছুটা অভ্যাস পেয়েছে। শ্বাসের বাহিরে জলনতকী তার গীত-বায়ের সহচরীদের নিয়ে প্রতীক্ষা করছে—ইঙ্গিতমাত্র যেন শব্দ হলে বাবে মৃত্যুগাঁতের আসরে। রাজধানীর করী কুসুমসঞ্চিত, অঙ্গের তার মৃন্মতির শূন্য-হাতা জ্যোতি, তার নয়নকরণে বিশেষ কটাক্ষ।

বিতার অন্ধ নীচের প্যানেলে দেখছি, রাজার হস্তিপৃষ্ঠে চলেছেন সম্রাটের বর্শনয়নসে। তিনি একটি জোরগল্পের অতিক্রম করছেন। কথা বাহুলা, এটি রাজপ্রাসাদের প্রধান জোরগল্পের (১।২৩)।

জুতার অন্ধ দেখছি, হিমালয় পর্বতের পাদমূলে মহাজনক এসে আসেন মহাসম্রাটের পদপ্রান্তে (১।২৪)। মৃত্যুর তার দৃষ্টিটি সজাই সজায়েবা মৃত্যুকর। সম্রাটের হাতে জলপান, মাথার গুটীভার, বসে আসেন কনকুসুম-বাঞ্ছিত এক প্রস্তুতরাসনে। তার চরণতলে দৃষ্টি উন্মেষে মৃত্যুশব্দ উদ্বাহুয়ে বেন তার মৃৎ-নিম্নেত কণী শব্দে। এ ধর্মপ্রচারের দৃষ্টিটি অঁকবার সময় কি রোখে সম্রাটের অজ্ঞেয়ন যেন শাকমোহ-মৃৎবাণে গৌতমবৃক্ষের প্রথম ধর্মপ্রচারের কথা জানক হুইছিল? তাই কি এই দৃষ্টি মৃত্যুশব্দ এ চিত্রের আবাস্যক অঙ্গ হয়ে পড়েছে?

তারপর চতুর্থ অঙ্কের আসে দেখছি, একটি **M. B. S. PATRAGAR** 4237 **পত্রিকা-কল্যাণ-মহাজনক-কলনী** সীলবাতে ভঙ্গন করছেন। মৃত্যুর সীলনী **পত্রিকা-কল্যাণ-মহাজনক-কলনী** (চিহ্ন-৭; ১।২৬ অমপ্রান্তে)।

চতুর্থ অঙ্কের দৃশ্যটি প্রথম অঙ্কের মত। সেই মূলোচিত মর্শ্বশীলমোলা প্রমোদক। সেই রাসপ্রাসাদে বসে আসেন মহাজনক আর সীলনী—সমের ঘোঁষাছায়া নববিবাহিতরূপে এই কক্ষেই প্রথম দৃশ্যে। কিন্তু পটভূমির কি বিরাট পরিবর্তন।

শিকারী শব্দহাতের কাজ অনুযায়ন করতে হলে প্রথম ও চতুর্থ দৃশ্যটির (অর্থাৎ চিত্র ৬ এবং চিত্র ৭-এর) একটি তুলনামূলক সমালোচনা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। পূর্বদৃশ্যে দেখছি সজীববিবাহিত মহাজনকের সবরূপে হৃদয়বিচলিত প্রাচুর্য। তার কণ্ঠে ক্রমান্বয়ে তিনি গানি বহুস্বা মনোহার। এবার সেখানে দেখছি মাত্র একছড়া শব্দ—বেন মৃত্যুক। পূর্বদৃশ্যে রাজার দৃষ্টি ছিল মৃত্যু নিমগ্ন, উদাসীন পঞ্চপ্রান্ত পথিকের আঁকি দৃষ্টি—তার হৃদয়প্রান্তের মৃত্যুর বিস্ময়াভার কল্পনা। এবার দেখছি, তার দৃষ্টি মৌলীনীলগ্ন, কল্পনার আশ্রিত। এবার তার কল্পনামূল্যে বিস্ময়াভার পঞ্চপ্রান্ত হৃদয়িকের অভিব্যক্তি সেই—দৃষ্টি হাতে তিনি রক্তা করছেন মৃৎবাণেত ধর্মচক্রমৃত্যু। তিনি সে পথের সন্ধান পেয়ে গেছেন এবার। অপর-পক্ষে, সীলনীর পরিবর্তনটা আরও অর্থবহ, আরও কঠোর : প্রথম দৃশ্যে সীলনী ছিল বহুবর্ণে নিরাকরণ, অথবা অত্যন্ত শব্দ বন্দাবন, রাজমৃত্যুর বাহনানুগে তার বেহায়া-চিত্র রক্তা। তিনি সেবার তার শূন্যস্বেরী-নিশ্চিত খৌকনোমত হৃদয়ের শিকল পুঞ্জির মহাজনককে বেধে রাখতে উন্মেষ ছিলেন। কিন্তু এবার দেখছি, তার অঙ্গ উন্মেষে গুলজবান। তিনি আর আশ্রয়-শররা নন। মহারাজের সঙ্কল্পের হৃদয় উপলব্ধি করে সীলনীও নিবাত নিমগ্নপ দীপশিখার মত কল্পনামূল্যের উপলব্ধি।

এ পরের সোয়ালে (১।৩০) শিবী জাতকের একটি কাহিনী। জাতক-বর্ণিত শিবী কাহিনী কিন্তু নয়। মহারাজের শিবীজাতের সে উপাখ্যানটি আছে তাকেই দৃশ্যিত করা হয়েছে। মহারাজ শিবী বসে আসেন রত্নসিংহাসনে। তার একহাতে শরণাগত কব্জর, শিবী জাতক সম্মুখে শোণশকী। পরের প্যানেলটিতে দেখছি মহারাজ নিজ অঙ্গ থেকে মাগে কেটে নিয়ে ভুগাশব্দে ওজন করছেন। চিত্রটি অনেকাংশে নষ্ট হয়ে এসেছে।





সম্মশান ও মহামেনন জাতকের চিত্র-সম্মিলিত প্রাচীরের সম্মুখে যে ছবিটি শত্ৰুও আছে, তাই শীর্ষদেশস্থি লক্ষণীয়। কোথাও নাগরাজ্য শত্ৰুপন্থনে প্রদান করছেন (১।৪)। কোথাও দৃষ্টি হৃদয়মান যশের স্বপ্নদৃশ্য (১।৫)। কাদমণী স্বপ্নমন্ডলের প্রতি অঙ্গা মাসপেশী প্রকটিত। কোথাও বা বড়তুল যামন মূর্তি (১।৬)।

মন্দির-স্বপ্নতির ভাষায় মন-পত্নিমন্দিরের সম্মুখস্থ ছোট কক্ষটিকে বলা হয়—‘অন্তরাল’। এ গৃহায় অন্তরালের প্রবেশপথে দুদিকে দুটি বিরাটকার বোমিসকূর আলোনা। একদিকে অবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণির (১।৪ ক) আলোয়, অপরদিকে বোমিসকূ বজ্রপাণির চিত্র (১।৯)। পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে দাঁড়ানু বোমিসকূ পদ্মপাণির সম্মুখে।

স্বীকার করতে লজ্জা নেই, এ পদ্মপাণিকে কবীরা কল্পের মত কলাম, অথবা এঁকে দেখবার মত তুলি আবার নেই। শব্দ এতটুকু কলতে পারি এ চিত্রে এমন একটা কিছু আছে যার জন্য এঁর সম্মুখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকা যায়। বারে বারে কিরে কিরে এঁকে দেখলেও চোখ ক্রান্ত হয় না—সীঁড়িত হয় না। অল্পতার একাধিক চিত্র আছে বা নাকি শব্দে বোঝা দিয়ে বা বস দিয়ে আঁকা নয়—কেন তার মধ্যে হাজার বছর ধরে বন্দী হয়ে আছে শিল্পীর একটি অমূল্য কথা, একটি অপ্রকাশিত ধ্যানের মন্তা? বা খেলা নয়, ঢাকা। তবু তা যে আছে তা অনুভব করা যায়, উপলব্ধি করা যায় প্রাচ্যতার ঐকান্তিকতার নিয়ে ঐ চিত্রের সামনে এসে দাঁড়ালে। এ চিত্রটি সেই ক্ষতের। বিশাল চুনের গভীরতা যেমন তার উপরিভাগের নিম্পন্দ স্থপতিধার স্তম্ভ হয় না, যেমন তা অনুমাননির্ভর—এই অবলোকিতেশ্বর মূর্তির ভাষায় ব্যক্তনাও তেমনি অনুভূতিসাম্পদ। বোধ করি একেই আদর্শ অবলীলনাথ বলাতে চেষ্টাছেন—চিত্রের প্রাণ, তার ব্যাধ।

এই চিত্রে সেই বাগ্দের মর্মবন্দী উন্মাদন করতে পারব না, তবে বহিঃপ্রাণ বা স্থপতিধার কিছুটা আজন্ম বেগুয়া পেতে পারে। চিত্র—৬ হচ্ছে সেই অপটু-প্রদায়ের ফলস্রুতি। এ চিত্রটির মর্মেচ্ছটন করতে হলে অবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণির দার্শনিক তত্ত্বটিকে বুঝে নিতে হবে। অবলোকিতেশ্বর একজন বোমিসকূ—স্থপতিধারের অংশিক অবতার, তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন—এ বিশ্বস্তপঙ্কজের যাবতীর লীলার মূর্তি না হওয়া পর্যন্ত ব্যক্তিগত বিবাহ-মাতে লগ্নেই হবেন না। তিনি হৃদয়কু, কিন্তু জগতের সব পাশী-প্রাণীকে নিয়েই তাঁর মূর্তিমার্গে অভিযাত্রা। এজন্য তাঁর চারিটে একটা বৈপরীত্য আছে—সব পাণ্ডা ও সব হারানো। বোমিসকূর ঐ ঐকতসত্তা—রাজনিক ও সাত্বিক-সত্তার-সংযোজন-টিকে অর্ধ-দক্ষতার মত করেছেন অল্পতা শিল্পী। অবলোকিতেশ্বরের উন্নত মস্তকে পরিচয়ন রূপচিত রাজমুকুট, কণ্ঠে দাঁড়িয়ে নিরেয়েন মূরার সতনবী, সর্বাঙ্গের আভিজাত্যের ব্যক্তনা। তবু ওঁর আনন্দ-মুগ্ধিতে, কহুনাথন আনন্দে ডাসের মহিমা, ভিত্তিকার বিবর্তিত ধারা। হৃদয়মূর্তির পদ্মপাণিটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। শিল্পী সেখানে মহান বিশাল কিছু আঁকেন নি—তারকাচিত্রিত শৈল আকাশের অসীমতা, স্থানান্তরিত তুফানমণী পর্বতমালায় গান্ধীর্ষ অঙ্গা দিগন্ত-অন্যসারী মহাঅবস্থার কোন পরিকল্পনা নেই সেই পদ্মপাণিতে। আছে—এই দুনিয়ার ছোট-ছোট হাসি-জুহু, বরোয়া ঠুকে : গান্ধী, কিম্বদ-কিম্বদী, কৌক-মিহ্মন, উল্লসনরত বানর, নৃগলসার-সীলিত পাখি এবং প্রাসাদ-বোজা। সমস্ত পদ্মপাণি বেন সোড়ার তেজস্বী করছে : ‘অন্যথা বন্ধন মাতে মহানলম্বর লাবি মূর্তির স্মার।’

অবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণি

এ সূচক দেখুন, অবলোকিতেশ্বরের বামে আছে এক শাখাশিখনী। পদ্মপাণির নারীক শীর্ষমূর্তি, প্রায় নিঃস্বরণ, অথ মাড়-ভাষে ছাড়া ঐ অনাবতার তনুসেই অন্য কোন লাস্যমণীভাষের ব্যঙ্গমাত্র মাই। পদ্মপাণির ঐ অন্যথা কণ্ঠারের প্রকোপে জার্মান পণ্ডিত ভট্টর জিম্বার বলছেন, ‘ওরা যেন সব শত্রুর মেষ : হৃদয়মূর্তিকে চর্যাস্য থেকে ঘিরে ধরেছে। তবু ওঁদের আগাত-অসম্পত্তির মধ্যেও কি জার্মি-একটা ছন্দ আছে—ওরা পদপঙ্কজের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াননি। এ মেঘলজলের নেই বৈপরীত্যের আভাস।’—ঐ প্রতীকটিকে আরও



একটু বিস্তার করে আমরা বলতে পারি—পরতের পুত্রীভূত মেঘসমূহ হঠাৎ বর্নবিবর্ণ হ'ক না কেন, তারা সারা আকাশকে চিরকাল চিহ্নভেদেই আড়াল করে রাখতে পারে না। শব্দসমূহের বৈশ্বব্দীপিত সে কল-সম্ভার ভেদ করে বেগিরে আসবেই।—এখানেও তাই হয়েছে।

পাশ্চাত্য-শিল্প-সেবার অন্তান্ত চোখে হয়তো আমরা এ-চিত্রে কোথাও কোথাও নারী-সংলগ্নের ছুটি বা ত্রয়োদশিকাল-ভিত্তিক দেখতে পাব। যেমন তখন হাতের কনুই অথবা বাঁহাতের কাঁধের কাছে। আসলে এগুলি যে ছুটি নয় তা হোক বাবে এখন পরবর্তী নবম পরিচ্ছেদে ভারতীর চিত্রের ধ্যান-ধাতুল্য রকম আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব। অশান্তত এটুকু বলে রাখি যে, ভারতীর চিত্রশিল্পী বাস্তবানুসার চিত্র অঁকার ক্ষেত্রে কায়-প্রত্যঙ্গী প্রতিরূপ অঁকার দিকে বেশি উল্লাসী। সংস্কৃত-কালে আজানুলিখিত বাহুর সূক্ষ্ম কবিত্ব্য করিতুলের তুলনা করে থাকেন। চিত্র-১০ ক-এও আমরা সেইটাই দেখবার চেষ্টা করছি। অঙ্গলোক্তিস্থরের ভূপিতে নড়িলে রজনবশিতে অশ্লিষ-সংলগ্ন কেন্দ্র দেখা যাবে একে সাতত-মজলের আলোকচিত্র-ধর্মী বৈদ্যুতিক কেন্দ্র দেখাবে তা আমরা পাশাপাশি একে দেখাবার চেষ্টা করছি। হস্তিকুম্ভের প্রতীক থেকে ছুটি বাহুর বাঁহরণ রেখা কীভাবে তরপারিত হয়েছে তাও দেখানো হয়েছে। জল-সামুদ্রো চিত্রের এই হুপালতর ঘটনাকে বলা হয়—সাদৃশ্য, যেটি ভারতীয় চিত্রের বড়লোকের অন্যতম জ্ঞান।

অঙ্গলোক্তিস্থরের পশ্চাদ্ধারি পাশের একটি প্যান্ডেল ছিল নগ্নলোকের চিহ্ন ধূসা। চিত্রগুলি নিম্নলিখিত আকৃতিতে। একটি প্রাচীন অঙ্গলিপি দেখে একটি বর্ণসমূহ এখানে অনুকৃত করে দিলাম (চিত্র-১)। কল্যাণিস্থানের কেন্দ্রে আরেন নাগরাজা ও রানী। তাদের ঘিরে আছে ময়ূর নরনারী, বিভিন্ন ভূপিতে। রাজারানীর এই ধূসা হৃদিতর সূক্ষ্ম অঙ্গ-লোকিত্রের পশ্চাদ্ধারি চিত্রে (চিত্র-৮) লক্ষ্য-বর্ণালিতর চিত্রিত তুলনীয়। তা-ছাড়া এ-ধর্মিতর সূক্ষ্ম সন্তত-বিহারে বিশ্বান্তর-মাত্রীর (চিত্র-৬০) ধূসা হৃদিতরিতর তুলনা চল। কে কার অনুকরণ জানি না, কিন্তু বিভিন্ন গৃহের তিন-মোড় বর্ণালিতর ঘন-হয়ে-বসা ভূপিমটি এক জাতের। তিনটি চিত্রের তুলনামূলক অঙ্গলোচনা করতে বললে কল-এবের মধ্যে আলোচ্য-চিত্রের পূর্বে হৃদিতরিতর সঙ্কটের উৎসরে ভাল; তিনটি প্তী-হৃদিতর মধ্যে সঙ্কটের ভাল হয়েছে চিত্র-৬০-এর হৃদিকায়-হৃদিতর। তিনটি ক্ষেত্রেই দেখছি, পূর্বেই জান-হাতে পালিশার নিয়ে প্রেমিককে মধ্ব-রস পান করতে লাহে। লক্ষ্য করে দেখুন, পরিচলনা এক-জাতের হলেও তিনটি নারীকায়-হৃদিতর বাহুরা যেন তিন রকম।

প্রথমতঃ আলোচ্য চিত্রের (চিত্র-১) নারীকায় যেন বিলম্বিত। সে যেন হুকে উঠতে পারছে না, ব্যাপাঘটি কি! তুলনার চিত্র-৮-এর মেয়েটি হাসছে; সেও যেন পূর্বে-হুহুত্রে চিহ্নে উঠেছিল; তার হাতে একটি বর্ণালি। অপরদিকে চিত্র-৬০-এর নারীকায় অতিবাহিতের শিল্পী অকর্ণ-বিকর্ণ-বৈবর্ণ-স্বন্দ-অভূতকাবে হুটীরেঘন—তার প্রসারিত অঙ্গ করে মধ্ব-শত প্রহরের মধ্য, কিন্তু প্রীতাতপমায় আমাদের মনে পড়ে যার—নহি নহি ঘোলাবি ঘোলাবিগরি গমি।—বিলোল-কটকে মাধবীভবের প্রতি আকর্ষণ ও ভীতির অঙ্গ-বর্ণসমূহ।

আমরা তো মনে হয়েছে অঙ্গলোচ্য চিত্রের (চিত্র-১) নারীকায় অঙ্গলোচ্য মধ্যকায়ের মেঘসমূহের একটি চরণ যেন অনুবর্তিত : "প্রত্যাদেশাঙ্গলি বা মধুরো বিস্মৃত-বিলাসম্।" অর্থাৎ—দীর্ঘদিন যক প্রবাসে থাকার প্রোহিতভূতিকা নারীকায় মাধবীরসের আশ্বাস-ভুই পূর্বে নয়, ঐ সূক্ষ্ম ভুলেছে তার হৃদিকায়-ভূপিমও।

তুলনার আবার চিত্র-৮-এর বর্ণসমূহজাত দেখে আবার মনে পড়ে যাচ্ছে রূপসমূহের একটি 'অঙ্গলোচ্যনাকাকে :

বর্ণসমূহ পরিভোজনদর্শিনীর বর্ণপূর্বমানুষ্যসংলিখিত।

মায়ার শব্দময়নাকায় ভাব-বিনিময়িত-বর্ণীকরণম্। [রূপসমূহ XIX, ২৮]

অর্থাৎ মেয়েটি যেন বর্ণসমূহ নিজ প্রতিবিন্দু দেখতে বাসত ছিল, সহসা শিখন ভেঙে তার

স্বয়ংক্রিয় স্বপ্ন করলে সে যেন সচকিতা,—পিছনে ঘিরে পরিচিত প্রেমম্পদকে দেখে উৎসাহে হঠাৎ উঠেছে।

কবিদাসের প্রভাব অজস্র-শিল্পীর উপর পড়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট। অজস্র গৃহস্থালি যে রাজকুলের অনুগৃহে নিহিত সেই স্বাভাবিক-সুপতি রূপসেন বিবাহ করেছিলেন গৃহস্থসম্রাট শিবতীর চন্দ্রপুত্র বা বিজয়ানন্দের আশ্রয় প্রভাবতী গৃহস্থকে। আমোদ্য মৃত্যুর পর বিজয়ানন্দ্য সনাক্তিবা কন্যার রাজবাৰ্ষ পরিত্যক্তার জন্য যে স্বীয় রাজসভার কয়েকজন অমাত্যকে স্বাভাবিকরাজ্যে প্রতিলেখিলেন তার ঐতিহাসিক নজির আছে। ফলে, কে বলতে পারে স্বয়ং কবিদাস ঐ গৃহস্থালির নিরাপত্তা সেখানে দেখেছিলেন কি না? কে বলবে, অজস্র-শিল্পী স্বয়ং কবিদাসের মতোই ঐ শৈল্যগুলির আদর্শ শূন্যেছিলেন কি না।



চিত্র-১১। নন্দিনী ও গৃহস্থ।

উত্তর-প্রাচীরে পাঁচটি চৌদ্দপাশে পাঁচটি দৃশ্যের সমাহারকে একত্রে বলা হয়—রাজপুত্রের অভিষেক-দৃশ্য (চিত্র-১০)। প্রথমেই দেখছি, একটু কিছু সিংহাসনে যুবরাজকে দৃ-জন কিস্কর অভিষেক-স্থান করানো। সিংহাসনের দুই প্রান্তে উল্লম্বমুখের দুটি হরিণমূর্তি উৎকীর্ণ করা হয়েছে। রাজপুত্রের সম্মুখে গন্যদ্রব্য-খালিকাবাহী একজন সামান্য-কিস্কর। শিবতীর দৃশ্যের কোণে একজন বৃদ্ধ সেবক হাঁটুতে ভর দিচ্ছে দাঁড়িয়ে। তার সম্মুখে অর্ধ-খাদ্যাবাহী একটি করম্বাবাহিনী এবং পশ্চাতে রাসের ঘড়া-কাঁখে একজন কিস্কর। ঐ তিনটি

হাতীর সম্মুখে একজন বিবলনা সুলসরী নিচু হয়ে বামনের হস্তমতে পায় থেকে কোন গম্ভীরা তুলছেন। এই মস্তপের ক্রমে কাহিন্যধারা কয়েকজন ভিক্টর ও সল্যাসী, হায়া অভিব্যক্ত-বান গ্রহণে সমবেত। এই কাহিন্যধারার ওপাশে আবার একটি মস্তপ। সেখানে একজন মহাভিক্টরকে দেখা যাচ্ছে। স্তম্ভের ও-প্রান্তে চারজন পুরোকারী মহাভিক্টরকে পান্যজর্ঘ্য দিতে আসছেন।



চিত্র—১০৫। রাজপুত্রের অভিব্যক্তি (অপসংস্কৃতি—১।৪)।

জ্যেষ্ঠ ইয়োজমানির মতে এ প্রাচীর-বিন্যস্ত মহাজনক-জাতকের অন্তর্ভুক্ত—মহাজনকের অভিব্যক্তি দৃশ্যই বেগুনে হয়েছিল এখানে। লালিতকলা-প্রাকারের প্রকাশিত গ্রন্থেও এ মস্তের সমর্থন। যখনজিৎ সিংও বেগুনি একই মত পোষণ করেছেন। পুরাতত্ত্ব-বিজ্ঞান থেকে প্রকাশিত জ্যেষ্ঠ সুল্যাপিত গ্রন্থে কিন্তু কিছু সল্যেই প্রকাশ করা হয়েছে। দুটি কারণে আমি এ কথা মেনে নিতে পারছি না। প্রথমতঃ স্থিতির প্যানেলে স্থানীয় মহিলাটি বিবলনা এবং তাঁকে সারা স্নান করছেন তারা ক্রিমুর, ক্রিমুরী নয়। স্বতঃই মনে প্রশ্ন জাগে—এটোতো ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার কোন সুল্যই সম্ভবপর নয়। স্থিতিরও—এখানে এ নারীটি যদি সীকলীই হবে তবে সে সুল্যবর্ণী কেন? পূর্বে-বর্ণিত মহাজনক জাতক চিত্রে সীকলীকে প্রতিটি চিত্রে গাঢ় শ্যামাঙ্গী করে আঁকা হয়েছে। অজন্ডা-শিল্পী সাদৃশ্য-সামঞ্জস্য বিষয়ে কখনও ভুল করেন না। বিশালতক জাতক, মহাজনক জাতক, বিদুর পশ্চিম জাতক, সিংহ-জন্মান, প্রকৃতি বড় বড় কাহিনী-চিত্রে কোন কোন চরিত্রকে ছায়া বা আঁটার আঁকে দেখিয়ে—কিন্তু তাদের আকৃতি-গত, বর্ণগত, ধর্মগত কোন বৈপরীত্য কখনও নজরে পড়েনি। আধুনিক চলচ্চিত্রের বধন সাদৃশ্য হয় তখন একজন টেকনিশিয়ান এ সামঞ্জস্য বা ‘কন্সিস্টেন্ট’ দেখবার জন্য বিশেষভাবে নিয়োজিত হন। অজন্ডা-শিল্পীর অন্তরে এমন ভেটমনি এক সাদাসত্য কণ্ঠ-নটুইটি-ম্যান উপস্থিত আছেন। তাই মন মনেতে চায় না এ সুল্যবর্ণী মেয়েটি সেই শ্যামাঙ্গী সীকলী।

প্রসঙ্গতঃ একটি কৌতুক বোধকর সেওয়া দরকার। আমি বলছি—সীকলী ছিল অপূর্ণ সুলসরী, আবার কলমি তাকে শ্যামাঙ্গী করে এতটুকুই শিল্পী। পূর্বে-প্রাগজ-স্তম্ভের বর্ণিত অজন্ডা পঠক এবং কলাহুল্য পঠিকা এ ক্ষেত্রে আমাদের কৌতুক দাবী করতে পারেন কই।

তাই বলি : অজন্ম-পিল্পীর চেয়ে মৌর্যবর্গ সৌন্দর্যের প্রতীক ছিল না; যেমন ছিল না তাঁর কারিদাসের—বার নারিক পুণ্ড্রিয়ারে খাতুং হওয়া সত্ত্বেও ছিল 'তনুপীঠা'। শূদ্রাঙ্গীর অভাব নেই অজন্মের, কিন্তু কৌতুককর ঘটনাই হচ্ছে এই—শাসাঙ্গী-পাটিকা নেটে করে রাখতে পারেন—বেে করটি নারী অজন্মের ভগ্নতে সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা বলে স্বীকৃত তাঁর সকলেই কৃকবর্ণ। সীলী কলো, মরণাহতা জনপদকলাশী কলো, গোশা কলো, ইজামাতী কলো—কৃক অপরা এবং কৃক-রাককুমারী জো ঘোর কৃকবর্ণের।



চিত্র—১১৪ মার ও বৃক্ষের (অজন্ম—১১০)

এবার সবে আসুন অন্তরালের কল্পিতর কক্ষে। যেখানে পশ্চিমদিকের প্রাচীরে বেদন—একটি বৃক্ষায়তন প্যালেস (১১০)। ভগ্নস্মারক সিম্বলকে সঠিক মার আক্রমণ করেছে (চিত্র—১১)। মারের তিন শাসনামলী আত্মতা—ডব, রতী ও রপা বিচিত্র বৃক্ষ ও মার ভগ্নায়তন সিম্বলকে চিত্রিতর উপত্য। আসের মধ্যে একজন আবার আসার-প্রসব। ধ্যানমগ্নতার সিম্বলকে চিত্রিতর মার-সৈন্যদের ভয়াবহ আক্রমণের বৃক্ষ। কাম, মোহ আর ভয়—কিন্তু জাননিভ-ভয়মগ্ন জিভোপ্তর মারায়। 'চুমিল্পম'দ্বারা নির্ধিকার। কিন্তু চুমিল্পম'দ্বারা কেন? তাহলে গল্প বলতে হয় :

মার' অর্থাৎ বৌদ্ধ শাস্ত্রমতে অনঙ্গ-দেহতা বহন শূন্যলেন সিদ্ধার্থ' সিদ্ধির সমাপিবর্তী হয়েছেন তখন তিনি ওপসারস্রোতের সম্মুখে উপস্থিত হলেন কপিলনগরুর একজন সংবাদবাহকের হস্তক্ষেপে। কালেন, স্বৰাজ্য! আপনি গৃহভ্রাণ করার পরে আপনাকে জাতিভ্রাতা দুরাত্ম সেবনস্ত বিদ্রোহ করেছিল। মহারাজ শূন্যোদনকে সে কারাগারে নিষ্কেপ করেছে। বিভীষিকারী বশোদনকে কালপূর্বক অধিকার করেছে।' 'সিদ্ধার্থ' এ মিথ্যা সংবাদ শ্রবণে বিশদ্রোহে বিভীষিত হলেন না, মন্দ্র হাসলেন শব্দে। মার প্রতিক্ষণ করলেন—তার মিথ্যার মায়াকাল বিদীর্ণ করেছেন সিদ্ধার্থ' গোতম। তখন সরসে হারির মার কলসেন, সিদ্ধার্থ! এ বিশেষ আমার অধিকার অনঙ্গীকার্য! কামনা-বাসনা এ পৃথিবীর মলমল-মল্লক। ইন্দ্রিয়-সুখই তার চরম লক্ষ্য। এ পৃথিবী ভোজের।

সম্যাসী কালেন, না! এ পৃথিবী ভাষের। কমনার জয়, বাসনার ক্ষয় আর ইন্দ্রিয়ের সবেমই এ পৃথিবীর চরম লক্ষ্য।

মার কালেন, প্রমাণ লাভ। কে তোমার সাক্ষী?

শ্রবণ পৃথিবীই আমার সাক্ষী!—এই বলে শাক্যর্ষি তার সাধনপীঠ থেকে বাড়িয়ে দিলেন তার বাক্স হস্ত। করাপর্দার দ্বিগুণ স্পর্শ করলেন মেদিনীক, বেন বরলীকে প্রশ্ন করলেন—হা! তুমি কি ইন্দ্রিয়সুখের দাসী হয়েই থাকতে চাও?

সরসে শিঙের উল্লেন সর্বসেবা ধরিয়াছাড়া—কী লক্ষ্য! ইন্দ্রিয়সুখের দাসই নাকি কাম। সে প্রভত শিরঃপাশে সলেন মার হল তুলসপারী। শব্দে শিলাকর্ণাধির ত্রিশূলধৃত বারানসীধামের মত ভুল্পননে-অবিভল জ্বল মহাসম্যাসীর সাধনপীঠ।

ভূমিস্পর্শ মৃত্যুর এই হল বজ্রনা। ঐ মূর্তি সার ভায়েতে লেখতে পারেন—অজন্মতার, সারনাথে, সালসার, মনঃসার এবং অসংখ্য সত্ত্বাংশলার।

গর্ভমণ্ডলের হুই প্রান্তে মূর্তি প্রস্তুত-নির্মিত নারীমূর্তি। একজন-গল্পা (১১১১), অপর জন-হম্বুর (১১২২)।

মূল-গর্ভমণ্ডলের বিস্তৃত বৃক্ষমূর্তি (১১৩০)। সারনাথ মগদনে বৃক্ষসেব বসে আছেন পশ্চাসনে—ধর্মচর মৃত্যুর। গাইত এই মূর্তিটির তিন দিকে আলো ফেলে বৃক্ষসেবের তিন বক্র জায়-বাজনা আসনকে দেখিয়ে দেবে। একপাশে আলো বরলে মনে হবে তিনি হাসছেন—অপরপাশে আলোকপাত করলে মনে হবে তিনি বিরগণিত। আলো সামনে বরলে মনে হবে তিনি ধ্যানমগ্ন। জা সত্যই মনে হয়, বিন্দু আমার কাঙ্ক্ষিত ধারণ এ শব্দে এক-সিঙেটাল খাট! অসংকে এ চাতুর্বে মন্ব হজেন দেখান। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, শিল্পীর মনে একমুখ ছিল না। আলোকসম্পাতের চাতুর্বে নিয়ে মাঝা মাঝানে না অজন্মতার জাত-শিল্পীর দল।

অন্তরালে পূর্ণাঙ্গকের প্রভাতে দেখি সারি সারি বৃক্ষমূর্তি (১১৪০)। অসংখ্য। না, সংখ্যাতীত নয়, এক হাজারটি। প্রাক্তনী নগরীতে একবার অধিবাসীদের বিকাশ উপলক্ষ্যে জন্ম বৃক্ষসেব সস্ত্র মূর্তিতে প্রকটিত হয়েছিলেন। এই প্রাচীর-রূপে সেই অমৌলিক খটনাটি বিধৃত।

এর পরে বোদিসত্ত্ব বস্ত্রাঙ্গার মূর্তিটি। তার পায়ের কাছে যে প্রত্নইসরীটি আছে, তাকে পারস্যদেশীয় বলে মনে হয়। অর কোমরবন্ধে চামড়ার বস্ত্রাঙ্গাটি প্রকট। বোদিসত্ত্বের বদন মূর্তি নারীমূর্তি। তার ভিতর একটি নিকম কালো। ইনিই কুলকুলকুমারী (১১৫০)।

অপূর্ণে হৃদয়বর্তী এই কুল-গ্রামকুমারী (চিত্র—১২)। বোধ করি, শিল্পের বিস্তার অজন্মতার গ্রিগিট হৃদহর স্বাক্ষরী নারীমূর্তিকে সৌন্দর্যের প্রত্যয়োগভার এ শিখরে ফেলে আসতে পারে। অজ্ঞ এরা গাত্রার্ণ কটিনাধরের মত কালো। উজ্জ-নাগা পদ্মকোণকতুল্য মূর্তি অববাহিত্র নরেন মেদিনীনিবন্ধ মূর্তি। ললিত কঙ্গালে কুণ্ডিত কেশবাম কোঁজহলী হয়ে কল্লুক পড়ে দেখছে তার অনিন্দ্যদুন্দ্বের মূখ্যান। নল্যটে মলি-মালিকাখচিত টায়ার, পুষ্প-মাজে ঘননিবন্ধ কবরীশাখ। নিরাকরখ উরেন বোজনের বৃক্ষ-বরসত্ত্ব। বিন্দু হার। ইনি





একটি রাজসভার দৃশ্য। এটি সম্ভবতঃ জালুসেরাজ মিত্রা'র পুনঃকেশীর রাজসভা (১৯১৯)।  
 ঐতিহাসিক, চাক্ষুসরাজ মিত্রা'র পুনঃকেশী সিংহাসনে আসীন। পিছনে  
 পুনঃকেশী, পুনঃকেশী  
 পুনঃকেশী  
 জন পারস্যদেশীর রাজদূত উপদেষ্টাদের অর্থ-পালিকা হতে একে একে  
 প্রবেশ করছে রক্তসভার। একজনকে হঠাৎ একছত্রা হস্তাঙ্গনা।

পূর্ববর্তকের সেওয়ারে চিত্রগুলিকে সম্মত করতে পারি নি। সেগুলি অধিকাংশই নষ্ট  
 হয়ে এসেছে (১৯২০)। শিবী জাতকের পাশের প্যানেলে (১৯২১) দেখি, একটি রাজ-  
 প্রাসাদের ঠিকানা দিয়ে তিনকরাী এসে সংবাদ নিয়ে—স্বারা একজন মহাভিক্রম সম্বন্ধিত  
 (১৯—১০)। পাশে দ্বার এবং দ্বারের ওপাশে মহাভিক্রমকেও দেখা যায়। তাঁকে দেখে মনে  
 হয় স্বারা বৃন্দাবন। কাহিনীটি বিশেষজ্ঞের সম্মত করতে পারেন নি। কিন্তু আমি হো  
 বিশেষজ্ঞের দৃষ্টি নিয়ে অজস্রা দেখতে যায় নি তাই অন্যভাবে মনে কোন নিম্নমুখ এ খণ্ডনা  
 কপিলাবস্তুর। বৌদ্ধ শাস্ত্রমতে বৃন্দাবনকে করার পর বৃন্দাবন কপিলাবস্তুরে এসেছিলেন  
 —মথুরা সমীপে নারায়ণারাম বিহারে করেছিলেন বাস করেন। তিনকরাী তিনি কপিলাবস্তুর  
 নগরে প্রবেশ করেন। তখন নাকি যশোবরা শূন্যাবস্থার কাছে আসতে জানিতোছিলেন—  
 রানসপুর তিনকরাী চাইছেন, এ অন্যায় সভা হয় নি তাঁর। কিন্তু বৃন্দাবন তা শোনে নি।  
 তিনি নগর-প্রবেশের পথে সারিপুরে ও মহামৌদ্যস্বরাজের মধ্য শেখ পর্যন্ত রাজবধুর কক্ষের  
 মাঝে এসে গাঁজিতোছিলেন। এ ছবিটি যে সেই দৃশ্য নয়, তাই বা জানব কেমন করে?

চম্পেরা মহাভিক্রম তাহিনীটি (১৯২০) কপিলা করে এবার আমর প্রথম পূর্না-মহাসির থেকে  
 বিস্ময় দেখ।

অম্বা আর মথুরা রাজের সীমানার হবে যাব চম্পানদী। অম্বা আর মথুরা বিবাদ-বিসবাস  
 লোকের আছে—অম্বা চম্পানদীর অতল জলের গভীরে নগরাজ্যের কথা কেউই জানে না।  
 সেখানে বিবাদ নেই, বিরোধ নেই, শৃংখলা আছে আর প্রমোদ—কিন্তু আর কোন। পূর্বজন্মে  
 এই নারায়ণের কথা শুনেন বোধিসত্ত্বের মনে বাসনা হয়েছিল ঐ নগরাজ্যের অধীশ্বর হওয়ার।  
 পূর্বজন্মে সভাই তিনি জন্মেছিলেন চম্পানদীর অতল জলের গভীরে, ঐ নগরাজ্যের প্রাসাদে  
 রাজপুত্র হয়ে। কালে তিনি হলেন নগরাজ্যের অধীশ্বর। নগরত্যাগ শূন্যনাকে বিবাহ  
 করলেন তিনি।

কিন্তু প্রতি জন্মে যা হেরেছে এবারও তাই হল। বোধিসত্ত্বের মনে শাসিত সেই। তাঁর  
 অন্তরের নিভুতে অনন্ত ভিক্ষা, তিনি কুমার পরশ্রামণী। মদন-মহাস্বচিত প্রাসাদে কিশোর-  
 কন্যার চতুর্দশ আয়োজনের মধ্যেও নগরাজ্য কেনে যেন উদাসী—অনামদা। নগরানী  
 সূক্ষ্মা লক্ষ্য করেন শাসীর অকর্তব্য। তিনি গোগনে পরামর্শ করেন মন্ত্রীরা সাল্য। নিজা-  
 চম্পত রাজ্য

মুঠন আমোদ-প্রমোদের আয়োজন হয়। কিন্তু তাকে শাস্ত হয় না ভেঁষা  
 মন্ত্রের বিক্ষুব্ধ হয়। মন্ত্ররাজ্যের পুনঃপুনঃ দেখে নারায়ণ শিব  
 করলেন, রাজত্বের ভাঙ্গন করে তিনি গোগনে সন্ন্যাস নেন। সূক্ষ্মের সূক্ষ্ম শিব  
 পূজক একাই। পূর্বে মহামন্ত্রী বাবা নেন, পূর্বে নগরত্যাগ সূক্ষ্ম আয়োজ করে গাঁজ,  
 তাই কাউকে কিছু জানালেন না। একদিন গভীর রাত্রে গোগনে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে  
 বৌদ্ধের পূজক পথে—জাগতিক বৃন্দাবন-বৃন্দাবন মূল অংশের করে দেখলেন তিনি। দেখে,  
 কেমন করে এই জগৎ-জাগতিক-জাগতিক মরজগৎক অকল-নিকলন সূক্ষ্মসংগত করা যায়।  
 রম্য ভাষা প্রজ্ঞাত হল। তবু পথ চলছেন নগরাজ্য চম্পেরা। কে তাঁকে দেখে সভা পথের  
 নির্দেশ? কে শোনে তারে তাঁকে হস্তির মন্ত? অজস্র জগৎ পথের অনন্ত মথুরা  
 অবশেষে দিনান্তে এসে আশ্রয় নেন পথের পাশে। প্রসঙ্গেরে বিজ্ঞান নিতে থাকেন তিনি।

তিন সেই সময় পথ দিরা যাচ্ছিল এক সাদৃশ্য। হঠাৎ তার নগরে পড়ে পথপ্রান্তে  
 জালুসেরা পড়ে আছে এক মহামন্ত্রী। চম্পেরা ওঠে সাদৃশ্য। এ যে নগরাজ্য! একে কি হয়



10-10 1 10-10 1 10-10 1 10-10 1 10-10 1

boiRboi.net

যাবে? যদি দেশ-বিদেশে এই নাগরিকের নাড় সে বেঁচেতে পারে, তাহলে তার জাগাই ফিরে যাবে যে! কিন্তু এ কি ধরা দেবে? সত্তার এগিয়ে আসে সামুদ্রিয়া সেই মহানগর বিকে। আশ্চর্য, নাগরিক কোন কথা দেন না—বিশ্ব প্রতিবাদে তিনি প্রবেশ করেন তার কাঁপিতে। অহিংসের অবতার বোধিসত্ত্ব কোন প্রতিবাদ করেন না। জগতের নিষেধ তিনি কোন দেন না—বিশ্ব প্রতিবাদে। জাগরণ কী বিকল্পনা! হাঁর হস্তকে একদিন শোভা পেতে হাঁরা-মুদ্রা-খচিত চন্দ্রমারাজ্যের রাজস্বত, তিনি আজ পথে পথে নাড় ঘেঁষে বেড়ান—সামান্য এক সামুদ্রিকার নির্দেশে।

এদিকে নাগরিক গৃহভাঙ্গা করার পরদিন প্রভাতে জেগে উঠে চন্দ্রমার মহারানী মাঝার হাত ধরে বলেন। যা ভয় করেছিলেন, তাই হয়েছে। সর্বনাশ হবে গেছে। রাজপুত্রী শূন্য হয়ে গেছে। সংবাদ পেতে ছুটে এসেন মহামন্ত্রী, সেনাপতি আর নগরকোষাল। দেশে দেশে চর পাঠানো হল—খুঁজে বার করতেই হবে নিরুদ্ভিষ্ট রাজস্বত। কিন্তু কেউ কোন সন্ধান পায় না। এতে এতে ঘিরে আসে কার্খকায় সম্ভানীর দল। মহারাজের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। তিনি যেন হারওয়ার মিশে গেছেন। দূরত্ব অনুশোচনার মহারানী শব্দা নিলেন। এসেন রাজকৈত। রানী বলেন ছেঁকর পায় নি, আমি নিজে একবার চেষ্টা করে দেখব। আমি তাকে খুঁজে বার করবই।

রাজকৈত মাঝা মেতে বলেন : তা তো হবে না মা। জুঁয়ি আজ আর এ দুনিয়ার এক নও। তোমার দেহের মাঝে নৃতন কীধনের লক্ষ্য দেখতে পাশ্চি বে। মহারাজকে আমরা হাবিবোঁছ, কিন্তু নাগরিকের ভবিষ্যৎ রাজ্যকে আমরা হারাতে রাজী নই।

রানী শূন্যার দৃষ্টিরের ভরে আসে অস্ত্রতল। সে কল অনন্দের, সে কল বেদনার। এদিকে সামুদ্রিকার সঙ্গে পথে পথে ঘুরে বেড়ান নাগরিক চন্দ্রমার। অকলী, প্রবলতী, বিবিশা—প্রভৃতি নিরা নৃতন দল : কিন্তু তার জাগরণ কোন পরিবর্তন নেই। কসরের আহ্বান, সেই বন্ধ কাঁপির স্বাক্ষর, সেই কাঁপির সূত্রে দূরে দূরে নাজ, সেই কোঁতুলসী বালকালের সোপান্যাত! অহিংসের অস্ত্রাত স্নিগ্ধ গৃহস্থের শূন্য—তে জ্বলে কবে হবে মৃত্তি। রূমে জ্বলে গেছেন তিনি তার আত্ম-পরিচয়। জ্বলে গেছেন—কোথা থেকে তিনি এসেছেন। তবু এতদিন হাতক হাতক হয়ে পড়ত নাগরিক শূন্যার কথা—ক্রমে সে-কথাও আর মনে হইল না তার। শূন্য মহানিবারণের, মহামৃত্তির সন্ধান বিজ্ঞান হয়ে বইলেন তিনি।

ওদিকে চন্দ্রমারীর অতল জলের গভীরে চন্দ্রমার রাজপুত্রীতে মেয়ে এসেছে বিহাদের কান্না। রাজপুত্রসে কথ হঠাৎ নবকালের মর্ছনা। স্তব্ধ হয়েছে বৈতানিকের বোলক। প্রতি সন্ধ্যার মহারাজের প্রমোদককে অব জটিল না রত্নসীপানসী, রাজনর্কী বাত-কাঁপিত্রস্তা। অলিন-নিশকতন পবিত্র হুত্রে নিবানন গোকে। ঘিন আসে, ঘিন যায়, কিন্তু বাব প্রতীকার রাজপুত্রীর প্রতিটি প্রস্তুতরখণ্ড স্তব্ধ হয়ে প্রহর গলে, সে ঘিরে আসে না। এ দৃশ্য আর সহ্য হল না নাগরানী সূমনার। তিনি একদিন গভীর রাত্রে গৃহভাঙ্গা করলেন গোপনে। খুঁজে তিনি বার কুড়িবই নিরুদ্ভিষ্ট মহারাজকে।

কাহিনীর যে পর্যন্ত কলহি আসে, এবার স্ট্রেট থেকে জ্বালায়নিকরি। চিত্র—১৫-তে তিনিটি খণ্ড দৃশ্য। বামপ্রান্তে দেখছি, 'সিহাসনে-আসীন সুবুদ্ধি' চন্দ্রমারকে। তিনি উদাসীন আনন্দ, তাঁর বাম হস্তেরে হস্তার পঞ্চদ্রষ্ট নানিকর অসিহারের কলন। লক্ষণীর, রানী সন্ধানকে শিল্পী এখনে দূরত্ব এংবেছেন। রাজার বামশব্ধের উপর থেকে ক'কে আসেন তিনি, আবার তাঁর দক্ষিণ দিকেও উপর'রুখে চরে আসেন। যেন উদাসীন রাজার ভাবনকে ঘিরে আছেন নাগরিক। রানীর দৃষ্টি আসেখোই তাঁর বাতুলতা ফুটে উঠেছে। এভাবে একই চিত্রে একই ব্যক্তিকে এক-ধিকবার আঁকা কারনটি যেন আনন্দিক চলাচল-পিল্পের 'সুপার-ইমপোজিশন' কলাকৌশলকে স্বয়ং করিতে দেয়। ঐ কলাকৌশল আজতার বাবে বাবে দেখেছি। বৃন্দ্যবে কাঁপিয়াকলুতে প্রথম প্রবেশ করলে প্রথম পিৎহদর্শনের অনিন্দে রাজকৈত



Illustration by: Sanyal, T. (Illustration: Sanyal, T.)  
 Published by: Sanyal, T. (Publisher: Sanyal, T.)  
 Printed by: Sanyal, T. (Printer: Sanyal, T.)  
 1st Edition: 1985

দেখছি তাকে ঘিরে নৃত্য করছে। সে হাই হোক, এখানে রান্না ও খাবার যুগল চিহ্ন ছাড়াও আছে একটি যমুন। সেও স্বাক্ষর—বাড়িরে ধরেছে একটি অর্ধাঙ্গলিকার কিছু অহাঙ্গলিকতা।

শতাই মনে প্রশ্ন জাগে—কোনটি এল কেন? সত্যতার কিছুকরণেই ধার্মিক দেখতে পাই রাসদেবতা। এমন একটি বৈদ্যবিশ্বের পশ্চিম দৃষ্টে কোঁকরগাছের ধার্মিক কি রসাতল ঘটাচ্ছে না? উত্তরে তিনটি মূর্তি মনে আসছে। প্রথমতঃ এই কামটি বিশ্বক—স্বাতন্ত্র্য-সাহিত্যে বলা হয়েছে স্বাধীন সম্মত নানাব্যয়ে নানাপ্রকার আন্দোলনের চেষ্টা করেছিলেন; ফলে বিশ্বক স্বাধীন উপস্থিতি অপ্রাপ্তিকর, স্বাধীনতার অন্বেষ। ১৮৪৭-৪৮ শিল্পী কীভাবে পরিচরিত্যে বোঝাতে চান—শিল্পের জালে অমরা, কল্যাণসাহিত্যের, হাসি ও কহরকে মিশতে ভয় পাই অমর স্বাতন্ত্র্য-দুনিয়ার হাসি ও কহর সহানুভূতি প্রত্যক্ষতা। বিবাহের শোভাযাত্রা ও স্বাতন্ত্র্য-দুনিয়ার পথে শব্দসাহিত্যের জড়ের উপর গিয়ে পড়ে। অমলা-শিল্পীও এলিক থেকে বিখ্যাতকতার হাত উমার। হঠাৎ এই মূর্তিতেই সত্যদর্শনবাহকের প্রবেশ পথে আটটি কুলুপিতে সারি-সারি মূর্তিমূর্তির তিক নিচে আটটি কুলুপিতে তারা আটটি মূর্তি-মূর্তি অকিতে কোন সন্দেহাবোধ করেনি। আমরা হলে কলতুম—“মিথুনে মূর্তি অকার আর আরগা পেলে না? তিক মূর্তি মূর্তির তলার তলার?” তৃতীয়ঃ হঠাৎ শিল্পী এই কোঁকর স্বাধীন হাতে উপস্থাপন করার জন্য অন্য অর্ধাঙ্গলিকার সেই প্রস্তুতি পরিবেশন করতে চেয়েছেন, যে স্বাধীন হয়ে পরিবেশন করেছেন বিশেষজ্ঞপীর প্রেত জীবন-শিল্প-রাসিক জালি-চাপলি তাঁর কলক কলক-বৈদ্য।

পথে পথে ঘুরছে এক উমারিনী নারী। সাপুড়িয়া পড়ার বেখানে গেলে শাপ খেলবে হাঙ্গ, সেখানেই ছুটে যায়। সেখানকার হাঙ্গ হরে ঘিরে আসে। হাঙ্গ শূন্যে এ তো সে নর। দিন যায়, মাস যায়, ক্রমে সেখানকার পড়ে। শাপ আর চলে না; মনের জড়ের চেয়ে সেহের জার বেশী বলে মনে হয়। পথপ্রান্তে বসে পড়েন মহারানী। এতকালে মনে পড়ে যায় স্বাধীনতার সাক্ষ্য-রানী। ওর সেহের অভ্যন্তরে চল্লিশ স্বাধীনতার তীব্রতা মূর্তির উপস্থাপন বৈদ্যবিশ্বের দল মাল্যবিশ্ব তখন শূন্য করেছে, কিন্তু নির্বিশেষে কি তিনি তাকে জানতে পারবেন এ ধরনামে? হু-চোখে কলের দ্বারা নেমে আসে রানীর। পথপ্রান্তে হু-শব্দে শব্দিত নারী অস্তিত্ব বস্তুদ্বারা চোখ বন্ধ করেন অকথ্যে!

জ্য—১৪-৪ গীতগোবিন্দে দেখছি এক রাজসরবার। মহামায়া বারগণীর স্ব-রম্যন অধিপতি উপস্থাপন (উপস্থাপন) বসে অছেন রত-সিদ্ধেয়ে। তাঁর চরণপাশে মন্ত্রী, অমাত্য, সেনাপতির দল। দেখছি এক কামীর পশ্চিমতকও। স্বাধীন মন্ত্রী অর্ধকলা, হাতে লাঠি, গায়ে চাদর। সকলেই কোঁকর হাঙ্গ কলক পড়ে কি মনে দেখছে। কী দেখছে ওরা? দেখছে সহস্রের বেলা। সাপুড়িয়া তার কালি খুলেছে। তার ভিতর থেকে বেগে এসেছেন জীবনবিশ্বের এক মহানর। অমর কী শান্ত, সমাহিত আত্মশ্রম জাব তাঁর। সাপুড়িয়ার কামীর তলে তলে দুলছেন তিনি। (সাপের ছবি চিহ্ন—১৪-৪ বাইরে আরও গীতগোবিন্দ)।

কিন্তু শব্দের বাইরে ও তার মূর্তি? ছবিবলনা শীর্ণসেবা মূর্তিমূর্তিনা এক কলকামী নারীমূর্তি। (গি—১৪, মধ্যাংশ)। কোন ভিখারিনী হয়ে বোধ হয়। কীকল-ওর মূর্তি তো ভিখারিসুলভ কাড়লসলা দেখছি না। কীমালিন বহিরের চোখ করে বিকলিত হচ্ছে যেন আভিনাভের জ্যোতি। তার হাত ধরে দাঁড়িয়ে কলক এক শিশু—মাথের দিকে ভিজান্দ, দৃষ্টি মেলে। আহা কী সুন্দর! ভিখারিনীর এমন সন্তান হয়। মনে হয় যেন কোন রাজকুমার! মাথের চোখে নেমেছে মূর্তি জলের দ্বারা। যেন দীর্ঘ মূর্তি পথ জড়ের কবে অবশেষ এসে দাঁড়িয়েছে তীব্রশব্দের শেষ প্রান্তে, দেবদানবের দ্বারে। তার একটি হাত এই শব্দের কাঁধে—যেন গেল দিতে কলকে। দরবারে পালা—এ তাঁর বাপ!

মুখ হয়ে দেখছি নাসরানী সুন্দর এই তীব্রতার ফলশ্রুতির মূর্তি। কোন যেন তন্দ্রা হয়ে গিয়েছিল। সত্যিকার যেন পেলাম বস্তুজগতের একটি বাসকন্ডের প্রশ্নে। এ-পুলো কিসের ছবি?

সুন্দর স্নেহ শুন উত্তর—যেথেকে বুকলে না? সাপ খেলানো হচ্ছে। স্নেক-চার্মার। ও-সব দেখলেই বড়লোক টুকিষ্ট, হারজ আমাদের মতো পকে-বাটে সাপ-খেলানো দেখে না। চল সে, অনেক দাঁতি আছে এখনও।

সবলকমে ওরা চলে গেলেন সাপ-খেলানোর এ-চিহ্নটি এক মজার দেখে কি না দেখে!

সাপুড়িয়ার বাঁশর তালে ভালে বুকেছেন নাগরাজ—আখনিমণ্ডল তিনি—হঠাৎ দৃষ্টি পড়ল স্মারশযে। বিদ্যুৎস্পর্শের মত চমকে উঠলেন একবার। তারপর স্থির হয়ে গেলেন। নাগ-রাজের পূর্বস্মৃতি ঘিরে এসেছে। ঐ স্মার-প্রান্তের তিথ্যাক্রমিক দেখে নিবাত-নিষ্কম্প দীর্ঘশ্বাসের মত স্থির হয়ে গেছেন তিনি। ভালভল হল মৃত্যুহাস্যে। বিরক্ত হলেন কাশীরাজ। বিস্মিত হল সাপুড়িয়ার। কিন্তু নাগরাজের অভিজ্ঞান ঘিরে এসেছে তত্ত্বক্ষে। ঐ আখিনি তিথ্যাক্রমিক উপেক্ষা করতে পারলেন না তিনি। সব ভুল হয়ে গেল তাঁর—নরসেই ধারণ করে এগিয়ে গেলেন স্মারের দিকে। তিথ্যাক্রমীর ভীত করালদলি ভুলে নিলেন নিজ হাতে, বললেন—অপরূপ করেছি, ভূমি ক্ষমা কর আমাকে!

নিরুদ্ভিষ্ট নাগরাজ চম্পকায় কথা কে না জানে জন্মস্মৃতি? পরিচর পেরে কশীশ্বর উপগঙ্গসেন সিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন। সম্মুখানে হাজার চম্পকরাজকে এসে কালেন আর একটি রক্ত-সিংহাসনে। রাজ্যসংস্কার থেকে নাগরানী সূর্যনার উপমুখ কল-কুল নিরে এল পরিচারিকার দল!

পরের প্যানেলটিতে দেখছি কাশীরাজ উপগঙ্গসেন আর নাগরাজ চম্পকায় বসেছেন মৃদো-মৃদে। বোধিসত্ত্ব চম্পকায় খোলাছেন হর্মের অভ্যুদয় (চিত্র—১৬)।



চিত্র—১৬ হ চম্পকায় আরও—কাশীরাজ উপগঙ্গসেন ও নাগরাজ চম্পকায়।

এই দরবার-দৃশ্যে এক প্রান্তে শিল্পী কিছু কৌতুককর খণ্ড-চিত্র এঁকেছেন। নাইকব মাঝে মাঝে যেমন খণ্ড-দৃশ্যে বিদ্যুৎক এসে দর্শকদের মনটা হাল্কা করে দিতে যায়, তেমনিও শিল্পী যেন চম্পকায় রাজারানীর মিলন-দৃশ্যের পরে যেমনি এক খণ্ড-চিত্রে কিছু কৌতুক পরিবেশন করতে চেয়েছেন।

নাগরাজ হর্মের কথা শোনোচ্ছেন। এ-পাশে কয়েকটি লোকের জটকা। মূখের ভাবভঙ্গ্য দেখে বেশ সোচ্চা যায়, তাদের মধ্যে কেউ কিশাসী, কেউ অকিশাসী। কেউ ধর্মকথায়

আত্মমগ্ন, কেউ পারজলৌকিক ভবের চেয়ে পৌকিক লাভের আশার সঞ্চিত। একটি লোককে দেখছি, যেন স্পেন বা ফরাসী দেশীর পোশাক-পরা। একজন সুতনুকা পরিচরিতা তখন হঠাৎ নামস্বরের মূখ-নিঃসৃত স্বরকথা শ্রবণ করছে। তার দক্ষিণহস্তে ফল ও মিষ্টমণ্ডপে একটি অর্ধ-খালিকা। শ্রমের থেকে একটি নীচ জাতীর হস্তলাভের সুকৌশলে এ খালিকা থেকে ফল চুরি করছে। তার দৃষ্টিতে ফটে উঠেছে লোভ এক ভরের সর্গমহাব। ঠিক পরের ব্যঙ্গনিকটি এ চৌব-বৃত্তিটি দেখতে পেয়েছে। সে সামর্থ্যবতী তখন পরিচরিতাটিকে বেন সাক্ষ্য করে দিচ্ছে। বিভিন্ন পাঠ-পাঠী এমনই একটি ঘটনাস্রোতে বেন গা জ্বলিয়েছিল, আর শিল্পী বেন এক স্মরণশব্দে এই স্বভাব-বৃত্তিটিকে শাসন করে ধরে ফেলেছেন হঠাৎ।

প্রদল্যন্তরে হাবার পূর্বে আর একটি কথা কলব : আশনি-আমি ফুলে সেলেও শিল্পী ভুলতে পারেননি প্রথম হৃদয়ের সেই বিস্ময়-বামনকে। এ মিলন দৃশ্যে সে আবার ঘিরে এসেছে। নামস্বরের হাবার উপর দিয়ে বেন টুলে খাঁড়িয়ে সে টাঁকি মারছে। তার হাতে প্রকণ্ড একটি তরবারী। হুতাপি করে তার মেঘাকৃতির তুলনায় অতি প্রকণ্ড আত্মবীরাগে সে বেন বলতে চাইছে—‘অহিস্যের কথা মতই প্রচার কর, রাজা রক্ষা করতে হবে এই অস্ত্রের সাহায্যেই’। কে জানে, হাবার ‘উন্মাদ-রিক’ এ বামনের অশ্রু-আশ্রয়নের মাধ্যমে শিল্পী হিসেবে-তত্ত্বকেই একটি বাস্তবিক অঘাত হানতে চেয়েছেন।

এ রুরোপীয় পোশাক-পরা মানুষটিকে দেখে মনে পড়বে অজ্ঞানের বিভিন্ন চিত্রে অনাথ্যে বিশেষণকে করে করে দেখেছি। হোলোলীস, পরসীক, গ্রীক, শক, শহলুকসের দেখেছি বহু চিত্রে। তাদের মূখকৃতি, তাদের পোশাক দেখে কোথাকার বার, বৌদ্ধ শিল্পীর একান্তবাদী



চিত্র—১০৪ বিভিন্ন জাত থেকে সংগৃহীত বিশেষণের আলেখ্য।

হলেও, তদানীন্তন জরতকর্ষের মধ্যে বহির্বিবশের যোগসূত্রটি সম্প্রদায় সচেতন ছিলেন। হঠাৎ এই শিল্পীর হলে অনেকেই ছিলেন—বীরা বৌদ্ধ ভিক্ষু, হাবার আগে, পূর্বপ্রদ্যে, রাজত্বকবীর হৃদয়দলি অতি নিকট থেকে দেখবার সুযোগ পেয়েছেন। অজ্ঞতার একান্ত গুরুত্ব এই সব বিশেষণের বাস্তবায়ন ছিল না নিশ্চয়—কিন্তু কী নিখুঁতভাবে এদের পোশাক, শিরদ্বন্দ্ব, মূখ্যবস্ত্র একত্রেই এই নিঃস্বপনীয় শিল্পীর শৃংখরে স্মৃতির উপর নির্ভর করে। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ থেকে সংগৃহীত সামান্য কয়েকটি নমুনা—চিত্র—১০৬তে সমিবেশিত করলাম এই প্রসঙ্গে।



তা মনে হল—কিন্তু আমি ভাবছিলাম অন্য কথা। প্রায় শিশু-বিশারদ স্তরের বিনয়ন বলেছেন :

‘অল্পমাত্র শিশুী ব্যক্তিই একেধে তার প্রত্যেকটির গিমনে তাঁদের স্বাভাবিক অভিজ্ঞতা ছিল। চাঁদ, জলস্র বা ছব প্রায়ের বোধ শিশুীরা বুঝেও শীঘ্রের তা জানতেন যে সব চিত্র একেধে, তার পশ্চাদ্ধী লক্ষ্যে। স্বরভাষী লক্ষ্যকেই তাঁদের সম্পন্ন দেখতে হয়েছে। কিন্তু চমকতার বোধ, শিশুী যে সব স্বভাবেরী দাব্যবাহী সাদৃশ্যবাহী চিত্র একেধে, তাইব যে-সব আদর্শ-কল্পের অভিব্যক্ত স্থিতির সনে স্ফুটন তুলেছেন সেগুলি তাঁরা অতি বিকট থেকে দেখেছেন। আর তাই সেগুলি এত বহুত্বমূল্য, এত স্বাভাবিক হয়েছে।’

তাই ভাবছিলাম—এ কথা যদি সত্য হয়, তাহলে কোন ব্যক্তির অভিজ্ঞতাকে সম্পন্ন করে অল্পমাত্র বোধ শিশুী কাশীরাঙের দরবারের কাছের-দ্বারে ঐ অলিখিতীয় ভাববক্তব্যকে স্থাপনিত করেছিলেন?

এদিকে ঐ বিবরণীর চিত্র দেখে মনে হয়েছিল, শিশুী বিবরণীর খুব কাছে থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন। রাজসভার নিখুঁত আলোকা দেখে মনে হয়, যেন কোন এক বহুত্ব রাজ-দরবারের সপক্ষে শিশুীর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

কল্পনার রূপ আলেখ্য করে দিলাম। কে জানে, এই অনুবদ্য দরবার-দৃশ্যটি একেধে সে বোধ প্রকাশ তিনি হয়তো শতাই ছিলেন এক রাজপুত্র। সেই অজ্ঞাত ভিক্টর কি আর থেকে হাজার বছর আগে একদিন গোপনে ভ্রাম্য করে এসেছিলেন তাঁর রাজপ্রাসাদ, স্বতঃ নিরোধেছিলেন ভ্রাম্যাত হৃদয়ের ধর্মের আর সন্ধ্যের? কে জানে, হয়তো তিনি নিজেই ভ্রাম্য করে এসেছিলেন আসন্ন-প্রসঙ্গ এক হস্তজাগ্রিত সীমান্তনীকে কোন অবলম্বী-বিস্মিত-ভাবস্রাবী কিংবা উল্কাগ্রস্তার এক নির্জন কক্ষে। পৃথিব্যসনে আচ্ছাদিত করেছিলেন অস্তরের রক্তভ্রাম্যকে। হয়তো দীর্ঘদিন নিম্নে ছিলেন এই গৃহা-মন্দিরে আলোকা স্থাপননের কাজে। আর তারপর কি কোন এক অলম্ব-উল্কাগ্রস্ত গোপালি লগ্নে আলোকা-নিবন্ধদৃষ্টি প্রাপ্ত প্রথম হঠাৎ মূখ তুলে দেখতে পেরেছিলেন এই গৃহা-মন্দিরের সম্মুখে, ঐ স্বতন্ত্রটির পাদমূলে দাঁড়িয়ে আছে একটি অলিখিত নারীমূর্তি—অনিদ্যাকালিত এক সের্বশব্দর হাত ধরে? হঠাৎ কি সেই ভিক্টর ফিরে পেরেছিলেন পূর্বে অভিজ্ঞান, চিনতে পেরেছিলেন ঐ ভিবালিসকে, অস্ত তর তেব-দুর্ভাবকালিত শিশুদৃষ্টিতে?

হে অপরিচিত মহান শিশুী, আর হাজার বছরের এগার থেকে হোমোতে প্রশ্ন করতে চাই—তুমিও কি শিউরে উঠে শিব হয়ে গিয়েছিলে নিবাত-নিষ্কল দীর্ঘশ্বাসের মত? নাথকো চম্পায়-মত তুমিও কি গৃহার স্নানদেশে এগিরে এসে স্বলোছিল—অপতব করোঁ, অমকে কমা কর?

জানি, আমার এ প্রশ্নের সত্য বৃষ্টি অথবা বৃষ্টি মতবে এ গৃহা-প্রভর্তি! তবু বিশ্বাস করতে মন চায়—এ সত্য! না হলে কোন ব্যক্তির অভিজ্ঞতাকে সম্পন্ন করে সেই বোধ-প্রকাশ আঁকতে পেরেছিলেন এই মহান দৃষ্টিপট!



## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

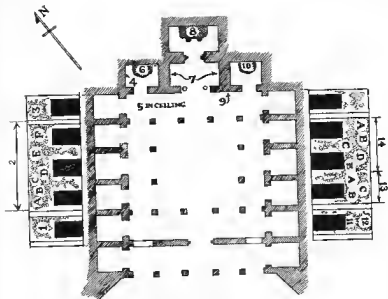
### শিবতীর গুহা-বিহার

আমরাই বলছি, অজন্মতার ত্রিশটি গুহা-মন্দিরকে অবস্থান অনুযায়ী এক-দুই-তিন ইত্যাদি কক্ষের দেওয়া হয়েছে। এর ফলে, শিবতীর গুহা-মন্দির মানে এ নয় যে, প্রাচীনতার দিক থেকে এটি শিবতীর। বস্তুতঃ, এটি প্রথম গুহা-মন্দিরের সমসাময়িক। অর্থাৎ, মহাবান বৌদ্ধ যুগের। আকারে প্রথমটির অপেক্ষা কিছু ছোট। মন্দিরের হালকাবরাতি ১৪-৬×১৪-০ মি। এটিও বৌদ্ধ প্রমাণের আবাসস্থল। অর্থাৎ বিহার। মূল মন্দিরের দ্বারিকে পাঁচটি করে এবং সামনে আরও দুটি করে ছোট কক্ষ এর সংলগ্ন যুক্ত। এগুলি গুহা-মন্দির অঙ্ককার কুটুর্বি। প্রথমের মত শিবতীর মন্দিরেও কৃত্রিম বৈদ্যুতিক আলোর ভাণ করে দেখাবার ব্যবস্থা আছে। এটিও প্রাচীন-জিহ্বের সম্ভারের অজস্রতার অন্যতম প্রমাণ অক্ষর। এখানে প্রাচীর-চিহ্নে নীল রঙের প্রাকৃতিক লক্ষ্য করলাম। সম্ভবতঃ চারটি স্তম্ভ এবং দুটি অর্ধ-স্তম্ভ (পিলাম্পোর)। প্রবেশদ্বার দিয়ে সভ্যমন্দিরে প্রবেশ করি। ঘেঁষি, পদমস্তুরা অনেক জায়গার ঘসে ঘসে পড়েছে। গুহা-মন্দিরগুলি খনন করা হয়ে গেলে, বৌদ্ধ শিল্পীর দল তার উপর মূর্তিকার একটি আন্দরণ হিতেন। মূর্তিটি সংলগ্ন গোমার এক আশ্রিত আরও কিছু দেখানো হত। এই পদমস্তুরা বা আশ্রিতের ফে অস্বাভাবিক ২৫ থেকে ৪০ মি. মি। এটি মূর্তিরে গেলে তার উপর জিমের উপরকার খোদার মত পাতলা ও হালকা একটি ছুনের আশ্রিত দেওয়া হত—যেন পদ্মের কাজ। তার উপর মিরিয়ারি-রঙের রঙিন শেলিলে চিত্রেরে দল অনেকের বহিঃস্থটি আঁকতেন। সবচেয়ে প্রাথমিকভাবে মূল অথবা ভেতর কিছু ছোট তার উপর ফল-রঙের কাজ করতেন। বিশেষজ্ঞা বলেন, 'টম্পেরা' ও 'ভরাম' দুই শব্দটিতেই তারা এঁকেছেন। অর্থাৎ, ছুনের মূর্তি আশ্রিতটি ভিত্তি থাকি অবস্থার এক তা মূর্তিরে ফলার পর মূর্তিবেই আঁকা হয়েছে। অধিকাংশে চিত্রই অথবা দেওরাম-গায় অবস্থার মূর্তিরে ফলার পর আঁকা। ক্ষেত্রবিশেষে রঙ বেশ ছোট করে দিতেছেন—ভেতর-রঙের ছবিতে অনেক সময় যেমন রঙ উঁচু হয়ে গেলে থাকে—চোখ বুজে হাত দিলেও যেমন বোকা বায়, ভেতর আর কি। সবচেয়ে ফলবাহুর অগ্রমণে হাতে ছবি রঙ লাল না বায়, তাই কিছু একটা আশ্রিত আশ্রিত হিতেন তারা। সেটি যে কী, তা আজও জানা যায়নি।

বার্ষিকের প্রাচীরে প্রথমই নকশে পড়ল হলে মন্দিরের একটি কাঁচনী (২।১)।

কাশীর মহারানী ফেমাদেবী স্বপ্ন দেখলেন, এক স্বর্ণ-রাজহুসে তাঁকে ধর্মের বাণী শোনালেন। স্বপ্নভঙ্গের রানী কাশীরাজকে তাঁর সেই অদ্ভুত স্বপ্নের কথা বললেন, মিনতি জানালেন—তিনি স্বর্ণ-হুসের কাছে ধর্মকথা শুনতে চান। শ্রুত রাজা অস্বাভাবিক হলে জানক তিনি অস্বাভাবিক ভাষা করলেন। কাশীরাজ নিরত হইলেন—পের পরশত কথা প্রসঙ্গে সভাপাণ্ডিতকে সেরকা বলতেই তিনি সন্ধিরে কালো মূর্তি, মহারানী যে স্বপ্ন দেখলেন তার সন্ধিরে কিছু সত্তার ইচ্ছা আছে। আপনি অবগত নন, কিন্তু পরমবৃদ্ধ বর্তমানে এক স্বর্ণ-রাজহুসের মূর্তিতে বোধিসত্ত্বরূপে ধরামে সত্তাই অবতীর্ণ হয়েছেন। ফেমাদেবী স্বপ্নবক্তা তাঁকেই স্বপ্ন দেখলেন। আপনি বোধিসত্ত্বকে কাশীতে আনিবার আয়োজন করুন।

তখন সভাপাণ্ডিতের পরামর্শমত কাশীরাজ একটি পবিত্র স্থানে এক মনোরম সরোবর খনন করলেন। সে বার্তা দেশ-বিদেশে প্রচারিত হল। হুস মেশের দ্বারীরা দলে দলে আসতে থাকে এই অপরূপ সোনারটি দেখতে। শেষে হুসরাজ বোধিসত্ত্ব সপার্বী একদিন সে সরোবর



চিত্র-১৭৪ শিবির পুষ্টি-বিভাগের প্লান।

- ১ হলে খাটক
- ২ কক্ষের দেয়াল জাঁকিয়ে ফেলার
- A খিঁচির পর্দা বন্ধকরণ
- B খাটকটির পর্দা বন্ধকরণ
- C খাটকটির পর্দা বন্ধকরণ (চিত্র-১৭)
- D খাটকটির পর্দা বন্ধকরণ (চিত্র-১১)
- E খাটকের দেয়াল
- F খিঁচির পর্দা বন্ধকরণ
- ৩ একসারি কক্ষের
- ৪ কক্ষের দেয়াল জাঁকিয়ে ফেলার
- ৫ খিঁচির পর্দা বন্ধকরণ
- ৬ খাটকটির পর্দা বন্ধকরণ
- ৭ খাটকটির পর্দা বন্ধকরণ
- ৮ খাটকটির পর্দা বন্ধকরণ

- ৯ কক্ষের দেয়াল জাঁকিয়ে ফেলার
- ১০ কক্ষের দেয়াল জাঁকিয়ে ফেলার
- ১১ কক্ষের দেয়াল জাঁকিয়ে ফেলার (চিত্র-২০)
- ১২ কক্ষের দেয়াল জাঁকিয়ে ফেলার (চিত্র-২১)
- ১৩ কক্ষের দেয়াল জাঁকিয়ে ফেলার (চিত্র-২২)
- A খিঁচির পর্দা বন্ধকরণ
- B খাটকটির পর্দা বন্ধকরণ
- C খাটকটির পর্দা বন্ধকরণ
- ১৪ খিঁচির পর্দা বন্ধকরণ
- A খিঁচির পর্দা বন্ধকরণ
- B খাটকটির পর্দা বন্ধকরণ (চিত্র-২০)
- C খিঁচির পর্দা বন্ধকরণ
- D খাটকটির পর্দা বন্ধকরণ (চিত্র-২৪)

দেখতে এলেন। মহারাজের নির্দেশ সেওরাই ছিল। কাশীরাজ-নিহত শিকারী বন্দী করে ফেলে স্বর্ণহাসকে। নিরে আসে তাঁকে রাজসরকারে। মহারানী কেমা সবোণ গেরে ছুটে এলেন। পরম হয়ে তিনি স্বর্ণ-হাসকে সেবা-বস্ত্র করতে থাকেন। স্বর্ণ-হাসে প্রীত হয়ে বলেন—তুমি কী চাও মা?

কেমা বলেন, আপনার কাছে ধর্মের মূল কথা শুনতে চাই প্রভু।

বোধিসত্ত্ব বলেন : বেশ। শোনাব তোমাকে।

রাজাধেশ ধর্মবাসের এক প্রান্তে অয়োজন করা হল এক ধর্মশিখার। স্বর্ণ-হাসে বোধিসত্ত্ব কাশীরাজ ও মহারানীকে সম্মানের মূল কথাগুলি একে একে বলতে থাকেন।

এই ম্যারালটির আধিক্যশেই নষ্ট হয়ে গেছে। যেটুকু দেখা যায়, তাতে দেখতে পাচ্ছি একটি সম্পদন-শোভিত সরোবর। তাতে রাজহাসে..তাঁরে উদাত্ত ধনুর্ভায়েতে শিকারী..। আর দেখছি, কাশীরাজের আয়োজিত ধর্মশিখার কাশীরাজের মনুট-শোভিত মাথাটি শূন্য দেখা যায় বোধিসত্ত্বের মূর্তিটি সম্পর্শ নষ্ট হয়ে গেছে। অক্ষত আছে তাঁর করাপগুলির ধর্মচক্রমূর্তি। বোধিসত্ত্বের কর্মস্বিকে রাজমহিষী কেমাসেবসীকে\* সন্মান করা যায়..ভগ্নহাসে তাঁর মধ্যবহর আশ্রুতে রানীর পদ্মাসনে একটি নীলতমল, রাজসভার কাছের একটি অশ্বত্থ লক্ষণীর... বস্ত্র মানান্, লাভের আরম্ভ, ভাল, ভাল, বল, চামড়ার কোমরবন্ধ।

এর পরেই একটি বিস্মৃত প্যানেলে সৌদর্য বৃক্ষের জীবনের আধিপত্যের কয়েকটি অপহৃৎ চিত্র-সম্ভার (২।২)। এগুলি আধিক্যশেই অক্ষত। উপরে প্রথম দেখছি, তুমিত স্বর্ণে বোধিসত্ত্ব শেখবার জন্মগ্রহণের পূর্ব-মুহুর্তে\* চিত্রাম্বন (২।২ক)। তিনি জন্মছেন, কোন ভূ-ভাগে, কোন পরিবারে তিনি শেখবারের মত জন্মগ্রহণ করেন। অবশেষে মনস্বির করেন তিনি—তুমিত হবেন পৃথকত্বের জরতবর্ষে। কপিলাবস্তুর মহারাজ শূন্যপানের বশেই ধনা করলেন তিনি। কৃতজ্ঞ\* করলেন কপিলাবস্তুর রাজমহিষী প্রাসেবসীকে।

পরের চিত্রে দেখছি, রাজসেবী স্বপ্ন দেখছেন শূন্যপথে এগিরে আসছে এক শেতহস্তী, অসম্ভবতরঙ্গম সে। এক স্বপ্নীর জ্যোতি নিহুর্জিত হচ্ছে সেই শেতহস্তীর অঙ্গ থেকে। রমে সেই হস্তী তাঁর দক্ষিণ অঙ্গে প্রবেশ করল। স্বপ্নরতনের পরে রাজসেবী রাজা শূন্যপানকে এই অশ্রুত স্বপ্ন-বর্ণনের কথা শোনালেন (২।২খ)। মহারাজ লজ্জাভিত্তনের ভেত্রে প্রথম করেন, মহারানীর এ অশ্রুত স্বপ্ন-বর্ণনের আধিক্য কি?

পরের প্যানেলটিতে দেখছি, মহারাজ শূন্যপান এবং মহারানী রাজসেবী বসে আছেন একটি রত্নসিংহাসনে (চিত্র-১৮)। বাহনিকা, হস্তোদারী, চামরদারিণীর বল ঘিরে আছে তাঁদের দুজনকে। সম্মুখে একটা, নিম্নাসনে একজন পণ্ডিত স্বপ্নমঙ্গলের কথা শোনিয়েছেন। পণ্ডিতের সম্মুখবিন্দু গুচ্ছরাজি লক্ষণীর। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন, মহারানীর দক্ষিণ-হস্তের খেড় গেছে তুলনার ছোট। কোনও পান্ডিত্য চিত্র-বসিকের মতে, এটি চিত্রাম্বনের দুটি বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আমরা জানি, ভারতীয় চিত্রের বাইরেপের নিচ অস্তর স্বচ্ছ মজর দিতে নাযায়। স্বপ্নরতনের বৃত্তান্ত শুনতে কিসে জানীয় মুখে কী অপূর্ণ জাববাসনা ছুটে উঠেছে—এইটি আঁকতেই শিল্পী তাঁর সঙ্কট প্রীতিভা নিয়োজিত করেছেন। এখানেই বাফাসেল, মিসেসাজেবোর নাল্প অজন্তা শিল্পীর প্রভেদ, এখানেই গ্রীক ডাম্বসের সপেদ ভারতীয় ডাম্বসের তফাত। জ্যোতিষী কালেন—এ স্বপ্ন-বর্ণনের অর্থ হল মহারানীর গর্ভে জন্ম নেবেন এক মহাশূন্য! তিনি যদি সত্যের বাঁকেন, তবে হবেন ত্রিভুবনবিজয়ী রাজতত্ত্ববর্তী, আর যদি সম্মারে বাঁতরণ হয়ে সম্মার গ্রহণ করেন, তবে তিনি

\* পরে কেমাসেবী জন্মলিঙ্গ হন, অর্থাৎ বৌদ্ধ ধর্মসম্মারে সারিপ্পের, মহোদ্য-শূন্যরান, উপলক্ষণী ও কেমা সম্মারী। বৃক্ষের অন্যান্য শিখা-শিখর এ স্বপ্নের পূর্বনি।

হবেন অপরূপের, বিশ্বপ্রভা মহা-অবতার! কোন একটি বিবাহিত অপরূপ নারী যদি তাঁর ঘর্ষণ সম্প্রদায়ের সম্মুখে এই ব্রহ্ম ভবিষ্যদ্বাণী শোনেন, তবে তাঁর কী জাতীয় জাববেদ হয় তাই খুঁটিয়ে তুলতেই অজস্রের শিল্পী তাঁর সমস্ত প্রতিভা ব্যয় করেছেন। নিরলস সাধনায় মায়াদেবীর মুখ তিনি সেই জাববানব্রাটি মূর্তি করতে চেয়েছেন—তাঁর কাছে তখন হাড়ের বেড়ের মাপ ছিল তুলু, নগর, এই বাহ্য!



চিত্র-১৮ : সর্গাশ্রিত মহারাণ শূন্যবন ও মায়াদেবীর শূন্যের জব  
হুঁকির গিচ্ছেন (অবস্থান-২,২০)।

শিল্পী যেন মায়াদেবীর অপরূপ চিত্রটি এতকৈ তৃপ্ত হননি। তাঁর মনে হল, রাজসভার সর্বনমস্কে মায়াদেবীর মুখে সেই জাববেদটি খুঁটিয়ে তুলতে পারেননি তিনি। মায়াদেবী যেন একথা শুনে হুটো হলে বেতে চেতেনছিলেন তাঁর শিল্পী-নিষ্ঠা বকে। যেন অজস্রের অপরূপাধনে ভেসে বেতে ইচ্ছা হয়েছিল তাঁর। শিল্পী ওই চিত্র পরের প্যানেলেই এঁকেছেন একটি অপরূপ চিত্র। রাজসভা থেকে বেরিয়ে এসে মায়াদেবী একক দাঁড়িয়ে আছেন একটি স্তম্ভের সম্মুখে। তাঁর বামচরণ স্তম্ভ স্পর্শ করে আছে। সঙ্গোপিত স্বপ্নমশলের কথায় জাববেদ তিনি, তাঁর প্রতি রোমকূপে রোমকূপে শিবন, তাঁর হৃদয়ে আনন্দের জোয়ার (চিত্র-১৯)।

পরের প্যানেলে দেখছি, শিবিকরোহণে মায়াদেবী চলেছেন পিতালয়ে। বাত্মন লুপ্তিনী-কাননের মাঝখান দিয়ে, সঙ্গে চলেছেন মহারানীর শত সখী। কিন্তু পিতালয়ের নিয়াম

অগ্রগ্রে শোঁঘানো সম্ভবপর হইল না। পরের দিগ্রে দেখাছি, একটি শালবৃক্ষের কাণ্ডে মেহভার নামক করে মাগাসেবী দণ্ডায়মান। তাঁর একটি বাহু উর্ধ্বে উৎকীর্ণ—যেন শালভক্তিকামূর্তি। তাঁর রোমার্ণবিত তন্দ্রবেগি ধরে শাস্ত্রনা দিচ্ছেন তাঁর তখনী, শত্ৰুশাখানের অপর দহিবাঁ মহা-প্রজাপতি বা মহাগোতমী; আর মাগাসেবীর দাঁকল উপর থেকে নির্গত হচ্ছেন মহাজাতক, জগৎ-প্রাচ্য ভবিষ্যৎ-দৃশ্য।

চলো যে চিত্রের মিছিল—যেন চলাক্রমের সিকোরোসের পর সিকোরোস। পরের প্যানেলে দেখছি, স্বর্ণা থেকে দেখবল মতর্জী নেমে এসেছেন, কথিলোক থেকে সিদ্ধাচার্যের দল এসেছেন মহা-জাতককে সম্মান দেখাতে। এসেছেন ব্রহ্মা, ইন্দ্র, আসিত, দেবী। দেবরাজ ইন্দ্রের স্রোতে দেখছি নবজাতককে। রিনরন ইন্দ্রকে সন্যাস কল্প করিন নয়। তাঁর পাশেই দেখছি, প্রজাপতি ব্রহ্মা কলহর ধরে আতপজাপ থেকে শিশুকে ব্রহ্মা করছেন। পাশে জামরগারী। চিত্রে দেখছি জামরগারী শিশু করছেন : অশ্বমেধম্ অশ্বি লোকস্ ; বলছেন—আমিই এ জগতে সর্বপ্রভু। এ-কথা বলেই শিশু সন্তপন অগ্রসর হয়ে যায় অনার্যাসে। তাঁর প্রতি চরপায়ে কুটে উঠল এক-একটি শ্মশলপত্র (২।২৫)। চিত্রে সেই সন্তপনকে দেখতে পাচ্ছি স্পষ্ট। দেখছি, রিনরন ইন্দ্র কলহর ধারণ করে শিশুর পিছন পিছন অনুগমন করছেন সন্তপন। সন্তপন সেওলাল কুড়ে এইভাবে তৎপাত বৃক্ষের আঁকনের অগ্নিপর্ব এখানে ক্রীড়। এই প্রাচীরের উপর দিকে করেকটি বৃক্ষমূর্তি অশ্বিত (২।১০)।

পায়ে পায়ে এগিয়ে আসি অশ্বমেধের বাম-পার্শ্বে অর্বাশ্বিত অশ্বমেধের কক্ষটিতে। কামলিকের প্রাচীর-গড়ে (২।১৪) করেকটি রমণীর দণ্ডায়মান মূর্তি। তাঁর সারি দেখে বৃক্ষমেধকে অর্বা দান করতে চলছেন। এ মূর্তিদ্বয় সম্ভবতঃ পরবর্তী হুসের, তখন শিল্পের সৌকর্য নিন্দা-ভিন্নম্। চিত্রের মূর্তিদ্বয় হারিত্রে অশ্বমেধ-চিত্রের স্মার্তাবিক শেলবজ, চিত্রে অশ্বিত সন্তপনদ্বয় অশ্বমেধাবিকভাবে শীর্ষকার।

এই অশ্বমেধের কক্ষটির সামনে সিলিও (২।১৫) তেইখটি হুসের একটি বিচিত্র যোলাকৃতি আলিঙ্গন। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এই তেইখটি হুসের একটিও অংশ কোন একটির নিছক অনুকরণ নয়। অঙ্গপনের নকশার এটি অস্বাভাবিক। আলিঙ্গার ধর্মই হচ্ছে একই চিত্রের পৌনঃপুনিক ব্যবহারের মধ্যে সন্মিল্য বিধান করে নকশার কার্যকার্য গঠন করা। অর্থাৎ এখানে প্রত্যেকটি হুসের চিত্রই মৌলিক চিত্র—কেউ কারও অনুকৃতি নয়। প্রত্যেকটি হুসের ভাগ্য বিচিত্র, বিশিষ্ট এবং মৌলিক। স্টেনসিল ব্যবহৃত হয়নি।



চিত্র—১১.৫ পশ্চিম দিকের দণ্ডায়মান মাগাসেবী  
মুদ্রা দণ্ডায়মান মাগাসেবী  
(অঙ্গপন—২।২৫)।

এই কক্ষটিতে আছে শম্মনিনিধি ও পশ্মনিনিধির দুটি মর্মর-মূর্তি (২।৬)। এরা দুজন জন্মল বা কুবেরের দুই অন্যতর। অশুরাদের বাম ও দক্ষিণ দিকের প্রাচীরে (২।৭) শ্রাবস্তীর সহস্র বৃক্ষের অনুকৃতি—এক-একটিকে পাঁচশতটি। মূল গর্ত-গুহে মর্মর-মূর্তিটি (২।৮) মৃগদামের পশ্মাসনে বসে বৃক্ষদেবের। তাঁর করাঙ্গুলি এখানেও সেই মর্মর-মূর্তি রচনা করেছে।



ওপাশে একটি দীর্ঘাকার বৃক্ষমূর্তি অশিকত ছিল (২।৯)। এখন শূন্য মস্তক ও পদম্বর দেখা যায় মাত্র। তার পাশে গর্ত-কক্ষে জন্মল ও হারিতীর প্রস্তর-মূর্তি (২।১০)। বৌদ্ধ শাস্ত্রানুসারে এরা বেন কুবের ও তাঁর স্ত্রীর পরিপূরক। কিছটা প্রভেল আছে। বৌদ্ধ শাস্ত্রানুসারে হারিতী ছিল রাজসন্য। কিন্তু সে শিশুদের ভালবাসে; অনেকটা আমাদের স্বপ্নীমায়ের মত। বৃক্ষদেবকে একবার আরম্ভ করেছিল হারিতী; কিন্তু তাঁর কাছে শেষ পর্যন্ত সে নীতিমণ্ডল করে। তাঁর আশীর্বাদ পর। ফলে, তার রাজসন্য-প্রবৃত্তি জাগ্র করে শিশুদের নিয়েই হারের ভূমিকার স্বপ্নদামন করে। রাজসন্যকে মাতৃ-মূর্তিতে রূপান্তরিত করেছিলেন বৃক্ষদেব। এখানে মর্মর মূর্তিতে সেই কাহিনীটি বিদ্যুৎ।

দেখছি, স্ত্রীভোক্তার জন্মল ও হারিতী বসে আছে বৃক্ষাসনে। হারিতীর এক হাতে মর্মর-মূর্তি মজুয়া, অপর হাতে একটি শিশু। জন্মলের হাতেটি ভাঙা। সে হাতে কি ছিল জানা যায় না। জন্মলের উপরে দেখছি চতুর্ভুজা রাজসন্য বেশ হারিতী আরম্ভ করছে বৃক্ষদেবকে। বৃক্ষদেব শান্ত, অক্লিষ্ট। পরে মূর্তিটি হারিতীর মূর্তির উপরে খোদাই-করা। সেখানে দেখছি, হারিতী তথা-গতকে প্রণাম করছে। হারিতীর কোড়ে এবার একটি শিশু। অক্লমের সময় সে ছিল চতুর্ভুজা অরুণ-হারিণী রাজসন্য। প্রণামের সময় সে শিশুকেও মাতৃ-মূর্তি। নিহোসনের নীচে দশটি শিশুর

চিত্র—২০৩ জনৈক ভদ্রদত্ত বা বৃক্ষ  
কক্ষী (অবস্থান—২।১১)।

মূর্তি। কৌতুকপ্রদ এ শিল্প-নিদর্শনটি। দশটি শিশুমূর্তি দুই ভাগে বিভক্ত। জন্মলের পদতলে সর্বদিকের (দক্ষিণের দক্ষিণ) দেখছি পাঠশালার পুরুষশাই, তাঁর হাতে বেলশঙ। তাঁর সম্মুখস্থ প্রথম তিনটি শিশু পড়াশুনা করছে। তাদের পিছনে দুটি শিশু মল্লযুদ্ধ করছে। হারিতীর পদতলে পাঁচটি শিশুই ভেড়ার লড়াই নিয়ে খেতে আছে। অতিকর্ষের সূত্রের অনুকরণে আমরা বলতে পারি, শিশুদের বিদ্যার প্রতি মনোযোগ জন্মল ও হারিতী শিক্ষকের দুরত্বের বাস্তবানুসারে নির্ভরশীল। যে যত কাছে সে তত মনোযোগী। যে যত দূরে সে ততই দূরে সরে গেছে বিদ্যা থেকে!

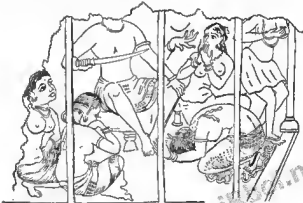
দক্ষিণের সেওয়ালে একটি বৃক্ষ কক্ষীর অর্ধ চিত্র। হতভাগ্য ভদ্রদত্ত কিছু দুরসংবাদ বহন করে এসে দাঁড়িয়েছে রাজ্যের সম্মুখে। গাইজকে চন্দন করে, বই মেটে উন্মত্ত করতে পারলুম না—কে সেই রাজা, কিসের এই দুরসংবাদ। মহাকালের অপদ্রুতিহেলনে সে রাজাও সেই, সেই দুরসংবাদও আল ছায়ার চেয়েও ছায়া—এমনকি ইতিহাসও ভুলে গেছে সে ঘটনা। শব্দে ক্ষতিচহ-ব্যক্তি প্রাচীর-পারে অক্ষর হয়ে আছে ভদ্রদত্তের সেই অর্ধ অতিকর্ষটি

(চিত্র-২০)। তার দক্ষিণহস্তের মূদ্রা, বিদ্যাবিধ্য দৃষ্টি দেখে অনুমান করা সহ্য হয় না কী জাতীর সংবাদ বহন করে এনেছে হতভাগ্য ভ্রমণী (২।১১)।

এই যুগ্ম-কল্পিতই মূদ্রাভাস ও কান্তিবাদী জাতকের দৃষ্টি অমূল্য চিত্র-কাহিনী ছিল বলে পড়েছি প্রামাণিক গ্রন্থে। অনেক চেষ্টা করেও তাদের সনাক্ত করতে পারলুম না। শুধু কান্তিবাদী জাতকের একটি অতি কুদৃশ্য চিত্র আছে। সেটির কথা বলি :

সম্বন্ধের প্রতি বিরূপ এক নরপতি একবার তাঁর মূন্দরীপ্রমী নর্তকীদের নিয়ে প্রমোদ-প্রমোদে গিয়েছিলেন। উৎসব ও আমোদে রাসতরু মহারাজ প্রমোদ-কাননের একান্তে নিদ্রাভ্রুত হওয়ায়, নর্তকীর দল ইচ্ছামত কাননে পরিভ্রমণ করতে থাকে। সহসা তারা ঘনের একান্তে এক পীতবলনদারী সম্রাসীর সাক্ষ্য পায়। সম্রাসী ওদের দেখতে পেরে কাছে জাকেন, সঙ্গেই নানা কথা আলোচনা করতে থাকেন। এই সম্রাসী বস্তুতঃ বোধিসত্ত্ব। তাঁর মূন্দরীপ্রমী নর্তকীর দল রুমশে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ওদের প্রধান রাজনর্তকী ভাবাবেশে একেবারে ভ্রম হয়ে যায়। নিদ্রান্তে মহারাজ নর্তকীদের দেখতে না পেয়ে ঘোষণা হয়ে পড়েন। সম্বাদ করতে করতে তিনি আসেন সম্রাসীর কাশিবাদী জাতক

নিকটে। মহারাজ বোধিসত্ত্বকে ভরবারি স্বারা রুমশে আঘাত করতে থাকেন। কান্তিবাদী বোধিসত্ত্ব সমস্ত আঘাত অবিলম্বে গ্রহণ করেন। এতে রাজনর্তকী আরও অভিভূত হয়ে প্রতিবাদ করতে যায়। তাই শেষে মহারাজ ক্ষিপ্ত হয়ে বণ করতে মান মটীকে। রাজনটী তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়ে।



চিত্র-২১। কান্তিবাদী ৪৪৬-কপলবদী রাজনর্তকীকে কাশিবাদে উদার রাজা (অবলম্ব-২।১২)।

কাহিনীর সমস্তটাই অকল্পিত, শুধু চিত্র আছে একটি স্বতন্ত্র (২।১২)। দেখছি, একটি রাজনরায়। সিংহাসনে বসে আছেন একজন রাজা, তাঁর দক্ষিণহস্তে কোদম্বের ভরবারি। রাজনর্তকী লুটিয়ে পড়েছে তাঁর চরণমূলে। পার্শ্ববর্তী নর্তকী দুহাতে নিজের মূখ ঢেকেছে। অপর একজন পলারনে উদাত্ত। রোমোলম্ব কাদশী মহারাজের ভাষাটিও লক্ষ্যীয় (চিত্র-২১)।



রাজার চরণপ্রান্তে প্রণতা রাজনর্তকীর এ প্রশংসার ভঙ্গিটি আহমদের কাছে অতি পরিচিত, কিন্তু এই বহুল-স্বরূপ নৃকৃষ্ণ-চিত্রটির মূল উলসে যে কী তা হারতে জানতুম না আমার।

ছবিটি দেখে মনে মনে হাসি। চিত্রটির কিছুটা অংশ আছে, কিছুটা নিশ্চয় হয়ে গেছে মহাকালের নির্দেশে। মনে মনে বলি, যে মহান শিল্পী, তুমি এমন একটি কণ্ঠ-মহোত্তর পরিচালনা করেছিলে, যার পরবর্ত্তেই এই হৃৎজাগ্রিত রাজনর্তকীর শিরশ্চন্দন হওয়ার কথা। অন্ততঃ হাজার বছর পূর্বে তুমি ভেবেছিলে। জানি না তুমি অমর্ত্য-লোকের কোন অন্তরাল থেকে তুমি তোমার এই অবস্থা চিত্রপটটি বেগতে পাচ্ছ কি না। সেলে তুমি নিশ্চয় আমারই মত হাসছ। তোমার প্রিয় রাজনর্তকীর মস্তক তুমি হাজার বছরেও স্নেহচূত হয়নি। অগপ্ত হয়ে এলেও তার ঘননিবন্ধ পুষ্পপত্রক-লাভিত তববীর অভ্যাস আজও স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। অথচ যে উন্মত্ত নৃপতি ওর শিরশ্চন্দন করবার জন্য তরবার উত্তোলন করেছিলেন তিনি নিজেই আলো ছিন্নাশিত। তবে শত্রেই পল্লভরর এটুকু অংশ।

মহাকাল তোমাকে প্রণাম! ধনা তোমার সূক্ষ্ম রসবোধ! মহারাজের মৃত্যুপাত করত পরেও কৌতুক করে জিইয়ে রেখেছ তার কোষের নিম্নলি তরবারটিকে।

কিন্তু তাই তো দেখতে পাই দুনিয়ার। পর্ব্বাশ পণ্ডিতল পিয়াত-এর ক্রিয়ালভার ধূলিকণাও আজ শুদ্ধে পাওয়া যায় না, অথচ তাকে খাচ্ছে রূপবিধ নন্দনার হানুর্ভটের বর্ণা। হৈলজের বিশুদ্ধ পান্থসার কাহিনী ছাড়া হয়ে মিলিয়ে যায়, অথচ কড়কলার ছাউনে যায় না আনি প্রাশের বিনামিলির একটি পাতাও!

পিতৃগণ বুধা-বিশ্বের উত্তর দিকের প্রান্তের দুটি বৃহদায়তন পালনে দুটি আরক-কাহিনী বিচিত্র। সে দুটি হচ্ছে পূর্ব-অবধান (২।১০) এবং বিদ্যুৎ পণ্ডিতের কাহিনী (২।১৪)।

পূর্ব-অবধানের কাহিনীটি আসে বলি।

সুপারিক জনপদে একজন বণিকের পুত্র ছিলেন পূর্ব; কিন্তু তিনি ছিলেন দাসীপুত্র। পিতার দেহাবসানের পর পূর্ব জানতে পারলেন পিতা তাঁকে এবং তার কোষপ্রান্তে জাবলকে পৈঠিক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে গেছেন। একনা মহামতি পূর্বের মনে কোন ক্ষোভ নেই।

অন্যান্য ভাইদের প্রতি কোন ঈর্ষা বা বিদ্বেষ ছিল না তাঁর। তিনি বাণিজ্যে পূর্ব-অবধান মনোনিবেশ করলেন। পর পর ছয়বার তিনি সমুদ্রযাত্রা করেন এবং বেশ-বিশেষ থেকে বহু সম্পদ আহরণ করে আনেন। ঈর্ষে পূর্ব হয়ে পড়েন একজন লক্ষপতিত বণিক। ছয়বার বাণিজ্যে সফলকাম হওয়ার পূর্ব অবসর নিতে চাইলেন, কিন্তু আত্ম-বঞ্চনের একান্ত অনুপ্রেরণে শেষ পর্যন্ত সন্তমবার তিনি বাণিজ্যযাত্রা করলেন।

সেইবার সমুদ্রযাত্রার প্রাবল্যের কয়েকজন নাবিককে তিনি নিজ নৌকার নিয়ন্ত্রণে পূর্ব লক্ষ্য করেন, প্রতিদিন এই নাবিকের দল একত্রে হয়ে একটি অপরূপ সঙ্গীত শুনায়। সঙ্গীতের প্রভাব স্মরণপ্রসারী-পূর্বের হৃদয়ে তা অপরূপ ভাবে সঞ্চার করে—তার মন-প্রাণ ভরে যায়। শেষে এতদিন তিনি নাবিকদের জেলে-জামতে চাইলেন—এই স্বাধীন সঙ্গীতটি তারা কোথায় শিখেছে।

উত্তরে বিনয়বনত নাবিকরা বলে: প্রভু, এ কেঁদে সঙ্গীত নয়—এ প্রার্থনা-গাথা। এ মনুর্দান। এ মনু আমরা শিখেছি এক মহাপুরুষের কাছ থেকে।

পূর্ব প্রশ্ন করেন: কে সেই মহাপুরুষ?

—কে তা জানি না। শুনেছি তিনি ছিলেন রাজপুত্র। এখন ভিখারী!

—কোথায় গেলে তার দেখা পাওয়া যায়?

—এখনও তিনি প্রাবল্যতীতেই আছেন।

পূর্ব মনে মনে ভাবে ইতিপূর্বে ছয়বার বাণিজ্যযাত্রা সে প্রভুত ধনসম্পদ আহরণ করে

এনেছে ; কিন্তু কই জাতে তো তার মনের তন্ত্রীতে এ বরনের অনুরণন হয়নি। সে ভাবে, এই অপূর্ণ সম্পদ-গাথার যে মূল উপল তার সাপেই প্রথমে এক হাত বাগিচারে লেদলেন করে নিলে কেমন হয়?

প্রাকৃতীতে এসে পূর্ণ এক নতুন আলোকের সম্মানে পেল। পীতকলনকারী দেবদূর্ভা-কান্দি দীর্ঘকাল এক সম্মানসীকে ভিকলপাত হাতে প্রাকৃতীর প্রাঙ্গণে ভিক্ষা করতে দেখে লুটিলে পড়ল তার চরণে। মহাভিক্ষু জাগ্রত করলেন ওকে।

পূর্ণ শুনল, ইনি যুগবতার—নাম গৌতম বুদ্ধ।

সলোরে আর মন নেই পূর্ণের। পার্থিব ধনসম্পদ সব তুচ্ছ হয়ে গেছে তার কাছে। সে যে পরশমণির সন্ধান পেয়েছে—মণিকে আর মণি-জান করে না। ওর দান্য ভাবিল এসে কল—তোর কি হয়েছে বল তো?

পূর্ণ হেসে বলে—সে ছুটি বুদ্ধকে না দান্য। তবে আমার ব্যক্তিগত বিষয়-সম্পদ আছে, তা দান করে আমি সন্তুষ্ট হোগদান করতে চাই।

: তোর এত এত বিত্ত-সম্পত্তি সব দান করে দাবি?

: না ঠিক দান নয়, ভাবছি এ-সবের বিনিময়ে একটি চন্দনকাঠের চৈত্র-বিহার নির্মাণ করাব। তারপর ওঁকে নিজে আসব সেখানে।

জাবিল ছোট ভাইয়ের হাত ধুটি ধরে বলে—সম্মানসী চন্দনকাঠে কী প্রয়োজন ভাই? অজ্ঞান থাকে চেয়ে দেখ বর। পিতৃধনে বঞ্চিত হয়েছি—তুইও ভোগ করে ব্যক্তিগত—

বাবা মিত্রে পূর্ণ বলে—নাও দাদা, তুমিই নাও এসব। আমি বর ভিক্ষা করেই আমার শেষ মনোবাচনা পূরণ করব—

জাবিল মনে মনে হাসে। ভাবে, তার ভাই পূর্ণের একেবারে মাথা খারাপ হয়ে গেছে। জন্মদশীশে তখন চন্দনকাঠের প্রচণ্ড অভাব, তার বিত্ত-মূল্য বর্ধিত হয়ে গেছে শতগুণ। ভিক্ষাবন্ধন ধনে পূর্ণ সেই চন্দনকাঠের সঞ্চয়কে নির্মাণ করতে চায়। পাগল আর কাকে বলে!

পূর্ণের ব্যক্তিগত সম্পদ তা গ্রহণ করে জাবিল। কাঞ্চি-সম্ভারে সন্ত-মহাকর-ভিক্ষা মাটিতে প্রস্তুত হয় সমুদ্রব্যার। মুক্তিভাষী পীতকলনকারী পূর্ণ অজ্ঞানকে প্রণাম করে বিদায় নেয়—সে বেতে চায় এক নির্জন স্থানে। সেখানে প্রেণপরিপক নামে নরমাসেতুঙ্ক এক দ্বিষ্টে জাতির বাস। পূর্ণের অভিজ্ঞতা, সে ঐ দ্বিষ্টে জাতির মধ্যে প্রচার করবে অহিংসার বাণী, সং ধর্মের অনুশাসন।

জাবিল বলে : ভাই, আর কি কোনদিন আমাদের দেখা হবে না?

পূর্ণ বলে : হবে না কেন? বৌদ্ধ প্রয়োজন বুদ্ধকে আমাকে স্মরণ করবে। আমি আহুতন্যায় উপস্থিত হব তোমার কাছে।

জাবিল আবার মনে মনে বলে : একেবারে বন্ধ উদ্দাম!

দেশ-দেশান্তরে ঘুরতে থাকে জাবিল। ক্রমশঃ তার সন্ততিভার পরিপূর্ণ হয়ে যায় মণি-মুক্তা, লাক্ষা ও ধন প্রভেদ। সমস্ত কাঞ্চি-সম্পদ নিজে সে জায়গায় আসে চন্দনশীপে। জাবিল জানে, এই চন্দনশীপে বাস করে বুদ্ধগণ বহু মহেশ্বর—এককণ্ড চন্দনকাঠ সে শব্দেই বাইরে বেতে দেয় না। ভাই আজ জন্মদশীশে চন্দনকাঠের এই কৃত্রিম অভাব। জাবিল সংবাদ পেয়েছে, যাক মহেশ্বর চন্দনশীপে অনুদ্রবিত। সেই সুযোগে সে সমস্ত কাঞ্চি-সম্ভারের বিনিময়ে তার সন্ততিভার পূর্ণ করে উৎকৃষ্ট চন্দনকাঠের সন্ধ্যারে। মহেশ্বর শব্দে জিরে আমার আগেই দাবা করে শব্দে।

দীর্ঘদিন সমুদ্রব্যার পর নাবিকের দল বৃন্দী হয়ে ওঠে। সন্ততিভার পাশে যে লোগেছে ঘরে-দেয়ার-হাওরা।

বাণিজ্যতরী বনন শ্রীশ ছোড়ে অ্যাসমুদ্রে, তখন হঠাৎ ওঠে দুরন্ত সমুদ্র-ঝটিকা। প্রচণ্ড-জবে দুলতে থাকে সমুদ্রভিত্তা!

প্রধান নাবিক ছুটে এসে বলে—প্রভু, সর্বনাশ হয়েছে। বন্ধ মহেশ্বর সন্ধান পেয়ে গেছে। ভারি আকোশে এ অকাল ঝটিকা।

দক্ষ নাবিকদের ঐকান্তিক চেষ্টা সত্ত্বেও নৌকা রক্ষা করা যেন অসম্ভব হয়ে পড়ে। কড়ের বেগ যেন রমণ্যমায়, সমুদ্রের তলদেশ থেকে যেন কোন অদৃশ্য শক্তি বাদিয়া তরীগুলিকে ভ্রাম্যন্ত নীচের দিকে টেনেছে। নাবিকের দল ভয়ে অতঙ্কক বিহ্বল হয়ে পড়ে।

নিরুদ্দেশ জাবিল তখন মূরকরে প্রার্থনা করতে থাকে, বলে—পূর্বা, তুমি বলেছিলে আমার বিপদের সময় আমাকে রক্ষা করবে। আজ আমি একান্তমনে প্রার্থনা করছি, তুমি আমাকে বিপদমুক্ত কর, দুর্ভাগ্য বন্ধ মহেশ্বরকে বধ করে গ্রাণ কর আমাকে।

কিন্তু সে প্রার্থনার কোন ফল হয় না। নির্মম্ভ হতে থাকে বাণিজ্যতরী। জাবিল পুনরায় বলে—হে পূর্বা, আমি জানি তুমি মহাপুত্রদের অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। তুমি এসে রক্ষা কর আমাকে। আমার সমস্ত জীবনের সঞ্চয় এভাবে ধ্বংস হতে দিও না!

কিন্তু তবু কোন সাহায্য এসে পৌঁছায় না।

সহ্যা জাবিলের মনে পড়ে যায় পূর্বকথা। বলে—হে পূর্বা, তোমার অভিমানে পরিপূর্ণ করব আমি। প্রতিশ্রুতি দান করছি, যদি তুমি আমাকে রক্ষা কর, তবে এই সমুদ্র চেনকণ্ডি ছিয়ে আমি তৎক্ষণাত্ বৃক্ষের জন্য একটি অপহৃদ্য সঞ্জয়রায় নির্মাণ করে দেব।

আশ্চর্য! তবু কোন সাহায্য এসে পৌঁছায় না। ভিলা ভিলা করে নির্মম্ভ হতে থাকে বাণিজ্যতরী।

তখন চতুর্দিক চাঁৎকার করে ওঠে জাবিল, নিষ্ঠুর! তোর কি একটুও দয়া নেই? আমি কিছাই চাই না, শুধু আমার সহকর্মী নাবিকদের প্রাপরক্ষা করতে চাই। এতগুলি নিরপরাধ প্রাণী-কি সজিল-সমাদি হবে ভাই?

উদ্ধাবগম্যত নৌকার আকর্ষণ হন এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। পীতবস্ত্র মণ্ডিতশীর্ষ এক জ্যোতির্ময় পুরুষ। জাবিল লক্ষ্য করে দেখে, অলৌকিক ক্ষমতাবলে শূন্যপথে উড়ে এসেছেন মহাজিন্দ, পূর্বা! পূর্বের আবির্ভাবময় শ্রান্ত হয়ে যাব সমুদ্র-ঝটিকা, পরাজুত বন্ধ সহ্য করতে পারে না সে সন্ন্যাসীর অমিত পুণ্যশ্রুতি। পলায়ন করে সে।

আনন্দাপ্র-কলিষিত জাবিল অধিগমন করে পূর্বকে। বলে—ভাই, এত ক্লিম্ব করলে কেন? আমি যে হতভা হয়ে পড়েছিলাম।

পূর্বা বলে—ভুল বলছ দাদা। আমি আহতনম্র এসেছি।

জাবিল বলে—কী বলছ ভাই। তোমাকে আমি চারপাশ জেঁকছি।

হেসে পূর্বা বলে—না। একবার মাত্র! তুমি চারপাশ জেঁকিয়ে স্মরণ করেছ বাট, কিন্তু ভেবে দেখ কেন জেঁকিয়েছিলে। প্রাণবীর তুমি জেঁকিয়েছিলে বন্ধ মহেশ্বরকে বধ করার জন্য; কিন্তু দাশ, হননেক্ষা তে কোন প্রার্থনা-বন্দ হতে পারে না। দ্বিতীয়বার জেঁকিয়েছিলে তোমার সম্পদ রক্ষার জন্য; কিন্তু পাখি-বন-সম্পত্তি রক্ষা তে কোন প্রার্থনা-বন্দ হতে পারে না। তৃতীয়বার জেঁক বলেছিলে এ উপকারের বিনিময়ে তুমি আমাকে প্রতিশ্রুতি দিতে চাও; কিন্তু দান-প্রতিদানের নিরিখে তে কোন প্রার্থনা-বন্দ গীত হতে পারে না। ভেবে দেখ, শেষবার তুমি আমাকে গালিমল্য করে জেঁকিয়েছিলে কীভাবে বধ প্রার্থনের জন্য; অধিবীর মনে সে প্রার্থনা-বন্দী অন্তর স্পর্শ করেছে আমার। আমি আহতনম্র ছুটে এসেছি তোমার পাশে।

আবিল ভাইকে আলিঙ্গন করে বলে—আমার ভুল আমি বুঝতে পেরেছি জাই! কিন্তু আর ভুল করণ না। আমিও যোগ দেব এই স্তম্ভে। শরল নেব বৃদ্ধের, ধর্মের এবং সন্দের।

পূর্ব বলে—আর তোমার এই চন্দনকাঠের বিপুল সম্ভার?

: ও ছিড়ে নির্মাণ করব আমার দুই ভাইয়ে মিলে এক অপরাধ সন্ধ্যায়। না না, কোন প্রতিদান চাই না আমি। আমি চাই, এই চন্দনকাঠ থনা হোক সেই তথ্যগত বৃদ্ধের সেবার।

দুই ভাইয়ে মিলে অবশেষে রচনা করে একটি অপূর্ব চন্দন চৈত্য-বিহার।

বৌদ্ধ শাস্ত্রমতে তথ্যগত বৃদ্ধ শ্রমঃ এসেছিলেন সেই অপরাধ সন্ধ্যায়।

জাতকানুসারে মূল কাহিনী এইটুকুই! শিবতীর গৃহ্য-শিল্পে প্রাচীরে (২১৩) অজন্তার শিল্পী এই কাহিনীটি অবলম্বন করে যে প্রাচীন-চিত্র এঁকেছেন, একদা তাই কহা



চিত্র—২২ ॥ উপরে : (ঘরে ও বাগানে) পূর্ব ও আবিল বৃদ্ধদ্বয়কে আলিঙ্গন করতে গেলে ; (সর্বদিকশে) বৃদ্ধদের প্রবলভাবে ধর্মপ্রভবে রত। নীচে : (সর্বদিকশে) পূর্ব শীতল গ্রহণ করছে ; (মধ্যভাগে) ভগ্নাবলার বাণিজ্যতরী ; (বাকি) আকাশপথে পূর্বের আগমন ; (সান্নিধ্য) বৃদ্ধ মহেশ্বরের জন্মের মন্তব্যকথন (অবস্থান—২১১) ।

বলি। কথা-সাহিত্যের খাতিরে মূল কাহিনীকে কিছুটা ছেলে পাঞ্জবোধি আমি—ইচ্ছামত সজ্ঞাপন সন্ধ্যায় করেছি, যেমন—জাতকের মূল কাহিনীতে আবিল চারবার প্রার্থনা করেছিল এমন কোন উল্লেখ নেই ; সেটি আমার কল্পনা। অজন্তার শিল্পীও শিল্পের খাতিরে কাহিনীকে নিজ ইচ্ছানুসারে সাজিয়েছেন (চিত্র—২২)।

প্যানেলের নীচে বামদিকে দেখছি, শ্রাবস্তীনগরে এসেছেন পূর্ণ (২।১০ক)। তথ্যগত বৃক্ষের সম্মুখে তিনি প্রবেশম্বর! পীতবসন সন্ন্যাসী একটি হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন পূর্ণের মস্তকের উপর, আশীর্বাদের ভাষাতে! দৃষ্টি আলোখোই মস্তকের অংশ নষ্ট হয়ে গেছে।

তার দক্ষিণে দেখছি, সমুদ্রের মাঝখানে জীবনের বাণিজ্যতরী (২।১০খ)। চৈনিক শিল্প-পদ্ধতি অনুসারে কল আঁকা হয়েছে। নৌকার উপর পাল তোলা, ওরতে তিনটি দাঁড়। নৌকার গলদ্বীপে ব্যারেটি জলপূর্ণ পাথ-প্রকাণ্ড এ সমুদ্রযাত্রা; পানীর জল জই সুবিকৃত। নৌকা চন্দ্রকাণ্ডে বোকাই। তলদেশে জলকলতুর আগ্রহণ করেছে। দৃষ্টি উৎকীর্ণত বাহু মঙ্গোলিয়া—সম্ভবত যাক মহেশ্বরের অনুচর। এদের উৎসর্গ মনুষ্যকৃত, নিন্দ্যাপ মাল। এ দুজনের উৎকীর্ণত বাহু দুটির ভাঙ্গিয়া লক্ষণীয়—সে বাহুর রেখা সমুদ্রতরঙ্গের মাল্যায়িত ছিল। নৌকাটি মকরমুখী মণ্ডিভা। দেখতে পাছি নৌকার উপর দুতরকারে জালি প্রাণ্য করছে। তার চোখে আঁর্ত। আরও দেখতে পাছি মনুষ্যগণে উড়ে আসছেন একজন সেক্স—জাফিলের রক্ষকর্তা। সেক্সের উপর আকাশগর্ভে নেমে আসছেন অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী মহাভিক্ত পূর্ণ। এই আলোখাটিতেও পূর্ণের মুখটি নষ্ট হয়ে গেছে (২।১০গ)।

এই সমুদ্রযাত্রা দৃশ্যটির উপরে এক বিস্তারিত প্যানেল। সেটি পরবর্তী ঘটনার স্যায়ক। উৎসারপ্রান্ত জাফিল পূর্ণকে নিয়ে শ্রাবস্তীনগরে এসেছে তথ্যগত বৃক্ষকে অর্থাৎলন করতে। বামদিকে একটি প্রবেশম্বর। সেখানে দৃষ্টি রমণী, ভূতীয় একটি কামিনী সোপানের নিকটবর্তী। তার হাতে অর্ধা-খালিক, তার চোখনি বন্ধিম চটল। পাঁচটি সোপান অর্থাৎলন করে আসতে হবে সত্যমস্তপে। এই সোপানের উপর আরও একটি মোহ। মস্তপের মধ্য-মাখ পূর্ণ ও জাফিল। জাফিল তার জাইয়ের দিকে তাকিয়ে আছে—এ অর্ধাচারিত স্থানে কিভাবে সবচে বলা করতে হয় তা জাইয়ের কাছ থেকে সে জেনে নিতে চায়। পূর্ণের আকৃতি কিছু নড়। এই প্যানলে পূর্ণের আলোখাই মূল আকর্ষণ। অজন্মতার শিল্পী অনেক স্থলে প্রতিভা ও মহানুভবতা আরোপ করতে বিশেষ কোন মর্মেতিকে পার্শ্ববর্তী মর্মেতাদ্বারা তুলনায় বড় করে এঁকেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, প্রথম পূর্ণের অবলোকিতেশ্বরের পশুশাণির (চিত্র—৮) মর্মেত, কিংবা সন্তলন মাল্লিরের বিখ্যাত গ্যাণা ও রামুল' চিত্রে বৃক্ষসেব (চিত্র—৫৭)। কিন্তু এ কোন স্বতঃসিদ্ধ ব্যবস্থা নয়। কারণ অজন্মতার শিল্পী জানেন, চিত্র-মাত্রিক কল্পের দৃশ্যকে শিক-মাত্রিক আলোখে বর্ণায়িত করার মূল সূত্র হচ্ছে কাছের জিনিস বড় দেখাবে, দূরের জিনিস ছোট। তাই এই চিত্রের সর্বদিক্বে বহন তিনি তথ্যগত বৃক্ষকে এঁকেছেন, তখন তাঁকে অবকরে বৃহৎ করেবনি। প্রতিভার ও মহানুভবতার বৃক্ষসেব পূর্ণের চোখে অনেক বড়; কিন্তু যেহেতু তিনি দেখে আসছেন তাই তাঁকে বৃহদাক্রম করে আরও সম্ভব হয়নি। বিকল্প ব্যবস্থার শিল্পী সেখানে অজন্মতারপত্রের পবিমণ্ড কাটিয়ে দিয়েছেন। বৃক্ষমর্মেতটি তাই সম্ভবত্বল হয়ে উঠেছে। উল্লেখ্যত্বল মেন আরওতনের পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বাস্তবে রঙিন চিত্রটি দেখলে বৃক্ষটা অনুভবলন করতে পারবেন, যা আমার বোধচিত্রে প্রতিভাত্ব হচ্ছে না।

জাফিল ও পূর্ণকে ঘিরে চারজন দাসী চলেছে অর্ধা-খালিকা বহন করে। পিছনে একটি নহবৎখানা। তাতে তিন কক্ষ—তিন কক্ষে তিন রমণীমর্মেত। একজন বাজাচ্ছে বজানি, একজন মাল, ভূতীয় জন কি বাজাচ্ছে তা জানবার উপায় নেই। সে চিত্রটি অক্ষত নেই। নহবৎখানার পাশে দেখছি আর একটি প্রবেশম্বর। সেখানে পূর্ণরার দৃষ্টি নারীমর্মেত। একজন সূক্ষ্মজ্ঞতা, মনে হয় সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলা, মালো ভাবি সহচরী। এঁরাও পূর্ণা নিবেদন করতে আসছেন।

সর্বদিক্বে একটি গর্ভস্থছে বৃক্ষসেব ধর্মোপদেশ দিচ্ছেন। তাঁকে ঘিরে বসে অছেন

সর্বসম্মত নয়জন ভক্ত। সাতজন পুরুষ, দু'টি রমণী। স্ত্রীলোক দু'জন কসেছেন শালীনতা রক্ষা করে কিছু ভক্তকে।

তার পরের চিত্রে দেখছি (চিত্র—২২-এর অন্তর্ভুক্ত নয়) চন্দন-বিহারে বৃন্দদেব আসছেন। তিনি আসছেন শূন্যপথে দুই শিকদ্রমেত। দেখছি একটি খাতব পাঠ নিয়ে পূর্ণ এসেছে তার চরণ যৌত করতে। পূর্ণের পশ্চাতে জরজন পুরুষাভিনয়ী। পঞ্চাশটে দেখতে পাচ্ছি চন্দন-বিহার।

অজস্রের শিল্পী চিত্র-কাহিনীর যবনিকা টেনেছেন পূর্ণের অভিনয়ের পুরসে। চন্দন-বিহারে বৃন্দদেবের আগমন।

পূর্ণ-অবদানের উপরে অঁকা আরে এক বিস্তারিত কাহিনী-চিত্র। পৃথাক ও ইরানাতীর উপাখ্যান। এটি বস্তুত বিখ্য পণ্ডিত সাতকের কাহিনী (২।১৬)।

পাতালপুত্রীর অতল গভীরে বাসুকি-পরিপাকিত নাগলোকে রাজকন্যা ইরানাতীর মনে নেমেছে প্রবণ রতির ঘনালঙ্ঘন। নাগরাজ্যে বিলাস-আসন, আমোদ-প্রমোদের কোন বিলাস নেই। রাজপ্রাসাদের রক্তধর্মীপিত নৃত্যসভা, রাজোদ্যান-বাগেচা স্ফটিকসজ্জা পদ্মশোভিত সরোবর, মুক্তাখচিত স্বর্ণপিত্তলপে আশ্রয়শালা, রাজকুমারীর বিলাসেব উপকরণের অভাব নেই কোন। তবু এ প্রাচুর্যের মধ্যেও রাজকন্যার মনে নেমে এসেছে

শৌঁছে দিয়ে গেছে রাজকন্যার কাছে—সে বর্তমানে তার পরিচারিকা, প্রিয় সখী মাতলী। রাজনন্দিনীর চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে সে তাঁকে শুনিয়েছে পৃথিবীর কাহিনী। আর তাই শুনেন মনোবিচার হয়েছ বাসুকি-জনক ইরানাতীর।

স্বর্ণপিঞ্জরে আবদ্ধ শূক-সারথিকে দেখেন আর তার মনে গড়ে যায় মাতলীর কণা—মুগ্ধ নীলাকাশে মুগ্ধপক্ষ লিঙ্গমের সন্তরণের কথা।

নাগকন্যা প্রশ্ন করেন—মুগ্ধ নীলাকাশ কাকে বলে মাতলী?

নির্বাসিতা মান্দুবা হেসে বলে—ভেমন করে ভেজলেই যোকাব রাজকন্যা? মনে কর, এই পাতালপুত্রীর সুবর্ণ-চন্দ্রাতপ নেই—সেখানে কেবল পূর্ণ-শব্দই পূর্ণ-সীমাহীন ব্যাপ্ত। রাজকন্যা অবাক হয়ে বলেন—আ কি কখনও হয়?

মাতলী বলে—হর বইকি নাগকন্যা, আর সেই নীলাকাশে অশ্বকরের যবনিকা সরিয়ে দরবারে বসে কখন উঠে আসেন সূর্যসেন, তখন বায়াকর্ষজিম্মায়ো সন্ধ্যারূপ হয়ে ওঠে পার্থিব প্রভাত! আবার মহাশূ-জ্যম্বের উল্লসল অলোকে পৃথিবী স্বয়ং সাজে, তখন তার দিকে তাকানো যায় না। হাণ্ণীপিত নাগলোকের কৃত্রিম অলোকের সঙ্গে সে উল্লসলতার তুলনাই হয় না। আবার দিনান্তে অশ্বত্থ-উজ্জ্বলিত যোগলিঙ্গহৃদয়ের যে বেগল-বিধৃত অনুভূতি তার সঙ্গে তুলনা দিতে পারি—না রাজকন্যা, এ নাগলোকের স্বর্ণপুত্রীতে ভেমন কিছু আরও দেখিনি!

নাগরাজ-দুর্বিহার বীথ্যশাস পড়ে। তিনি বলেন মুগ্ধ পৃথিবীতে কোনোদিনই সন্নিপণ করতে পারবেন না তিনি। নাগকন্যার অধিকার নেই এই পাতালপুত্রীর কাহিনীর যাকার। এ অভয়লগ্ন নাগলোকের গভীরে সন্ধ্যাত্য করেছেন, এখানেই শৈবমিস্ত্রাস ভাগ করতে হবে। সে-করা স্মরণ করে মানে হয়ে যান রাজকন্যা।

মাতলী বলে, তুমি যে কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রকলার মত প্রতিদিন করাত হয়ে বাছ রাজনন্দিনী!

বিস্মিতা ইরানাতী বলে, কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রকলা কাকে বলে সখী?

মাতলী হাসে, বলে, তাও জান না নাগকন্যা? উপরের পৃথিবীতে পূর্ণচন্দ্র যে প্রতিদিন হ্রাসপ্রাপ্ত হতে থাকে, ক্ষয়িত হতে থাকে তার আকার ও জ্যোতি।

ভীত রাজকন্যা বলে, কী সর্বনাশ, এভাবে যে শেষ হয়ে যাবে সে একদিন।

—তাই তো যায়, অমাবসয়ার সম্পূর্ণ অশ্বকরের সন্ধ্য হয়ে-যায় সে।

—তারপর?

—তারপর আমার শত্রুপক্ষে ভিল ভিল করে সে বাড়তে থাকে। দিন দিন উল্ফলুতর হয়ে যায় করে পৃথিবীতে রাত্রির সার্থকতার দিকে।

করতালি দিয়ে হেসে ওঠেন কিশোরী নাগরান্য, বলেন—কী মজা! ওখানকার রাত্রিগুলো তোহলে এ কৃত্রিম আলোয় উদ্ভাসিত নাগরাকের রাত্রির মতো স্থির-মোহিত নয়?

—মোটেই নয়। পৃথিবীতে হাসির পাশেই আছে অশ্রু, আনন্দের পাশেই বেদনা। আলো আর অন্ধকার, আনন্দায়া ও পৃথিবী সেখানে মিলতালি পাতায়। তোমাদের এ নাগরাকের মত শব্দে হাসি, শব্দে আনন্দ, আর শব্দে অলো দিয়ে ঠাসা নয়।

ইরান্দাতী বলে, আমি চাই না এ নাগরাকের নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ। আমিও কাঁদতে চাই। মাতালী শিহরিত হয়, কল—চুপ চুপ। এ-কথা মহারাজের কর্ণশ্রোতর হলেই সর্বনাশ।

কিন্তু অশ্রুর ধর্মই হচ্ছে সে যখন আসে আশ্রয়-সন্ধান বর্গগতির মত সমস্ত আকাশ আবৃত করে আসে। মহারানীর মহলে ঠিক ঐ কথাই বলছিলেন বাসুকি-মাহতী বিমলা তাঁর প্রিয়সখীকে। বলছিলেন—জ্ঞক জ্ঞানর কাঁদতে ইচ্ছে করছে, অথচ এদেশে যে কাঁদবারও আইন নেই।

প্রিয়সখী প্রত্যুত্তর করে না। সে জানে মহারানীর অশ্রুজলীর মনোবাসনার কথাটি। জানে, কেন অভিমান-কৃষ্ণ মহারানী অসজল ত্যাগ করেছেন। সে আর এক কাঁদনী!

নাগরাক বাসুকি গিরেছিলেন মর্ত্যলোকে কুব্জুপতির অমরদেশে, তাঁর রাজধানী ইশ্ত-প্রসঙ্গে এক ধর্ম মহাসভায়। কুব্জরাজ ধনজয়ের প্রথামন্ত্রী ছিলেন আনন্দিতকর্মণ মহাপণ্ডিত বিম্বর। বস্তৃত তিনি ছিলেন স্বয়ং যোগিস্বর। কুব্জরাজকে তিনি শব্দে ঐহিক পরামর্শ দিয়েই ক্ষত হতেন না—প্রতিদিন সন্ধ্যায় তিনি মহারাজকে শোনাতেই সব ধর্মের ধর্মকথা। তিনি ছিলেন সমস্ত আর্ষব্রতের সর্বজন-নামা পণ্ডিতপ্রভু মহামতি। শিবপ্রজ মহাপণ্ডিতের স্মরণটি ছিল বসন্ত জন্মদ্বন্দ্বীশে সুনির্গত—তু-ভারতের দ্ব্যুতম প্রান্ত থেকে প্রতিদিন বলে বলে মূর্খকু-মৃত্যুর গল সমবেত হত ইশ্তপ্রসঙ্গে—বিম্বর পণ্ডিতের শ্রীমূখ-নিসৃত ধর্মকথা শুনতে। গিরেছিলেন নাগরাক বাসুকিও, মূখ্য হয়েছিলেন তাঁর ধর্ম-বাখ্যায়। এতব্ধি অভিভূত হয়েছিলেন যে, নিজ কণ্ঠের ইশ্তনীল মণিহার খুলে জড়িয়ে গিরেছিলেন বিম্বর পণ্ডিতের উকীয়ে।

নাগপ্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করে মহারানী বিমলার কাছে সন্ধিতরে বর্ণনা করেছিলেন বিম্বর পণ্ডিতের কথা। ভুল করেছিলেন সেখানেই। সব কথা শুলে মহারানী অবসার করেন—তিনি স্বকর্ণে বিম্বর পণ্ডিতের শ্রীমূখ-নিসৃত ধর্মের ধর্মকথা শুনতে চান। পদর্শ করতে চান সেই মহাপণ্ডিতের হৃদয়টি। মহারাজ কত ব্যথিয়েছেন, সে অসম্ভব। নাগকন্যা হিনাবে বিমলার পক্ষে নাগরাকের বাহিরে পদার্পণ করা সম্ভবপর নয়, তবুও ইশ্তপ্রসঙ্গের নিমিত্ত সম্মত হবেন না একটি দিবসের জন্যও মহামতি বিম্বর পণ্ডিতকে ছকের আড়ালি করেই।

শুলে প্রমোদকক ত্যাগ করে উঠে যান রানী। শরনককের অশ্রুনিশি-অক্লান্ত সহচরীকে জেত বলেন—আজ আমার কাঁদতে ইচ্ছে করছে।

প্রাসাদ-কাননের এক নিভৃত প্রান্তে সন্তপণীর শাখার রাজকুমারী ইরান্দাতীর একটি প্রিয় প্রেমা প্রলম্বিত ছিল। প্রতিদিন সন্ধ্যায় রাজনিন্দী এই মৌলনার এসে বসে, কাজিরে যার নিঃসঙ্গ করেকটি সান্ধ্য শব্দে। সেদিনও গোপালি লগনে মধারানীত উদ্যানের এই নিম্ন প্রান্তে এসে প্রেমের উপর বসেছে রাজকুমারী। কণ্ঠে নবকর্ণিকার, নয়নে কৃৎজলজলী, কালগুরুদ্বন্দ্বীত কলকলুছে কনকুমারী। মালিকা-প্রসাদনন্দকা মাতালীর রূপসন্ধ্যার টুটি নেই, রাজকন্যা ইরান্দাতী উদ্যানভূমিকে আলোকিত করে প্রেমের মৌলানীত করছিল নিজ অনিন্দ্য করতলটি।

শব্দে দেখে না, ওর অন্তরেও যে আছে সেলা ভেগেছে। সরোবর-নীরে মৃদুস্পর্শিত বৌদ্ধভাবের নিম্ন গোধের প্রতিবিম্বটি দেখে অজ্ঞ হঠাৎ এক কেনা অনুভব করেছে রাজকন্যা। লীলনে এই প্রথম একেবে ভাবতে শব্দ করেছে সে। হাতছাড়া বলে—এ উপলোকের পৃথিবীতে হাসি অল্পের সম্মানে ছোট্টে, অনেক বেননার অবেক্ষণে ফেরে, অনেক অশকারের অভিজ্ঞারে ধাবমান। অজ্ঞা ভিন্ন পৃথিবীর উপলব্ধি নেই। কিন্তু কেন? শব্দে হাসি, শব্দে অলস, শব্দে অলসকে কেন একাই পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না? ঘোলের দ্বারা কি হৃদয়ের কেউ তৃপ্ত নয়? আর সে ঘোলের কি হতে হবে বিপরীতবর্ষী? হাসি যেমন আলোককে গেলে পূর্ণ হয় না, সে অল্পকে খোঁজে—অলসকে যেমন হাসির মিতালিতে তৃপ্ত হয় না, সে অশকারের উপেক্ষাে ঘুরে ঘুরে। অজ্ঞ কি রাজকন্যা নিজেও তেমনি কোন ঘোলের শব্দেছেন? সরোবর-সিলে তার বিকল্পবিন প্রতিবিম্ব কি সে কখনই তার কানে কানে বলে মেল? এমন একজন ঘোলের, যে ওর শত সহচরীর মত সহধর্মী নয়, অন্য বিধু? বিপরীতবর্ষী? কিন্তু কী তা?

কল্পপ্রান্তরের দিকে কল্পকল্যাঙ্কিত দুটি নরন তুলে রাজবিন্দিনী সহসা প্রত্যক্ষ করে তার মনোমগ্ন প্রেমের হৃদয়ময় উত্তর। স্তম্ভিত হয়ে যায় সে। নবোদিত প্রভাতসূর্যের মত দীপ্তমান এক তরুণকান্তি প্রিয়দর্শন যুগ্মশব্দে দাঁড়িয়ে আছে নিঃশব্দে। তরুণীধারার অন্তরালে অধিমের সোজনে তাঁরই দিকে তাকিয়ে আছে।

ধীরে ধীরে প্রেমের মতো সেমে এসে দাঁড়ায় ইন্দ্রনাথী।

মন্দের চরণে তরুণীধি থেকে এগিয়ে আসে তরুণ, বলে—অমি যক সেনাপতি পুণ্যক। এ পথে আমার এই পক্ষিরাজ অশ্বের পিঠে রাষ্ট্রকর্ম মতলোকে, তোমাকে ফোল খেতে দেখে নেমে এলাম।

রাজবিন্দিনী সভয়ে ধীরে ধীরে বলে—কেন, ফোল খাওয়া কি ঘোলের?

অন্যায়তার এ সরল প্রশ্নে হেসে ওঠে পুণ্যক। রাজকন্যা আরও অপ্রস্তুত হয়ে যায়।

পুণ্যক বলে—নিশ্চয় ঘোলের। ফোল খাওয়া নয়, একা একা বোলা খাওয়া। দেখ না, কুমুদিনী গোষ্ঠায়িত হয় যখন অকস্মে ওঠে পূর্ণচন্দ্র, পক্ষকল্যান আনন্দের হিলেলে হাতে যখন দিনকর উদিত হবে পূর্ণ গগনে।

সত্য বালিকা এর নিম্নে অর্থ উপলব্ধি করতে পারে না; বলে—কেন করে জানব? চন্দ্র-সূর্য তো এসেছে নেই। এ যে পাতলপুরী!

পুণ্যক বলে, দেখতে চাও পৃথিবীকে, চন্দ্রসূর্য-উজ্জ্বলিত দেশকে?

সায়ছে ইন্দ্রনাথী বলে—নিম্নে বাবে আমাকে তোমার পক্ষিরাজে?

পুণ্যক বলে—হাব, কিন্তু তোমার পিতার অনুমতি ভিন্ন তুমি তো যেতে পারবে না।

ইন্দ্রনাথী বলে—কেন?

—তোমার গরু স্পর্শ করি কোন্ অধিকারে?

—কেন স্পর্শ করলে কি হয়?

পুণ্যক হঠাৎ পারে এ সরো বালিকা কিছুই জানে না, বলে—কিন্তু পৃথিবীকে দেখবার জন্য এত আগ্রহ কেন তোমার?

রাজকন্যা অবাক হয়ে বলে—আগ্রহ হবে না? সে যে একেবারে অজানা নতুন দেশ?

—কিন্তু আরও একটি অজানা মহাদেশ যে তোমার মধ্যেই লুকিয়ে আছে, তার সংবাদ কি তুমি পেয়েছ পাতলপুরীর রাজকন্যা? এ নাগসেনার রাজসীমা অতিক্রম করার জন্য তুমি উদ্যম, কিন্তু সন্ধান রাখ কি বৈশাখের সিংহাসার অতিক্রম করে বৌদ্ধরাজ্যে পদাধিপতির শূভকাম আর এসেছে তোমার?

সরলবর্তি অনাভিজ্ঞা কুমারী কন্যা এ প্রশ্নেরও অর্থ গ্রহণ করতে পারে না। মৃগনয়ন



দুটি পুস্তকের মধ্যে সংশ্লিষ্ট করে অন্যটো বলে, তোমার এ কথা অর্থ আমি বুঝতে পারছি না বন্ধ সেনাপতি।

অর্থ আরও সংক্ষেপ করতে পারে না পুস্তক। দুই অক্ষরান্বিত বাহুতে বন্দী করে ফেলে উপনিষদোক্তা শূত্রমুখে ইচ্ছাশ্রুতির কর্তৃত্ব। এর সম্প্রদায় বিহীন বিশ্বাসের একে দেয় তার একান্ত প্রণয়নের রীতিমত সত্যকর।

শিখরিতত্ত্ব ইচ্ছাশ্রুতির আরও শব্দকোষকল্প্য দুটি হাতে আবৃত করে লক্ষ্যবশু মন-পক্ষক। সে বুঝতে পারেন যে সেই উদ্ভাসিত গোপনিলগনে কিসের তুলন্য উপলব্ধি হয়েছিল এতক্ষণ। কৈশোরের সিংহাসনের অভ্যন্তর করে সে দেখতে পারেন যে বৈষ্ণবকল্প-সম্মিত নৃতন মহাশেষ। দ্রুতগমে অর্থাহীনা হর সত্যিকতা রাজনন্দিনী—রাজোদ্যমের পদাঘ-বেগেই প্রতিহত হয়ে কেবল পলায়নপথের মূর্তি নিল।

নাগরাজ বাসুকি বিনিব্রনয়নে রিপাদে রাত্রি একা বসে থাকেন। অর্থাহীন-কল্প্য মহারানী বিদ্যা বায়লাপ বন্ধ করেছেন—অর্থাহীন আরও পুস্তকের বিশদ এসে উপস্থিত হয়েছে নাগরাজে। অমিত্তবিক্রম বন্ধ সেনাপতি পুস্তক এসে নাগরাজ বাসুকির কাছে প্রস্তাব করেছে, সে রাজকন্যা ইচ্ছাশ্রুতির পাণিগ্রাহী। নাগরাজ শিখরিনন্দনের জানেন, এ বিবাহ অসম্ভব। নাগরাজ্যের সঙ্গে নাগরাজপুত্রের বিবাহই বিধেয়। যেক্ষণ পক্ষে রাজকন্যা লাভ কিছুরই সামাজিক অসুবিধা পাবে না। নাগরাজিতত্ত্ব মেনে নেলেন না এই অলপ বিবাহের।

সময় সমাধানের কোন সূত্রই এখন দেখতে পাচ্ছেন না মহারাজ, তখন তাঁর একান্ত সচিব ওঁর কানে কানে বলে—আমার পরামর্শ শুনুন মহারাজ। আমি আপনার সমস্যার সমাধান করে দেব। আপনি বন্ধ সেনাপতিকে বলেন—কন্যা সম্প্রদানে আপনি সম্মত, কিন্তু তাকে উপযুক্ত কন্যাপণ দিতে হবে।

—কি সে কন্যাপণ?

—ইন্দ্রপ্রস্তারকের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনতে হবে বিদ্যের পণ্ডিতের হৃৎপিণ্ডটি।

—যাতে কি লাভ?

—বন্ধ সেনাপতিকে যদি আপনি প্রত্যক্ষ্যন করেন, তবে নাগ ও বন্ধ সেনাপতি অনিবার্য হয়ে পড়বে। কিন্তু এ ব্যবস্থার বন্ধ সেনাপতির সঙ্গে মন্থ বেবে হবে দুঃস্বপ্নের। হৃৎপিণ্ড পক্ষ নাগরাজকে থাকবে যুদ্ধক্ষেত্রের বাহিরে।

—কিন্তু সেক্ষণে লীকিত বিদ্যের পণ্ডিতকেই অপহরণ করে আনতে বলি না কেন? এর হৃৎপিণ্ডের কথা উঠছে কি কারণে?

মন্ত্রী হেসে বলে, কিন্তু মহারাজ! মহারানী কি নিম্নের হৃৎপিণ্ডই প্রার্থনা করেন নি?

—হৃৎপিণ্ড মানে হৃৎপিণ্ড নয় নিম্ন।

মন্ত্রী হেসে বলে—এ কষ্ট রাজনীতি মহারাজ। বন্ধ সেনাপতির পক্ষে হৃৎপিণ্ডের পণ্ডিতকে নাগরাজকে আনয়ন অসম্ভব নাও হতে পারে। বন্ধ সেনাপতির পক্ষে হৃৎপিণ্ড হৃৎপিণ্ডের জন্য কিছুরক এ নাগরাজকে পাঠাতে সম্ভব হতে পারে। কিন্তু বন্ধ সেনাপতির হৃৎপিণ্ডটি প্রার্থনা করবে, তখন হৃৎপিণ্ড হবে অনিবার্য।

নাগরাজ বলেন—এনা তোমার কৃষ্ণবিশি নাগরাজ।

মন্ত্রী হৃৎপিণ্ড প্রকাশ করে বলেন—তবু তো মহারানী এখনও অমাকে সেই প্রাকৃত নগমেই সন্ধান করে থাকেন।

হাস্য সংবেদন করা কঠিন হয়ে পড়ে নাগরাজের পক্ষে। তিনি জানেন, তাঁর এই কুটিল মন্ত্রী কিছুর পণ্ডিতকে ইবা করে, আর তাই মহারানী কিছুর পণ্ডিতের অনুসরণে এই পণ্ডিতমন্ডল সূচনী নাগরাজের নামকরণ করেছেন—নাগরাজ পণ্ডিত।

বন্ধ সেনাপতি প্রতিহৃত হল এ কন্যাপণ প্রদানে। শেক্ত পণ্ডিতরাজে আরোহণ করে সে

যাত্রা করে ইন্দ্রপ্রস্থের উদ্দেশ্যে। ইরাকাতর নাগরিকদের উল্লাস আর ধরে না। এইবার বিধুর পণ্ডিত কেমন করে আত্মরক্ষা করে সে দেখবে একবার।

পূণ্যক কানে, কুব্জরাজ অকতীকৃত জ্ঞানত আসক্ত। সে একটি মহামূল্যে ইন্দ্রকান্দমণি সংগ্রহ করে উপাশ্রিত হল কুব্জরাজসভায়। এই অমূল্য মণিখণ্ডটিকে পণ রেখে সে কুব্জরাজকে অকতীকৃত স্বকন্ডবশুণে অহমানে করে। একে অকতীকৃত্য আসক্তি, তদুপরি ইন্দ্রকান্দমণির কোষ। ইন্দ্রপ্রস্থ অধিপতি সম্মত হলেন; কিন্তু তিনি কী পণ রাখবেন? পূণ্যক বলে, এই মহামূল্যমণির একমাত্র উপায় হতে পারেন বিধুর পণ্ডিত। কুব্জরাজ বলেন, তখাশু।

অকতীকৃত্য পরাজিত হলেন কুব্জরাজ। নিবুপার হরে তাকে বিদার দিতে হল বিধুর পণ্ডিতকে। সোভাষাটা করে রাজাসীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে নিয়ে গেল পূণ্যমুখ কুব্জদেশবাসী। সেখানে পূণ্যক বিধুর পণ্ডিতকে ভুলে নিল অশ্বশৃঙ্গে। কিন্তু অমর্ত্যবিলম্বে এক নিজনি প্রান্তরে পুণ্ডক অশ্বের গতিবেগ সংরখ করে। বিধুর পণ্ডিত বলেন, আমবা কি নাগরাজের সীমানার উপনীত হইবেই যক সেনাপতি?

পূণ্যক বলে না, কিন্তু আপনি আপনার জীবনের শেষ সীমায় উপনীত হয়েছেন পণ্ডিত-প্রবর। নাগরাজ আদ্যিকর কাছে আমি প্রতিশ্রুতিকথ, আপনার হর্ষপণ্ডিট উৎপটিত করে নিয়ে গেলে তবে তিনি তাঁর কন্যাকে সমর্পণ করবেন আমার হাতে।

তরবার নিশ্কাশিত করে পূণ্যক বলে—মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হন মহামন্ত্রী। মহামন্ত্রী হেসে বলেন, জীবনে ঐ একটি জিনিসের কোন প্রস্তুতির প্রয়োজন নেই পূণ্যক। প্রস্তুত অপ্রস্তুত সকলের কাছে মৃত্যু একই রূপে আসে।

পূণ্যক বলে, এভাবে আপনারকে হত্যা করছি বলে আপনি কি আমাকে অভিশাপ দেবেন? বিধুর হেসে বলেন—অভিশাপ কেন দেব পূণ্যক? আমার হর্ষপণ্ডে যদি হুটি তরুণ-তরুণীর মিলনের অকতার ছুঁতে যায়, তাহলে আমার প্রাণলাস হতো সাধক।

পূণ্যক অবাক হয়ে যায়। এ ধরনের কথা তো সে কখনও শোনেনি। তরবার উত্তোলন করতে যায়, পারে না। মনে স্থিতি এসেছে তার।

বিধুর বলেন, তরবারি আমার হস্তে অর্পণ কর যক সেনাপতি। আমি স্বহস্তে আমার হর্ষপণ্ড উৎপটিত করে দিচ্ছি। তাহলে নরহত্যার পাপ তোমার লাগবে না।

একবারে আঁতুত হয়ে পড়ে পূণ্যক। বলে—কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে আমার এক প্রশ্নের মীমাংসা করে দিবে যান আপনি।

—কি তোমার প্রশ্ন? জল।

—নাগরাজ ইরানাতীকে আমি ছবর সমর্পণ করেছি, কিন্তু আমি যক—নাগ নই। এ অসমর্থ বিবাহ কি অনুচ্ছেদনযোগ্য?

বিধুর হেসে বলেন—এ প্রশ্নের জবাব তো এককথায় হবে না। তোমার যে প্রিয়-মিত্র বিদ্যম্ব হসে যাবে যকপ্রবর।

পূণ্যক করে পড়ে ভূ-শয়াল, বলে, হোক কিসম্ভ, আপনি বধুন।

বিধুর পণ্ডিত তখন বলতে থাকেন তাঁর কথা।

অসম্ভবকেই সম্ভব করেছে যক সেনাপতি। নাগরাজকন্যাসদে নিয়ে এসেছে বিধু-বিভ্রুত বিধুর পণ্ডিতকে। সংবাদ শ্রুয়ে নাগরাজের যাবতীয় নরনারী রাজহাস্যাদের সম্মুখে সমবেত। বিধুর পণ্ডিতের চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন নাগরাজ।

সহসা কাহুড় পণ্ডিত বলে ওঠে, কিন্তু এখন কথা তো ছিল না যক সেনাপতি। আপনি বিধুর পণ্ডিতকে সমরীতে এখানে এনেছেন কেন? শত ছিল তার হর্ষপণ্ডিট শূন্য নিয়ে আসবেন।

পূণ্যক হেসে বলে, পৌরিকতার নির্দেশ মহামূল্যে রূপ উপহার দিতে হবে রত-রক্তব্যয় আনত করে দিতে হয়। তাই গিয়েছি আমি। মহামন্ত্রীর যদি সন্দেহ থাকে যে, অরম্যমূল্য শূন্যপণ্ড তাহলে

তিনি সোঁটি নিজেই বলে দেখতে পারেন। সেবেশে কুম্ভারাদিও অংশুনাথ হর্যাপণ্ডিতের সন্ধান করবেন হয় তো।

শুনে সভাস্থ সবলে হেসে ওঠে, পণ্ডিতপন্থা বাবুড়-পণ্ডিতের লাঞ্ছনা।

ভক্তবশে রামানন্দপুরে থেকে এসে পৌঁছেছেন রাজমহিষী বিমলা, সম্মানিত মহান্ অতিথির জন্য স্বহস্তে পান-অর্ঘ্য নিয়ে। তাঁর পশ্চাতে সলসলভাবে এসে দাঁড়িয়েছে চিত্রাংশুবাণ রাজকন্যা ইলাসম্ভাটী। হৃৎমনসে পদ্মক ভাব দিকে ডাকিয়ে থাকে।

মথুরাজার কানে কানে মহারানী বলেন : বাবুড় পণ্ডিত এখানে কেন?

সে অনেক কণ্ঠে প্রকাশ্যেই হয় লম্বকণ্ঠ বাবুড় পণ্ডিতের। স্বানিজ্ঞাপন করে সে অমোঘনে।

রাজা ও রানী মহান্ অতিথিকে নিয়ে বাধ্য। রাজপ্রাসাদের প্রহরীর দল ক্রমাগত ছুটীছুটি করছে। এমন সুযোগ হারাতে রাজ্ঞী নয় পদ্মক। সে গেরগে প্রবেশ করে অগতঃপুরে। রাজকন্যার নিচ্ছত শরন-কণ্ঠে এসে দাঁড়ায়।

সচিবতা রাজকন্যা শব্দা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ায়। পুণ্ডরকের সমীপবর্তী এসে বলে : কেমন করে এমন অসম্ভবকে সম্ভব করলেন আপনি?

পদ্মক বলে, প্রেমের মন্তে তুমি যে আমাকে অজ্ঞের করে দিয়েছ বাসুকি-তনয়া।

ডবু উৎফুল্ল হতে পারে না ইলাসম্ভাটী। আতপ-আগিত কুম্ভারাদীর মত স্মানমুখী কিশোরী বলে, কিন্তু সে শ্রেম যে শেষ পর্যন্ত নিলম্ব্য হয়ে গেল বক সেনাপতি।

—নিম্বল্যা! কেন?

—আপনি শোনেল নি, মহারাজের সভাপণ্ডিত কি কিম্বদন্তি দিয়েছেন?

পদ্মক হেসে বলে—নাগজ্ঞার বাবুড় পণ্ডিতের কিম্বদন্তি নিশ্চয়ই ইলাসম্ভাটী। চিত্রবান আর যিনি সর্বাপ্রণয় পণ্ডিত, তাঁর কিম্বদন্তি নিয়েই আমি তোমার স্মারে এসে দাঁড়িয়েছি বাসুকি-তনয়া।

—কে সেই পণ্ডিত?

—এখনও যেন নি? শব্দা বিব্রত পণ্ডিত।

—কি করেছেন তিনি?

—তিনি বলেছেন, সামাজিক বিদ্যান জন্মায়। কিন্তু সমাজ সৃষ্টি করেছে জীব; সেই জীবের যিনি সৃষ্টিকর্তা তাঁর বিদ্যান আরও জন্মায়। তিনিই সৃষ্টি করেছেন পুরুষ ও প্রকৃতি—স্বর্গের মহাকর্মে বিচার তিনিই সঞ্চারিত করেছেন তাদের অন্তরে অনুভূতির অমৃত। তাতে অমর্যাদা করাই পাপ। সামাজিক বিদ্যার অজুহাতে যারা সেই স্বর্গীর প্রেমকে হতর করে, তারাষ্ট প্রকৃত পাপী।

অনন্দের আতিশয্যে নাথকন্যা আর নিজেকে সবেত রাখতে পারে না। তার ভাব কপোতকীর্ণিত মূখ আশ্রয় খোঁজে বক সেনাপতির কবচক্ষে।

জাতক-বর্ণিত এই মূল কাহিনীটিকে অংশুনার শিল্পী রূপায়িত করেছেন একটি বর্ণনায় চিত্র-কাহিনীতে (২।১৪)। কালানুক্রমিকভাবে সাজালে যে দু'শালাসিঁপুই পদ্য আসে উচিত, চিত্র-কাহিনী কিন্তু সেভাবে সাজানো নয়। বলে, যে লক্ষ্য-বস্তু কাহিনী সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, চিত্র দেখে তাঁর পক্ষে মন-গড়া একটি কাহিনী গঠন করা মনেস্তা শয়। শিল্পী কোন এভাবে কোন কোন চিত্র-কাহিনী সাজিয়েছেন জানি না—চিত্র-নাট্যের ব্যাকরণ নিয়ে না হ'ব আমন্ত্রণ এর পর আলোচনা করব। আপাততঃ যা দেখছি তাই বলি :

অজন্ম শিল্পী এখনও জাতক-কাহিনীতে কিছু পরিবর্তন ঘটিয়েছেন : কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাস শেষক বড়তুঙ্গ শোভাজারী হতে পারেন তিনি তার বেশি হননি। বস্তুতঃ অমিও কাহিনী লিপিবদ্ধ করার সময় কিছুটা অলস-কল করছি। যথা, বাবুড় পণ্ডিতের কথা ভাতকে দেই। জাতককার কানে, বিমল অক্ষয়িক অম্বৈধি বিব্রত-পণ্ডিতের হর্যাপণ্ডিত প্রার্থনা করেছিল। তার কোন অর্থ আমি বুঝে পাইনি। ফৌগবৌল অথবা ইলাসম্ভাটী ছে

মশাই বুঝিয়ে ফেরান—কেন বিদ্যা সর্বদা বিদ্রোহ-পাণ্ডিতের প্রতি প্রাণাশীল হওয়া সত্ত্বেও তাঁর জ্ঞাপিতটি কামনা করে বসল। তাই বাপ হুজুই আমাকে বাবুজ-পাণ্ডিতের চরিত্রটি কল্পনা করতে হতো—কাহিনীটি বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে।

বাণীকে উপরে দেখছি ইন্দ্রপ্রস্থরাজ ধনরত্নের রাজসভায় এসেছে পৃথক (২।১৪৮)। কুব্জরাজ সিংহাসনে আসীন। সিংহাসনে খণ্ড-কটী নকুশ। রাজার দক্ষিণে দণ্ডবৎসেত কুব্জবাহিনী। রাজার সামনে পৃথক; সে বিনয়বনত; তার হাতে ইন্দুকান্ডসাঁঁ। সৈন্যিক সে মৃত্যুশয্যে প্রদর্শন করছে কুব্জরাজকে (চিত-২০)। রাজার পার্শ্বে দৃশ্য অম্বতা।



চিত-২০ঃ ইন্দ্রপ্রস্থ রাজসভা—পাশাখোলা (দলপান-II/14০)।

শিখরে দৃক্খ ব্যর্থনিকা। অমাত্যদের মধ্যে একজন অসামান্য, অপরূপ চিহ্নিত। রাজ্য দক্ষিণহস্তে যে মন্ত্রাটি করছেন সেটি মোট পুই-সংখ্যার মোতক। চির ধাঁধে নিরুদ্ধক নি হতে সবাক চলচিত হত, আমরা তাহলে সজ্ঞাপ শুনতে পেতাম—“যে বাক সোপািত! রাজহস্ত ও কত্রী শৌর্য এই দুটি ব্যতিরিক্ত ছাড়া আর যে কোন স্তম্ভ জাতি পণ রাখতে সম্মত।”

রাজার পদতলের দিকে একজন পুরোহিত—কামী-পাশে কন্যারানের দৌধ-দোড়া লক্ষ্য করার মত। শ্রাবণালের সময়ে এবং সিংহাসনের নিচে আরও দুজনের মূর্তি। একজন পুন্ড্র এবং একজন ইন্দ্রনী। পুন্ড্রটি যে মন্ত্রা করেছে তার অর্থ—সমস্যা। স্ট্রীলোকটি তার জান হাতের তিনটি আঙ্গুল মেলে ধরেছে। আমাদের সবাক চিত্রনাট্যের পরবর্তী সজ্ঞাপটি কি এ মেয়েটির? “আজ্ঞা করবেন মহারাজ! রাজহস্ত ও শৌর্য ছাড়া আরও একটি সম্পদ আপনি ব্যক্তি রাখতে পারেন না—অপনার আত্মস্থান।”

এ দুজনের দক্ষিণের পায়েলো দেখে যাচ্ছে পাশাখোলায় আসর (২।১৪৭)। চিত-২০-এ তার কিয়দংশ পরিদৃশ্যমান। অঞ্চলীভূত ছকটি আসনের উপর কিন্তু শোয়ায়ে না, যেন

ছকী খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে—মনে হচ্ছে যেন উপর থেকে দেখা পাশের ছকের প্যান আঁকা হয়েছে। পাশ্চাত্য চিত্র-ব্যবস্থার অনুশাসন অনুসারে এটিকে পরিপ্রেক্ষিতের দৃষ্টি বলে মনে হতে পারে। বস্তুত তা নয়। কেন নয়, সে সম্বন্ধে যখন পরিচ্ছেদে আমরা আলোচনা করব। এই চিত্রে দেখছি, কুররাজ ক্রমশঃ হেঁচো লাগছেন—তিনিই ঐ স্বপ্নমুহুর্তে দান ফেলছেন। জাতককার লগছেন, এই অক্ষরীক দেখতে শতাব্দিক ভারতীয় মূর্শতি সমবেত হয়েছিলেন—যেন স্প্যান্ডিক-ফিশারের প্রতিবোধিতা! চিত্র আমরা তাঁদের দুজনকে মাত্র দেখতে পাচ্ছি। এ-চিত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কুররানীর আলোখাটি—তিনি কখন লগেন তাকিরে আছেন বন্ধ-সেনাপতির দিকে, যেন মিনতি করছেন—ঐ স্বপ্ননাশা অক্ষরীকটিকে পলিহার করতে করছেন।

ঐ চিত্রের নিচে দেখছি কুররানী দাসীকে কিছু নির্দেশ দিচ্ছেন। তাঁর পাশে দেখছি মহারাজ খনজর কিংব পণ্ডিতের সঙ্গে অলম্পনরত। যেন তিনি পরাজিত হবার পর কিংব পণ্ডিতের কাছে পরামর্শ চাইছেন, এখন কি কর্তব্য; আর পণ্ডিত লগছেন, শর্ত অনুযায়ী কিংব এখন পুণ্যক্ষেত্র ক্রীতদাস। তাঁকে বেতে হবে।



চিত্র—২৪ঃ নারদায়ক ও কিংব (লকখন—II/13)

পরের চিত্রটি (চিত্র ২৪) দেখে বুঝতে পারি মহারানী-দাসীকে কী নির্দেশ দিরেছিলেন। তিনি তাঁকে আদেশ করেছিলেন—কিংব পণ্ডিতকে রানীর মহলে আহ্বান জানাতে। এ চিত্রে দেখছি, রানীর মহলের কেশপাশে সিংহাসনে কিংব পণ্ডিত অসীন, আর পুত্রকামিনীর দল তাঁকে ঘিরে আছে হুতরতে। এই চিত্রে কিংবের আলোখাটি সম্পূর্ণ অন্ধত আছে। এটি কিশকভাবে লক্ষণীয়। এই ছবিটি ঘেঁষে বোকা বার, কীভাবে তাঁর মনঃস্বাক্ষরিত পিল্পী দেখতাব আয়োগ করছেন। প্রতিভাসীন্দ্র মহামতি কিংবের এই আলোখাটি সন্দেহভর এই সম্পূর্ণ চিত্র-কাহিনীর শ্রেষ্ঠ বন্দোবস্ত।

এই দুটি খণ্ডটির মধ্যে একটি বিশালাকার প্যানেল দেখাচ্ছে (২।১৪গ) কুম্ভাকারের ভক্ত প্রজাবল্লব বিধুর ও পুন্ধ্যাককে শ্রেভাচার্য্য করে রাজাসীমান্ত পর্যন্ত এগিয়ে দিচ্ছে। এই প্যানেলটির কল্পকাহিনী গল্পনীয়। হস্তিপৃষ্ঠে মহামতি বিধুর-বিশতীর হস্তীতে পুন্ধ্যাক স্বয়ং তাঁর পাশে।

অর্ধ-শতাব্দী পূর্বে শিল্পী মুকুল দে এই প্যানেল-এর কবিতার কল্পিতকল্পনামূলক :

“অন্যদিকের প্রান্তে এ পুন্ধ্যাক অবস্থান বৌদ্ধ-হিন্দুশাসনিক চিত্রকলায়। শ্রেভাচার্য্য করে একজন রাজা (বিধুর পুন্ধ্যাক) ওলোহেন রাজপুত্র দিয়ে হস্তিপৃষ্ঠে। তাঁর মস্তকে জাহাজ (বস্তুতঃ সন্ধান ছত্র) এবং হস্তে অস্ত্র। পুন্ধ্যাক অশেষকৃত স্বতন্ত্র হস্তীতে অন্য একজন সন্ধানীর অমাত্য (বস্তুতঃ পুন্ধ্যাক)। কুম্ভাকার বিধুর অশেষকৃত, তাঁদের দৃষ্টি রাজার দিকে ফেরানো (বিহারকর্মী বিধুরের দিক)। তবুও চতুর্দশ সঙ্কেত পর্যাপ্ত। এদের মধ্যে এগারোজন সৈনিক বলে মনে হয়, তাঁদের হস্তে কণা কুশল ও টালিকা, দুজন সশস্ত্র এবং একজন ফোলকও ওলোহেন শ্রেভাচার্য্যের সন্ধান।”

অন্যদিক জাহাজ-কাহিনীর সঙ্গে চিত্রটির সম্পর্ক ছিল অনাবিকৃত।



চিত্র-২৬। পুন্ধ্যাক ও ইরাসতীর প্রথম সাক্ষাৎ (জ্যোতিষ-II/14g)।

এর পরের প্যানেলটি নাগরাজ্যে (২।১৪ঘ)। নাগরাজ্যসত্তার বিধুর পশ্চিম নাগরাজ্য বাস্তুকিকে ধর্মোপদেশ দিচ্ছেন। নাগরাজ্যের মস্তকে পঞ্চাশের ঘণা, দুইতর মাম্বাকুর অভিযুক্ত। বিধুর আসেছেন একটি চারপায়েতে,—নাগরাজ্য ভূমিতলে আসনে উপবিষ্ট। রাজ্যের স্থান অক্ষতরাজ্যে সর্বত্রই সম্রাটের নিচে। মস্তক গুহাতেও আমরা দেখব—মহারাজ

\* My Pilgrimage to Ajanta & Bagh—Mukul Dey, London, 1925.

শুশ্রূষাদান ভূতলে উপস্থিত অথচ কবি অসিত বসেছেন কান্ডাসনে। অপরূপমহা থেকে অপরূপ হয়ে আসছেন নাগরানী কিম্বা ও নাগকন্যা ইরান্দাতী। সকলের দৃষ্টিই কিংবদন্তি পশ্চিমতের দিকে নিবন্ধ। একমাত্র ব্যাতিত্ব চিত্রের সর্বস্বারে বন্ধ সেনাপতি পুণ্ডরক—তার দৃষ্টি সর্বদিকের উপভোগ্যবোধনা একটি নারীমূর্তির দিকে দৃঢ়নিবন্ধ।

কালানুক্রমিকভাবে পরবর্তী দৃশ্যটি দেখা যাচ্ছে চিত্র—২৪এ-র দক্ষিণ দিকে। ব্যাঙ্গ্যার ও-প্রান্তে দেখছি বিমলা ও ইরান্দাতী আলোপনরত—নাগ-মা ও নাগ-মেয়ের মাঝে একটি করে নাগকন্যা। নজর করলে দেখবেন, ঐ চিত্রের একেবারে দক্ষিণপ্রান্তে পুণ্ডরকের অর্থতির মাথা উঠিক মাথের—অর্থাৎ মা-মেয়ের এই বিচ্ছিন্ন দৃশ্যগা-সভার বাইরেই পুণ্ডরক অশেষ্য করছে, কখন তার প্রেমাল্পনা বেরিরে আসে।

ব্যাঙ্গ্যার নিচে একটি ক্ষুদ্র গরুকে একশর দেখছি, একজন পুরুষ ও একজন রমনী একসঙ্গে আলোপনরত। জ্ঞ ইরান্দাতী বলছেন, এরা দুজন কিংবদন্তিত ও বিমলা: অর্থাৎ কিংবদন্তি নিভুতে নাগরানীকে ধর্মের মূল কথা শোনাচ্ছেন। মূর্তির স্বলপকে তাঁর বক্তব্য—পুণ্ডরকের বামহস্তে একটি পদ্মফুল, বা-ন্যিক অক্সোসিক্রেটম্বরের পরিচায়ক। পদ্মই ইঙ্গিত করছে যে উনি কোঁসেতু পদ্মপাণি।

মাগ করবেন, আমি জানতে রাজী নই। দুজনের দৃষ্টিতে যা দেখছি তাতে ঠিক মিলন-জন্মের পরের কথা মনে পড়ছে না। বিশেষ করে মেয়েটির কটাকে এবং তাঁটির জেনার শিল্পী যেন অন্য কি একটা কথা কানে রেখেছেন। আমার ধারণা ওরা দুজন যমজের কাহিনীর নায়ক ও নায়িকা—পুণ্ডরক ও ইরান্দাতী। পদ্মফুল? তাতে কি শব্দ পদ্মপাণিরই একচেটির অধিকার? অনুরাগপরিম পুণ্ডরকের পক্ষে মিলন-মহুতের ইরান্দাতীতে পুণ্ডরক-উপহার দেওয়ার প্রয়াসটা কি এতই অসম্ভব?

সর্বশেষে দেখছি একটি গোলন্দ। ইরান্দাতী গোল আছে (চিত্র—২৫)। গোলনার অকল্প কল্পকল্প হাওয়ার উড়ছে। তার সামনে শ্বেত অশ্বের সম্মুখে বন্ধ সেনাপতি পুণ্ডরক এবং তার কাছে পুণ্ডরার ইরান্দাতী। ঠাঁজবনতা নষ্টমুখী বালিকামূর্তি। গোলনার-কো নাগ-কন্যার মস্তকে মনে হয় যেন সাগের কপ, অগলে সেই হাওয়ার-ওড়া কল্পকল্প হা। এ ঘটনায় কাহিনী-চিত্রের সর্বপ্রথমে আসা উচিত ছিল। বোধ করি মিলনমস্তকের পরে শিল্পী পুণ্ডরককে শুনিয়েছেন। অর্থাৎ আধুনিক চলচ্চিত্রের ভাষায় বেন “দ্রাশ-ন্যাক”।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

### তৃতীয়—গজলশ বিহার

তৃতীয় ও পঞ্চম গুহা-মন্দির দুটি অসামান্য। পঞ্চম মন্দিরের প্রবেশ-পথে দু'দিকে দুটি মন্দিরবাহিনী নারীমূর্তি খোদিত। এ-দুটি বিহার সপ্তম শতাব্দীতে অৰ্ধ-সমাপ্ত অবস্থায় পরিভ্রম্য। চতুর্থ বিহারটি আকারে বৃহত্তম। কেন্দ্রস্থলের চতুর পাথরে খোদাই-করা—সিঁহে, হস্তী, অশ্ব, সর্প ইত্যাদি আরও অধিতোড়িক শব্দে সজ্জা অজ্ঞাত মনুষ্য-মূর্তি। শিল্পীর বরফ, তথ্যভেদের স্বরূপ নিলে মর-মানুষ এই অশ্রু প্রকারে মূর্তিবের হাত থেকে রক্তা পড়ে পড়ে। হাল্-কামরার স্তম্ভগুলির পাদমূলে চতুষ্কোণ, অষ্টভুজ আটকোণ। হলের সম্মুখে কাজলার দুই প্রান্তে দুটি গর্ভমণ্ডপ। হলের ভিতরেও দু-পাশে ছটি করে গর্ভমূহ এক পিছন দিকে অগ্রণ্ড করেকটি গর্ভমূহ। অস্ত্রাঙ্গের সম্মুখবর্তী কেন্দ্রীয় স্তম্ভ দুটির অলঙ্করণ বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মত। মূল গর্ভমণ্ডপের ধ্যানসিতমিত বৃক্ষমূর্তি, বলে অহেন পদ্মাসনে, ধর্মচক্রমুদ্রায়। দু-পাশে দুই যোদিসবু। বৃক্ষমূর্তির পদমূলে ধর্মচক্র ও হৃদয়মূল। অস্ত্রাঙ্গের দুই প্রান্তে দুটি করে সর্বসমেত চারটি শঙ্করম্যান বৃক্ষমূর্তি। বরুণহস্তমুদ্রায়।

ষষ্ঠ গুহা-মন্দিরটি অলঙ্কার একমাত্র শিবল বিহার। এটি পঞ্চম খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, একতলার ঘোলটি এক শিবল ব্যাঙের মতো স্তম্ভ আছে, এক সেগুনি একটির মাথার উপর একটি নহে। তার কারণ, অলঙ্কার ঘানের জয়ে গ্রহণ করার জন্য স্তম্ভ-গুলি নির্মিত হয় নি—পাথর কেটে এগুলিকে স্থাপিত করা হয়েছে শব্দে অলঙ্কারের উপস্থাপ্য।

মূল, স্তম্ভগুলি ভেঙে পড়লেও ছাদ ভেঙে পড়বে না। বস্তুতঃ, অনেক গুহাতেই ষষ্ঠ বিহারে প্রথম আবিষ্কারের সময় গত শতাব্দীতে দেখা গিয়েছিল অনেক স্তম্ভ ভেঙে গেছে—ছাদ ভাঙে অক্ষত। সপ্তম গুহার যে ছবিটি চিত্র—২৭-এ দেওয়া হয়েছে, সেটি দেখলে ব্যাপ্ততা বৃদ্ধিতে পারবেন। ষষ্ঠ বিহারের প্রবেশ-পথের দু'দিকে দুটি ছোট গম্বক। একতলার স্তম্ভগুলিতে কোন পাদপট্ট বা শীর্ষপট্ট নেই। আটকোণ স্তম্ভগুলি উপরিদিকে জমজম সবু হলে উঠেছে। একতলার অনেকগুলি ছোট ছোট গর্ভগুহা আছে। এখানে এখনও কিছু কিছু প্রাচীর-চিত্র নষ্টের পড়ে। অবিকালেই নকশা—কিছু মূর্তিগুলি, দু-একটি বৃক্ষমূর্তি বা বোদিসবু। বৃক্ষ ও মূর্তির সংজ্ঞার একটি চিত্রও অংশ অংশ দেখতে পাওয়া যায়। একতলার মূল গর্ভমণ্ডপের সিঁহাসনে উপবিষ্ট অজ্ঞাত-মূর্তির বৃক্ষদেবকে এক শিবলার মূল গর্ভমূহে ধর্মচক্রমুদ্রায় হৃদয়মূর্তির বৃক্ষদেবকে দেখতে পারেন। এছাড়া, অনেকগুলি প্রস্তর-মূর্তিও আছে এখানে। শূন্য, অর্থাৎ সাদৃশ্যতরুণ (১৯৭৭) এখানে দুটি নতুন ছবি আবিষ্কৃত হয়েছে। কোন আভ্যন্তরীণ তা এখনও কেউ বলতে পারেনি। চিত্র দুটি আবিষ্কারের পর অধি অলঙ্কার মাইনি। ফলে এ সংবাদ প্রতিনিধিত্ব।

সপ্তম বিহারটির পরিকল্পনার মৌলিকতা আছে। এর স্তম্ভ-সংজ্ঞা দুটি পোড়াকোণে প্রবেশ-পথের। একতম জোড়া-পোড়াকোণে অজ্ঞাত-মূর্তি গুহার নেই। এলিফান্টা গুহার সঙ্গে কিছুটা সাদৃশ্য মনে হলে যেন। ভিতরে অষ্টকোণে প্রবেশ-পথের অসৌকর্য মন্দিরটি পাথরে খোদাই করা আছে। মূল গর্ভমণ্ডপের প্রবেশ-পথে যে মন্দির, তার দু-পাশে দুটি মন্দিরবাহিনী নারীমূর্তি। মূল মূর্তিটি বৃক্ষদেবের। দু-পাশে চমরবাহী দুই যোদিসবু এক উত্তরম্যান গর্ভমূর্তি। চিত্র—২৮-এ সপ্তম বিহারের প্রবেশ-পথের একটি চিত্র দেওয়া গেল। এটি দক্ষিণ-পূর্ব কোণ থেকে আঁজা। এতে জোড়া-পোড়াকোণে বেশ পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে। পূর্বদিকের জোড়া-স্তম্ভের উপরে ছাদটিকে দেখা যাচ্ছে



অন্যতঃ অবশ্যই, অর্থাৎ পশ্চিম দিকের ছাদ অনেক অংশে ভেঙে পড়ছে। এই প্রসাধে বসি, অজন্মতঃ আমার আর গিয়ে যা দেখি, তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে মেয়ামতির কাহ্ন। আমার মনে হয়েছে, এভাবে সেরামত করানো উচিত হয়নি। এমনভাবে ভেঙে-পড়় শ্মশান-কীর্তিগুহা সারানো উচিত ছিল, যাতে দর্শক বুঝতে পারেন কতটুকু অরিম্মনঃ বা আদিম

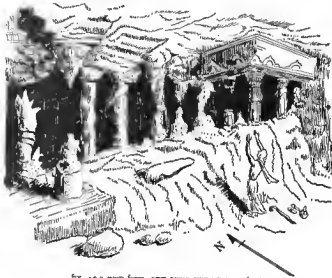


চিত্র-২৩ঃ সপ্তম বিহার—বর্তমান (১৯৩৬) অবস্থা।

হৃদ, আর কতটুকু বর্তমান যুগের কারিগরি। মেয়ামতি-অংশে সিমেন্ট-গোলা দিয়ে অথবা অত্যন্ত হাল্কা চুনাপাথরের রঙ করে এই পার্থক্যটুকু বলার রাখা যেত। এই নীতি অর্কিও-লজিকাল-বিভাগ চিত্রগুলির সেরামতের সময় মনে চলেনে। প্রাচীর-চিত্রের যে অংশ ভেঙে পড়ছে, সেখানে মতন করে অর্কিমার চেষ্টা করেন নি। সিমেন্টের পলেশজরা করে ছেড়ে দিয়েছেন। ভাঙাই করেছেন। আমি বংশী হতুম সেই নীতি ভাঙাশ' ও শ্মশান-কীর্তিতেও অবশ্য সতর্ক করা হলে। আমার বরাবরা বুদ্ধিতে বলি : চিত্র-২৬ হচ্ছে আমি অজন্মতঃ ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে যা দেখেছি তাই ; কিন্তু অংশে কি বুঝতে পারছেন কতটুকু অজন্মতা-শিল্পির কাহ্ন আর কতটুকু এ-বংশের? না, তা পারছেন না। এইবার চিত্র-২৭-এর দিকে চলে দেখুন। এটি শিল্পী মৃত্যুর মের গ্রন্থ অবলম্বনে আঁকা। পঞ্চাশ বছর পূর্বে ঐ প্রবেশ-পথের যে রূপ তিনি দেখেছিলেন, তাই দেখতে পারছি। তিনি অবশ্য এঁটাইছিলেন দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ থেকে। চিত্র-২৬ ও ২৭ মিলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন, কীর্তিখানি মেয়ামত করা হয়েছে। বংশগল্পার মূল মন্দিরটি মেয়ামত করতে গিয়ে যে ভুলটি করা হয়েছিল গত শতাব্দীতে, অজন্মতঃও প্রায় সেই ভাঙার ভুল করা হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে।

অষ্টম বিহারটি রাস্তা থেকে কিছুটা নিচুতে। ঠিক সার্কোটির ধারে। দর্শনীর কিছুই নেই। এটি কিন্তু অজন্মতার অন্যতম প্রতীক গৃহ। প্রায় নবম শতাব্দির সম-সাময়িক। ভাঙনামোড়িকে এখানে বসানো হয়েছে—এখান থেকেই সমস্ত অংশে কীর্তিগুহা সারানো করা হয়।

নবম ও দশম গুহা-মন্দির দুটি, আরোই বজাচি, বিহার নয়—চৈত। অর্থাৎ, বৌদ্ধ প্রমাণের আদান-গ্রহ নয়, উপাসনা-মন্দির। এ-দুটি অতি প্রাচীন গুহা-চৈত, জলন্তার। দশম গুহাটি ঐতিহাসিক প্রথম শতাব্দীতে নির্মিত, দশমটি সম্ভবতঃ আরও প্রাচীন একশ বছর আগেকার, বস্তুতঃ জলন্তার চৈতরী প্রথম চৈত।



চিত—২৭৭ দশম বিহার—প্রাচীন জলন্তা পেরাণ বছর পূর্বের।

নবম চৈতটি চৈত-১৩-এ মিটার, প্রস্থ ৬ মিটার ও উচ্চতায় ৭ মিটার। তুলনায় দশম চৈতটি অনেক বড়; চৈত-২১ মিটার, প্রস্থ ১২ ও মিটার এবং উচ্চতায় ১১ মিটার। চৈতাদ্বয়টির নির্মাণ-কৌশলের একটি বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে। এর সম্মুখে বড়ক বিশেষভাবে অনুসন্ধান করা হয়। সম্মুখ-ভাগ বা 'ফাসাদ'। প্রবেশ-পথের ম্যারের উপরে খোদাই করা হয় একটি করে বৃহদাকার গব্যাক। তাকে কলা হয় সূর্য-গব্যাক। হা-কামরাটি হল সূর্য-গব্যাকের। হা-পাশে দুই সারি স্তম্ভ, তার মাঝখানে উপাসনা-মন্দির, যাকে ইতিহাসিক বলে 'নৈভ' এবং স্তম্ভ ও সূর্য-গব্যাকের মাঝখানে দিয়ে যে গলিপথ তাকে বলে প্রদীপন-পথ, ইতিহাসিক বলে 'আইল'। এই চৈতাদ্বয়টির পরিকল্পনার সঙ্গে রোমান 'বাসিলিকা'র অনুরূপ সাদৃশ্য আছে। চিত—২৮-এ নবম চৈতের প্ল্যান ও সেকশ্যনাল এলিভেশন দেখানো হয়েছে। প্রবেশ-পথের (১।২) বিশ্রুতি প্রান্তে রয়েছে স্তম্ভটি (১।১)। সর্বসমেত ২১টি আটকোলা স্তম্ভ উপাসনা-মন্দিরকে (১।৪) বিচ্ছিন্ন করেছে প্রদীপন-পথ (১।৫) থেকে। প্রবেশ-পথের উপরে রয়েছে সূর্য-গব্যাকটি (১।৬)। এ ২১টি আটকোলা স্তম্ভ ছাড়াও প্রবেশ-পথের দুইদিকে দুটি ছা-কোলা স্তম্ভ আছে।

নবম গুহার সম্মুখ-দৃশ্য বা 'ফাসাদ'টির ম্যারের বোঝাবার উপদেশে এখনো একটি চিত্র

সংযোজিত করা গেলে। এই চিত্র—২৯ নম্বর গৃহ্যের বাহিরের পথ থেকে এক দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ থেকে অঁকা।

এখানে সূর্য-গব্যাকটিক জালভাবে দেখা যাচ্ছে। সূর্য-গব্যাকের উপরে ও নিচে ছোট ছোট খিলানদুলিও এই সূর্য-গব্যাকের অনুকরণে খোদিত। প্রবেশ-পথের দু-পাশে দুটি, তারও পাশে অব্যাহত দুটি অর্ধ-স্তম্ভ বা পিলাস্টার। এ-ছাড়া, দুই প্রান্তে দুটি গব্যাকও আছে। পূর্বদিকের প্রাচীরে লতাকারনামে বৃহস্পতির বৃক্ষমূর্তি এক ছোট ছোট বে বৃক্ষমূর্তি দেখছেন, এগুলি পরবর্তী যুগের সংযোজন। কারণ, এই চৈত্রেটি হচ্ছে হানিয়ান যুগের, তখন বৃক্ষমূর্তি তৈরি করা হত না। হয়তো করেক শত বছর পরে এই মূর্তিগুলি খোদাই করে প্রবেশ-পথের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। চৈত্রেটির ভিতরে কিছু কিছু রিডের নিদর্শন অরুও দেখতে পাওয়া যায়। বৃক্ষমূর্তি, বৌদ্ধবস্ত্র পদ্মপাণি ও বহুপাণি প্রকৃতি। এগুলিও পরবর্তী যুগের সংযোজন।

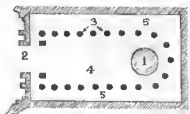
নকশা ও ধর্ম চৈত্রেয় আলোচনার ভাষ্যভাষ্যে গৃহ্য-চৈত্রেয় নির্মাণের বিবর্তনের কথা অস্বাভাবিকভাবে এসে পড়ে। কলতুত, এ সম্বন্ধে এখনও পর্যন্ত আমরা কিছুই আলোচনা করি নি। এখনও করব না—সেটি একটি বিশেষ পরিচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত হবার দাবি রাখে। আগাততর তাই এ মূর্তি চৈত্রেয় বর্ণনীর বা-কিছু আছে, তাই লেখা যাব আমরা।

দশম গৃহ্য-চৈত্রেটি অমলজার প্রাচীনতম চৈত্রে, ঐন্দ্রশূর্য মিত্রীর লতাকারী। আকারে এটি দশম গৃহ্যের তুলনায় বেশ বড়। দশম চৈত্রেয় শেষপ্রান্ত গোলাকৃতি, নবম চৈত্রেয় মূর্তি কোণ-বিশিষ্ট নয়। ভিতরে সর্বসমেত ৩৯টি আট-কোনা স্তম্ভ ১-প্রাচীর-পথে নবম দশম চৈত্রে

গৃহ্যের সেমনি মূর্তি চতুঃস্থান স্তম্ভ আছে, এখানে ত্রৈমসি কোনও স্তম্ভ নেই। চৈত্রেপ্রান্তে স্তম্ভটি অলঙ্করণ-বর্জিত এক অকল্যে বেশ বড়। চিত্র—৩০-এ দশম চৈত্রেয় প্যান ও লেক্সনাল এপিভেশ্যন দেওয়া হয়েছে।

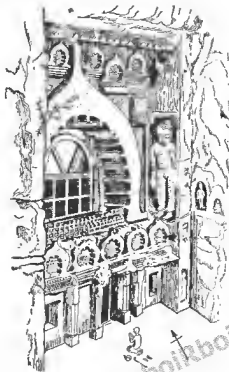
দশম চৈত্রে যে চিত্রগুলি আছে, আছে না বল অলঙ্কা ছিলাই কলা উচিত—কলা-বিশালব-র্য ডালের মূর্তি বিভিন্ন যুগের বলে সম্বন্ধ করেছেন। কিছু চিত্র ঐন্দ্রশূর্য প্রথম লতাকারী; কলতুত অমলজার অধিনায়ক চিত্র। আর কিছু পরবর্তী মহাবান যুগের সংযোজন।

প্রথমেই বাম প্রাচীরে নাগরাকার শোভাযাত্রার একটি দৃশ্য (১০।৫)। লতাকারী নাগরাক স্তম্ভমূলে অর্ধাঙ্গান করতে চলেছেন। অমলজার দিগে আশনি এ চিত্র আর দেখতে পাবেন না। না, মহাকালের হস্তক্ষেপ না, মানবের স্বতন্ত্রতা। কচ্ছি লেকনা। আর দক্ষিণ দিকের প্রাচীরে ছিল বৃক্ষমূর্তি বা বৃক্ষমূর্তি জাতকের একটি অবনয় কাহিনী-চিত্র। এটিও



চিত্র—২৯ ও নবম চৈত্রেয় প্যান ও এপিভেশ্যন  
১—সূর্য; ২—প্রবেশ-পথ; ৩—স্তম্ভ; ৪—উপসর্গ-পথ;  
৫—প্রাচীর-পথ; ৬—সূর্য-গব্যাক।

নিরূপেই অলঙ্কার। ঠাণ্ডাশীল দর্শক যদি মনোমুগ্ধিত নিরূপেই থাকেন, তবে অল্প অল্প অংশে হঠাৎ একদল দেখতে পাবেন। সেজন্য সিল, ব্রিফিং, ইয়াকনাই অথবা সোভি হোইংহ্যামের গ্রন্থ অভ্যস্ত মনোপ্রাণ্য ; তাই তাঁদের গ্রন্থ অলঙ্কারে এই দুটি চিত্রের অন্তর্ভুক্ত করবার চেষ্টা করেছি এখানে।

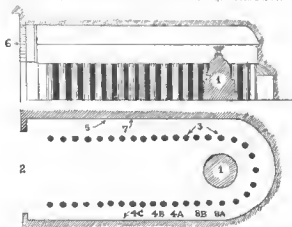


চিত্র—২১৪ নবর টেম্পল সম্বন্ধে স্থান বা কাল।

নাথুরামার চিত্রটি (চিত্র—৩১) দেখে কে বলবে, এই চিত্রের মানবমুগ্ধিত বৃদ্ধির বহুর আশঙ্কার বৃদ্ধির। মনে হয়, বড়কারখানার একদল 'মার্ভিয়া' আনিবসীকে জড়ো করে কেউ বড়ি রতিন গ্রন্থ-কটো তুলেছে এই বিশেষ শব্দার্থীতেই। ঐ বকম মোটা বড়ি, নাথুরামা পণ্ডিত ও বড়ির মালা, চিত্রটি, কণাভরত, শিরশাধ, কমানি অন্যতরতকা নরীর মল আমি সে এই সেদিনও দেখে এসেছি বড়কারখানার 'কোকোমেটার' মড়াই-এ।

কামিনিকে ঠরোদশ, চতুর্দশ ও পঞ্চদশ সতম্বের স্মারকানু ছিল শ্যাম-জাতকের একটি কাহিনী। এ চিত্রগুলিও সম্পূর্ণ অলঙ্কৃত। প্রাচীন গ্রন্থ থেকে এই প্রাচীর-চিত্রের একটি ক্ষণাংশ এখানে এঁকে দিলাম (চিত্র-৩২)। প্রথমে সরলরূপে কাহিনীটি বলি : এই কাহিনীর

সম্পন্ন রূপমণ্ডে বর্ণিত রাজা মনসিংহর একটি মর্মান্বন অভিজ্ঞতার বেশ কিছুটা মিল আছে। শ্যাম ছিলেন অলঙ্কৃত্যমাতার সন্তান। বৃদ্ধ অলঙ্কৃত্যিত বানপ্রস্থ নিরুদ্দেশ—শ্যামই তাঁদের একমাত্র অলঙ্করণ। একদিন বারানসীরাজ শিকারে গিয়ে কোন নদীর সমীপবর্তী হয়ে শুনলেন, ঘন পটন্তরূপে একটা বন্যশব্দ জলগান করছে। কথারীতি রাজা শব্দভেদী বাণ হুঁড়ুলেন, এবং পিতামাতার জন্য পানীর জল সংগ্রহরত শ্যাম শরৎকিৎ হয়ে প্রাণ হারানো। মর্মান্বিত কাশীরাজ শ্যামের হৃৎস্পন্দ বহন করে নিয়ে এলেন অলঙ্কৃত্যী মনসিংহর কাছে। এ-ক্ষেত্রে কিন্তু কাহিনীর উপসংহারটি করণ্য নয়। রাজার আবেগে এক বনসেবী মন্তব্যে শ্যামকে পুনর্জীবিত করার এক অলঙ্কৃত্যিতও তাঁদের হৃদিত ঘিরে পেলেন।



চিত্র ৩২ঃ বন্য ঠরোদশ জাতের ও বর্ণিতচিত্রঃ ১—প্রাচীর; ২—চৌকি পথ; ৩—প্রাচীর; ৪—প্রাচীর জাতক (চিত্র ৩০-৩৭); ৫—নদীরজাতের পটন্তরূপ (চিত্র-৩১); ৬—বৃদ্ধ-বন্যক।

চিত্র-৩২-এ কামিনিকে দেখছি, কাশীরাজ সৈন্য শিকারে অসম্মত। ঈশ্বরদেবের পুরো-জাগে শরৎকিৎ রাজা মনসিংহর করণ্য। তাঁর পক্ষি-কিৎ মনসিংহর মনসিংহ। তাঁর ও-পাশে দেখা যাচ্ছে শ্যামকে। তাঁর বনসেবী-কিৎ মনসিংহর মনসিংহ, তাঁর বনসেবী-কিৎ মনসিংহর মনসিংহ। শ্যাম জানহাতে সেই তাঁরটি টেনে তার করণ্যর চেষ্টা করছে। তাঁরও পক্ষি-কিৎ এগিয়ে গেলে শুনবার মনসিংহ কাশীরাজকে। জানহাতে তুলে তিনি মনসিংহর বর্ণনা দিচ্ছে। মনসিংহর অলঙ্কৃত্যিত দেখা যাচ্ছে। এ অলঙ্কৃত্যিতর ঠিক উপরই একজন পল্লারমান কৃষ্ণর মনসিংহর অলঙ্কৃত্যিত চিত্র। মনসিংহ বর্ণনায় যে কামিনী অলঙ্কৃত্যিত থেকে লক্ষ্য করে যাচ্ছেন তাঁর অলঙ্কৃত্যিতের অতি পরিচিত : ভো ভো রাজন! এ অলঙ্কৃত্যিতকে হত্যা করবেন না।

শিক্ষা দিবার প্রচেষ্টার ছিল বিরূপতার একটি প্রচৌর-চিহ্ন (১০।৪)। বিষয়-বস্তু যতদূর জটিল: এ চিত্রটিও ইয়াজদানী অকল্যাণে এখানে সন্নিবেশিত করতেন। প্রথমে কাহিনীটি বলে নিই:

পূর্বকালে যুদ্ধের বহুবল্লভ-গজরাজের মৃত্যুতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এই ধরাদাসে। তিনি বৃদ্ধ নন, বোঝেন। হিমালয়ের পাদদেশে ছিল হস্তনত নামে একটি বিপাক ছদ্ম-নিভালম্ব, নির্মল তার জল। গজরাজের আয়তন ছিল বিশাল। বিরোধি হাত উঠে এবং একশ-বিশ হাত লম্বা এই মহাবীরের অশীমে ছিল আট হাজার হস্তী অন্তর।

কালন্ত জাতক

মহামার্কিক এই মহাবীর গজরাজের ছিল দুই স্তনী। খুল-সুভাষা আর মহা-সুভাষা। দুই মহিষীকে গজরাজ স্থানে স্নেহ করতেন—একশেষশিখিতা বা শাকপ্যাতিধের চিহ্নায় ছিল না সমদর্শী এই মহাবীরের চরিত্রে। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, বড়রানী খুল-সুভাষা সব সময় স্নেহ করতেন যে, গজরাজ কনিষ্ঠা মহিষীকেই বেশী স্নেহ করেন। তাঁর এ অনুভবের উত্তরে গজরাজ তাঁকে বার বার ব্যক্তি করেছেন—এ-মাতার ইচ্ছাব্যতিরিক্ত মহিষী অহেতুক মনোবেদনের কষ্ট পান—এ অভিযোগ সম্পূর্ণ অমূলক; কিন্তু তবু মাহসর্গ-বিষে জটিলতা কোষ্ঠী মহিষীর চেতনা হয় না।



চিত্র—৩১ ॥ গজরাজা সপরিবারে শতাব্দীতে অধিগমন করত চলেছেন—বিশ হস্তে; প্রাচীনতম চিত্র অজস্রতঃ। (অবস্থান—১০।৪ খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দী)।

একদিন পঞ্চম সুরাবের অগ্রগাহন-স্বচ্ছন্দে গজরাজ তাঁর উত্তরার সময় দেখতে পেলেন ক্রুর-কুসুমিত একটি অশেবকতরু। মহারাজ কীভাবে বলে কান্ডটি শূন্যে অধিশূন্য বন্ধ করে প্রকলিত করলেন। বড় শুল্ক বনকুসুম। কিন্তু দৈবের কী নির্দেশ? বৃদ্ধ-মূল সবই করে পড়ে কান্ডা মহিষীর কুস্তে। আর কিছু শূন্য শীর্ষা-প্রভে পড়ে গোষ্ঠী মহিষীর মাথার। কলকটে হলে ওঠে গজসখীর দল। অতিমাত্রায় বড়রানীর ইচ্ছাব্যতিরিক্ত কথ্য গোপন ছিল না সখীমূলে—তাই এ নিয়ে গৌড়ের কুস্তে হাজল না ওয়া। প্রচণ্ড অপমান-রোধ হল কোষ্ঠী মহিষীর, দুর্ভাগ্য অতিমানো-স্বচ্ছন্দ্য করলেন তিনি। খুব মহারাজ গিলেন থেকে করে বার তাঁকে ডাকলেন; কিন্তু তিনি ত্রাণে কর্পাশত করলেন না।

এই সামান্য ব্যর্থতার পথ বেয়েই ওল চায় সর্বদা। সমস্ত দিন অপেক্ষা করে বইলেন গজরাজ, কিন্তু দিগের এলেন না বড়রানী। স্বাক্ষরটনী তেন করে দুর্ভাগ্য অতিমানো সেই যে তিনি চলে গেলেন, তারপর থেকেই আর তাঁর সম্মান নেই। পরদিন থেকে মহারাজ অনুসন্ধান চালিয়েলেন। কল-বনালম্বের অন্বেষণ করতে থাকে অনুচরের দল, কিন্তু মহারানী বেন হাওয়ার বিশেষ প্রেমে। শেষকালে স্বয়ং গজরাজ উদ্ভবের মত নিজেই নিরুদ্ভবতার অন্বেষণে বের

হয়ে পড়েন। কত মহা-প্রান্তর, কত গ্রহন অকল্য আতিক্রম করে এসেন তিনি—কিন্তু নিরুদ্দেশতার কোন স্বপ্নান পেলেন না।

মুঠে খনশোভনের গজরাজ শয়্য নিলেন।

স্বীয়দিন পরে মহারাজকে এক বিশেষত অনুর কীরে এক মহারানীর সংবাদ নিজে। রাজমহিষী হিমালয়ের এক গ্রহন অরণ্যে গিরে তপস্যা করেছিলেন।

গজরাজ সেবসাহে বলে ওঠেন, তুমি তাঁর দেখা পেরেছ?

অবোধনে অনুচর বলে, না মহারাজ—যে সব নিজনি গৃহ্যবাসী সন্ন্যাসী সংসার ভাগে করে তপস্যা করেন, তাঁদের কাছেই সপ্নান পেরোছি আমি। তাঁদের শরণ নিয়েছিলেন মহারানী। তাঁদের নির্দেশেই কতিন তপস্চর্যা করে সেই হিমশীতল রাজ্যেই তিনি দেখে রেখেছেন।

কড়মল-গজরাজের দু'চোখে নেন আসে বুড়ি জ্বলের দারা।



চিত্র-৩২ঃ শয়্য জাতক।

মহাসম্মী প্রাশ্ন করেন, তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করতে পারেন নি তিনি?

অনুর বলে, আপনায় এ প্রাশ্নের উত্তর দিতে আমি পারলাম না মহাসম্মী। যে সম্মারীর কাছে মহারানীর সংবাদ পাই, তিনি বলেছিলেন—শেষ তপস্যায় রাজমহিষী সাফল্যলাভ করে ছিলেন। তাঁর ইচ্ছাযে এসে তাঁকে বরদানও করে বান, অথচ—

—অথচ কি?

—অথচ তিনি আর কাঁকিতা নেই। কেমন করে প্রার্থনা গুরু হতে তাঁর?

গজরাজ এতক্ষণে প্রশ্ন করেন, কী কর প্রার্থনা করেছিলেন মূহ-সুভদ্রা?

অনুর অবোধনে নিরুত্তর থাকে।

গজরাজ সহাস্য বলেন, তুমি কুণ্ঠিত হচ্ছে কেন? মহারানী আমার উপর প্রতিশোধ নেবার লব প্রার্থনা করেছিলেন, এই হেজ?

অবোধনেই অনুর প্রাধুত্তর করে—আজ্ঞে হাঁ মহারাজ।

কানিতা মহিষী তাঁর লবিকতকণ্ঠে বলেন—ভাগ্যে তিনি কাঁকিতা নেই। না হলো—

কথা নিয়ে গজরাজ বলেন—সেবতার অশীর্ষাব অ সত্ত্বও ফলবে মহা-সুভদ্রা! তাঁর স্বনন্দামনা নিম্পল্য হবে না!

কানিতা মহিষী লবিকায় বলেন—কেমন করে মহারাজ?

গজরাজ সে কথার উত্তর দেন না, শয়্য হাসেন শুধু।

কিন্তু সে প্রশ্নের উত্তর অচিরেই উপলব্ধি করলেন কনিষ্ঠা মহিষী। গজরাজের বেন ক'ই হয়েছে—মাহার-বিহার কোন কিছুতেই তাঁর মন নেই। সমস্ত দিন তিনি অন্যমনে কি বেন চিন্তা করেন। মিথ্যা অভিমানে জোড়া মহিষী সে তাঁকে অপদম্ব করে চলে গেছেন, এ-কথা কিছুতেই ভুলতে পারছেন না বোধিসত্ত্ব মহারাজ। তিনি বেন সকলের চোখে ছোট হয়ে গেছেন। যিনি শূই সমর্থমণ্ডীর প্রতিই সাম্য-দৃষ্টি রাখতে পারেন না, তিনি কেমন করে মাঝতীর প্রজাপাখারপক্ষ সমন্বিতে দেখবেন?

দিন দিন কার্যত হতে থাকে মহারাজের বিশ্রাস মেহ। শেষে রাজাভার যোগ্যতম গজের হস্তে সমর্পণ করে তিনিও চলে গেলেন প্ররক্তা নিয়ে। জোড়া মহিষীর মনোবাঞ্ছা অস্পৃশ্য হইল না—বৃদ্ধমন্ত-গজরাজের সোনার লগোয় ছারখার হয়ে গেল।

ওয়ে কনিষ্ঠা মহিষী মহা-সুভক্ত্যও গত হলেন—একে একে বিপার নিলেন লগোর থেকে মহারাজের অন্যান্য বিস্কৃত অলঙ্কারের দল। শূদ্র মহাস্বর্গির স্বপ্ন গজরাজের বেন মৃত্যু নেই। সামান্য কয়েকজন অনুচরসমেত তিনি হিমালয়ের এক নিভৃততম কন্দরে শেখরীবন বাসন করতে থাকেন।

একদিন সারাৎকালে সুরাঘর অবগাহন-স্নানান্তে মহাপক্ষ নতজানু হয়ে প্রার্থনা করছেন—মনে মনে ক্লাছেন, আমার প্রায়শ্চিত্ত কি এখনও হয়নি প্রভু? মৃত্যুর দিন কি আমার আশও আসেনি?

হঠাৎ তাঁর পৃষ্ঠদেশে একটি প্রচণ্ড শরাস্রত হল। বস্ত্রাঘর কাতর হয়ে গজরাজ পশ্চাতে ঘিরে দেখেন, একজন ধানুকী তাঁর গাতির ওঁকে শরশিক্ষান করছে। বাঘা নিলেন না মহারাজ। মহুদ-মুদ শরবাণে তাঁকে বিম্ব করল শিকারী। আরণ্য সে বিম্বেরে স্তম্ভিত হয়ে গাতিয়ে হইল শূদ্র।

গজরাজ ওঁকে ক্রান্ত হতে দেখে বলেন—তুমি কি চাও বন্দু? এভাবে আমাকে ভ্রমণত শরণার্থ্য করছ কেন?

স্তম্ভিত শিকারী এ-কথার এগিরে এসে বলে, আমি আপনার ঐ প্রকাণ্ড ছটি দাঁত নিয়ে ঘাব বলে এসেছিলাম। আপনারকে যে বিষ-মিশ্রিত রূপে অজ্ঞাত করেছি, তাতে যে-কোন হস্তীর মৃত্যু হওয়ার কথা, অর্থাৎ—

গজরাজ হেসে বলেন, আমাকে বধ করবার মত বাণ তো তোমার তুর্গীরে নেই বন্দু। তা তুমি আমার দাঁতগুলি চাও তো নিয়ে বাও না। এস, কাছে এস—উৎপাটন কর আমার গজবস্ত্র, আমি কিছু বলব না।

নাহসে ভর করে শিকারী সবলবলে এগিরে আসে। বন্দু লাগলেও কিন্তু তারা উৎপাটিত করতে পারে না গজরাজের মহাবস্ত্র।

তখন গজরাজ বলেন—বেশ, তুমি অঙ্গেক্য কর, আমি স্বয়ং ঐ ছটি গজবস্ত্র উৎপাটিত করে দিচ্ছি। বস্ত্র-উৎপাটনমাত্র আমার মৃত্যু হয়ে। সেকথা শেন নেই; কিন্তু আমার ঐ দাঁতগুলি তোমার কি কাজে লাগবে তাই?

শিকারী বুদ্ধিতে পারে ইনি সামান্য গজ নন। সে তখন বুদ্ধকরে নিবেদন করে—মহারাজ, আপনি আমার উপর রুষ্ট হবেন না। আমি আজীবনমাত্র। আমি মুহম্মদ কাশীরাদের মগজাধিপতি, আমার নাম সোদন্তর। আমাদের মহারানী-কন্য দেখেছেন যে, হিমালয়ের এক নিভৃত কন্দরে এক মহাপক্ষ আছে—যাঁর ছটি বিজড়াকার-কলম্বস্ত আছে। মহারানীর শপ, তিনি সেই গজবস্ত্র-নির্মিত পল্লবক্ষে শয়ন করবেন। তাই রাজাদেশে শত-সহস্র শিকারী সমস্ত হিমালয়ক্ষেত্রে অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছে। অকস্মিকেরে আমি আপনার স্বাক্ষা পেয়েই বুদ্ধিহীন যে, মহারানী আপনাকেই স্বপ্নে দেখেছিলেন।

গজরাজ সে-কথা শুনে কিছুক্ষণ ঘ্যান্ঘন হয়ে বসেছিলেন। তারপর ধ্যানভঙ্গ্য হলে তিনি বললেন, তোমার উপর আমি রুষ্ট হইনি মগজাধিপতি সোদন্তর। আমি স্বয়ং আমার ছটি গজবস্ত্র উৎপাটিত করে দিচ্ছি। এ ঘটনা কেন ঘটেছে, তা খানে উপলব্ধি করেছি আমি। এ



বৈশিষ্ট্যবোধ। আমার এই নীতি কতটি তুমি নিয়ে গিয়ে তোমাদের রাজসভাসভকে নিও, আর তাঁকে বলো—এগুলি তাঁকে উপহার দিবেছি আমি। আরও বলো, পূর্বকালে আমি ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁর মস্তকে শূন্য অলঙ্কারকে নিক্ষেপ করিনি!

কল্লভুজ, দন্ত-উৎপাটনমাত্র গলরাজের মৃত্যু হল।

সূর্য্য পাত্রে ঐ অমূল্য গজদন্তগুলি নিয়ে সৌন্দর্যের উপনীত হল বারানসীতে। মহারানীর প্রার্থিত গজদন্ত এসেছে শূন্যে আনন্দের হিলোলা হয়ে গেল রাজসভাতে। বাহকের দল স্বদন্ততগুলি নিয়ে এল রাজানতপুরে। কিন্তু সেগুনি মর্শ্চিন্মাত্র শিঙের উত্তরজন কাশীগাজ-মহিষী।

পূর্ব-কল-স্মৃতি মনে পড়ে গেছে তাঁর। সেই অনিন্দনন্দনের গজদন্তগুলি দর্শনমাত্র কাশীগাজ-মহিষী উপলব্ধি করেছেন যে, পূর্বকালে তিনি ছিলেন ঐ গজরাজের প্রাণী মহিষী। মনে পড়ে গেল তাঁর প্রতিশোধ প্রার্থনার কথা! মনে পড়ে গেল কল্লভ-গজরাজের প্রণয় কথা! মহারাজের অন্তিম জন্ম শূন্যে মহারানী মর্শ্চিন্মাত্র হতে পড়লেন।

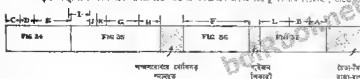
সে মর্জ্জা তাঁর আর ভাঙল না। কেতে মৃত্যুে স্বহস্তানীও প্রাণত্যাগ করলেন।

এ কাহিনী শূন্য দশম গৃহ্যভেদে নয়, সংসদগ গৃহ্যভেদে আছে। দশম গৃহ্যভেদে এই জাতিকাহিনী অলঙ্কারে যে চিত্রপট ছিল, তা সম্পূর্ণ অক্ষত হয়ে গেছে।

কোন করে জানেন? গত সেতক-শূন্য বছরে নানান সাতের মানব এসেছে অলঙ্কারে এবং এই চিত্রপটের উপর ছাঁচ দিয়ে কেটে কেটে নিঃসঙ্গের নাম খোদাই করে গেছে। অসংখ্য স্বাক্ষরে অলঙ্কার হয়ে গেছে কল্লভ-গজরাজের এই অপূর্ণ চিত্রগুলি। অনেককণ লক্ষ্য করলে অসংখ্য স্বাক্ষরের ভিতর থেকে মনে হয়, যেন অল্প অল্প চিত্রের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। মহারাজের বিশাল সেহে বেদন সহস্র বিঘাত তাঁর নিক্ষেপ করেছিল শিকারী, এখানেও যেন তেমনি মহাচিরের গারে সহস্র বিঘাত স্বাক্ষর করেছে অলঙ্কারী। সহস্র সেতকাল জুড়ে শূন্য বেকায়গার, ইংরেজি, উর্দু এবং মাঝিগাড়ের দুর্ভাষা ভাষায় দর্শকের নাম আর নাম! বিহ-কল্লভ-গজরাজ বন্দ্যার কাতরোক্তি করেছিলেন মাত্র, তাতে তাঁর মৃত্যু হয়নি। সত্য শূন্যায় স্বাক্ষরবাল মানবের গরল-স্বাক্ষরেও তেমনি বিহ-কল্লভ-গজরাজ হয়েছিল মহারাজ শূন্যায় শিপকর্ম। কিন্তু তাব মৃত্যু সেই! হজ্জ-স আর চাঁদ্রের স্নেহে পৃষ্ঠায় মৃত্যুকর্মী চিত্রটি অক্ষর হয়ে আছে পৃথিবীর যাবতীয় গ্রন্থাগারে। মৃত্যুপত্র সে চিত্র সত্যায়ন পত্রিকার নগালের বাইরে। তাঁদের এই গ্রন্থকারের অক্ষর প্রচেষ্টাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

এ-চিত্রের সম্মুখে দাঁড়িয়ে চোখ ফেটে ফল এসেছিল আমার। শূন্য একমাত্র সাক্ষর—স্বাক্ষরের সে হরিহরহর-মনোর 'আ-মরি কাঙলা জাবা'-র সন্ধান পাইনি আমি।

অলঙ্কার এই অন্তিম প্রাচীন চিত্রের বিষয়ে এবার আলোচনা করা যাক। সৈয়দ আব্বাস-কৃত অনুদীপ্তি অলঙ্কারে আমরা চিত্র-০০-এ সর্বপ্রথমে একটি চিত্র-দৃশ্যকর্মের বিবরণ, তাতে



চিত্র-০০

বিভিন্ন স্বাক্ষরের অবস্থান দেখানো হয়েছে। এই কাহিনী-চিত্রটিকে একটি তিন-অক্ষর নাটকরূপে কল্পনা করা যেতে পারে। প্রথম অক্ষর দুটি দৃশ্য—'A' এবং 'B' চিত্রিত। দ্বিতীয় অক্ষর নীতি দৃশ্য—জন্মের 'C' থেকে 'K' অক্ষর সত্যায়ন করেছি। তৃতীয় অক্ষর একটি

মাত্র দৃশ্য-'I' চিহ্নিত। এ-প্রশ্নে পরবর্তী চারটি চিত্র—চিত্র-৩৪, ৩৫, ৩৬ ও ৩৭-এর অবস্থানও ঐ সাহসিকাতিক চিত্র—৩৩-এ দেখানো হয়েছে।

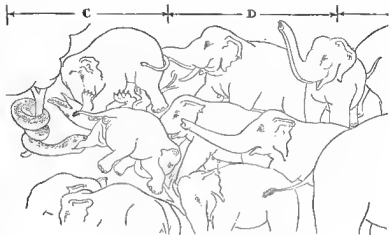
প্রথমেই A-চিহ্নিত প্যানেলে দেখছি, কাশীরাজমহিষী (অর্থাৎ বিনি পূর্বকল্পে ছিলেন কুরু-সুভদ্রা) অভ্যন্তর করে করালমুখশোভা করে আছেন একটি কারুকার্যবর্ধিত আসনে। কাশীরাজ বেন পূর্বমুখভর্তে বসেছিলেন, এখনই উঠে দাঁড়িয়ে মহারানীকে সামনে নিয়ে কলহেন, কুরুমুখ গজরাজের সম্মানে তিনি এখনই পিকারীদেব পরাচ্ছেন। এই খণ্ডচিত্রে রানীই আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। তাঁকে ঘিরে আছে আরও চারজন কিল্করী। পিছনের চন্দ্রাতপ এবং সম্মুখের কমণ্ডলু কাণ্ডীয় পাটটি লক্ষণীয়। রাজার গায়ের চট্টোজোড়া দু-হাতার বহরের পুরানো হাতে পরে বিন্দু ঐ কাণ্ডীয় হাওড়াই-চন্দ্রল আঁক ও বাজারে পাওয়া যায় (চিত্র-৩৭)।

B-চিহ্নিত পরবর্তী দৃশ্যে দেখছি—মহারাজ সিংহাসনে আসীন। তাঁর মাথার উপর রাজমুদ্র, সামনে বিনয়ানবর মৃগাধিপতি সোমুদ্রের ও তার সহচর। রাজার দক্ষিণে বসে আছেন রাজ-মহিষী। এ চিত্রেও হরজন মরনারী চক্রাকারে মূল চিত্রমণ্ডলে বেটন করে আছে। রানীর এক পাশে গাছ অপর পাশে রাজমুদ্র চিত্রে ভারসাম্য রাখা করছে। আর এই প্রসঙ্গে মনে রাখুন সোমুদ্রের হাতগাতা রাজার ডিকাইনট; ডাইলে পরে এক সময় করা সহজ হবে। আরও লক্ষণীয়—রাজার পিরম্ভাণ, তাঁর কণ্ঠের শতেনরী, তাঁর ভোমরবন্ধ, উকীল ও বদৌর পায়ে মলজোড়া। এগুলির মধ্যে তুলনা করুন ইতিপূর্বে দেখা চিত্র—৩১ ও ৩২। তাহলেই বুদ্ধবন্ধ, ব্রীটপূর্ব যুগের শোভা পরিচয় ও আশ্চর্যের বৈশিষ্ট্যটুকু। এদের দোশর আশনি অঙ্গুতার আর খুঁজে পাবেন না—পারবেন সচী, জরহুত, উদ্বিগ্নচিত্রে। সে কথা পরে আলোচনা করব। আশ্চর্য কাহিনীর সূত্র ধরে আমাদের দেখতে হবে নাটকের শিল্পীর অঙ্ক। চিত্র—৩৪ (যাম)-এ C-চিহ্নিত প্যানেলে গভীর অঙ্গুতমণে আসতে হবে এমার জামাদের।

সেখানে দেখছি—হিমালয়ের ডরই-বললে এক হস্তিবাঁধ। ভজনিক রস! একটি হস্তীর পরভলে একটি কুণ্ডলীর শিষ্ট হতে কলহে। জামার দেখছি, একটি অঙ্কর হস্তিশাশকের পিছনের বাহুরেণটি গ্রাস করেছে। বেণ বোঝা যায়, শিল্পী অঙ্গুতরী হস্তিবাঁধের জীবনব্যাপী সম্বন্ধে ওত্রিকবললে, কাহন দেখছি—এ কিল্করন্ত হস্তিবাঁধকে সাহসে করতে বুঝে তিন চারটি কুঁহা হাতী শূণ্ড আশ্চর্যজন করতে করতে ছুটে আসছে (D-চিহ্নিত অংশ)।

পরবর্তী দৃশ্যে (চিত্র—৩৪-এর E-চিহ্নিত অংশে) হল নায়কের আকর্ষণ। কুরুমুখ গজরাজকে ঘিরে আছে অনেকগুলি হাতী। 'F'-চিহ্নিত প্যানেলের কেন্দ্রবিন্দুও ঐ যজ্ঞমুখ গজরাজ। জনশ্রুতি ধানুকী সোমুদ্রকে দেখা আছে, তার গারে সেই পরিচিত কুঁহা। সোমুদ্রের সম্মুখে যে হস্তীটি আছে তাকে সামনের বিক থেকে আঁকা হয়েছে, এক-মেরোমি পুর করছে। এই চিত্রে আরও লক্ষণীয়, শিল্পী একটি বিরাট কুঁহা একেছেন। ভারতীয় চিত্রে হাতীর সংখ্যা জামার মরনারী কল্লীকে দেখতে অজান্ত—এ-কল্পে একটা মৌ কুঁহাওম হল। বোধকরি গজরাজ যে বিশাল কুঁহকের ন্যায় অনুচরের হাঙ্গা ও প্রাণে ধানুকীকে সর্বোচ্চেন এমন একটা ইপিডে শিল্পী দিতে চেয়েছেন।

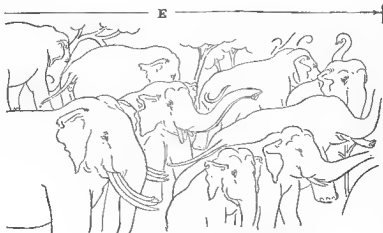
G-চিহ্নিত প্যানেলের কেন্দ্রবিন্দুও ঐ গজরাজ। ইচ্ছা করলে তাঁকে ঘিরে আছে। গজরাজের শূণ্ডে প্রকাণ্ড একটি পদ্মসম্মিত মহাশালকটু। পার্শ্ববর্তী H-চিহ্নিত প্যানেলে পদ্মসম্মিত হস্তিবাঁধের জলকলীর দৃশ্য। গজরাজের কুঁহাটুকু অত্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে দক্ষিণতম প্রান্তে। I-চিহ্নিত প্যানেলে দেখা যাচ্ছে সোমুদ্রের করাত ঘিরে গজমুখ কাটতে উদ্যত; অহিসেন্দবে দীক্ষিত তিনটি মহাশাল অধরে নিচল দাঁড়িয়ে দেখছে এই কল্লি দৃশ্য। এর পরেই দেখা যাচ্ছে (J-চিহ্নিত প্যানেলে) সোমুদ্রের ঐ কল্লি বহনবন্ত বহন করবার আয়োজন করছে। গজের উপর একটি মরু। কাহিনী জরপর এগিয়ে চলল—K-চিহ্নিত চিত্রে। সেখানে দেখছি, সোমুদ্রের বীকে করে গজমুখ নিয়ে কাশীর পাশে রঙনা হয়েছে। এখানেই শিল্পীর অঙ্কের সমাপ্তি।



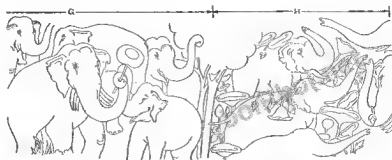
চিত্র-৩৯ঃ (বাম) অশ্বত্থাভাটক-সামান্য ইটিংগুয়ায় জীবন।



চিত্র-৪০ঃ (বাম) অশ্বত্থাভাটক-সামান্য ইটিংগুয়ায় জীবন।



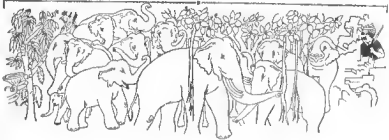
চিত্র-৩৪ : (মৌসুম) হাফলুজারত—হাফলুজার বৈশিষ্ট্য গজবাহার।



চিত্র-৩৫ : (মৌসুম) হাফলুজারত—গজবাহারের হাফলুজার গজবাহার।

সেই অংশে একটি মাত্র দৃশ্য—প্যানেল 'L' (চিত্র-৩৭)।

সেখানি, সোনার সোই একই পোষাকে এসে উপনীত হয়েছে কাশীশ্বরের রাজসভায়। তার কণ্ঠে গল্পবায়ের অন্তিম ভাবধ শব্দে মহারানীর পূর্ব-অভিজ্ঞান ঘিরে এসেছে। তিনি মুহূর্ত-তুরা। রাজা কনৌজলেন পরশেই, যুরে বসে মুহূর্তেই রানীর তনুদেহটি ধরতে বাঞ্ছন। রাজা-রানীর শিখরে চারজন কিস্করী। তাদের প্রত্যেককে এই নীরব-নাটকের বাস্তব কুশীলব।



চিত্র-৩৬ : হৃদয়ভাঙক—হৃদয়-অন্তরে গল্পবায়কে সোনার সোই দেখছে।



চিত্র-৩৭ : হৃদয়ভাঙক—কাশীশ্বরের সভাস্থা।

['A' পাতালাটি নাটকের প্রথম দৃশ্য এবং 'L' পাতালা পোষাক, বর্ণিত দুইই কাশীশ্বরের কুশীলব দৃশ্য। অবশেষে চিত্রিত দৃশ্যে যখন এক 'সেই' এর দৃশ্যগ্রহণ একই সঙ্গে হলে—নাটকের 'কুশীলব' ধারণা দেখানোই হলে—একত্রণে যেন মিলনটি সেইভাবে একত্রে। অর্থাৎ চিত্র-৩৬ ও ৩৭-এ 'হৃদয়' চলচ্চিত্রের 'অরুণা-প্রশেষ' কণ্ঠ্যভাষণ প্রদর্শন।]

দক্ষিণতম যেন একটা 'অর্থ' চাঁৎকার প্রতিহত করতে মুহূর্তেই চাপা দিয়েছে। তার পার্শ্ব-বর্তিনী কোনও ঐক্যগাত বহন করে আনছে। তার কাছে একজন ব্যক্তিকতা পাশ্চাত্য-সমাজের মুহূর্ততুরাকে সেনা করছে। বামপ্রান্তের দ্বতধারিণীর বিস্ময়ের খোর যেন কটোমি—সে এখনও আঁকির আছে গল্পবায়ের কণ্ঠিত দলতরঙ্গির দিকে। পূর্ববর্তী দৃশ্যে (A এবং B চিত্রিত) আমরা মহারানীর পদসেবারিণী একটি কিশোরীকে দেখেছিলাম—এবারেও সে উপস্থিত। বর্তমানে রানীর বাম চরণধারিণী কেলে তুলে নিয়ে সে হাত বুলাচ্ছে। রানীর কাছে তার একটি কিস্করীকে আঁকতে শিল্পী বাবা হয়েছেন ভারসাম্য-বক্ষার প্রয়োজনে—কণ্ঠে-খাতা মহারাজের ওলসে না-হলে এই প্রতিসাম্যমূলক কণ্ঠধারিণীটি একপাশে জারী হবে যেত। নিম্নলিখে

এই বেনস-বিশুদ্ধ চিত্রটি এ পর্যায়ের প্রথম শিল্পকর্ম—বৈশ্যবর্গী ক্রীষ্টপূর্ব-যুগের প্রথম শিল্পকর্ম—অমলতার।

দশমের পরে একাদশ গুহা। এটির নির্মাণকাল সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। পার্সি বার্টনের মতে, এটিও যথেষ্ট প্রাচীন—হীন্যান যুগের শেষ পর্যায়ে অথবা মহাবান যুগের উষ্ম যুগের। এটির নির্মাণ শূন্য হয়। তিনি বলেছেন, সম্ভবতঃ প্রথম একাদশ গুহা শতাব্দীতে এর কল-কর্ম আরম্ভ করা হয়। অথচ অন্যান্য গ্রন্থে দেখছি এটি পঞ্চম শতাব্দীতে নির্মিত।

বিহারটি ১১০ মি × ৮০ মি উচ্চতা ৩ মি। সম্মুখস্থ অলিম্পের স্তম্ভদ্বারিতে দেখছি চতুর্মেদণ পাদপাঠ, আট-কোনা মধ্যস্থ এক চতুর্ভুজ শীর্ষপাঠ। বিহারের প্রবেশদ্বারের জ্যামিতিক নকশা আর ফুল-পাতা আঁকা। অলিম্পের দক্ষিণ দিকের প্রাচীরে বৃক্ষসেবের একটি চিত্র—তার দু-পাশে দুটি বোধিসত্ত্ব। অলিম্প থেকে বিহারে প্রবেশের জন্য নির্মিত পথের বামদিকে, ভিতরের দিকে যুদ্ধের একটি বোধিসত্ত্বের আলম্ব্য। তার হাতে সেই লীলাপদ্ম—তিনি বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণি। বোধিসত্ত্বের বামে দুটি রমণী অর্থাৎ দান করছে—তার ভিতর একটি নারীটির নিশ্চয়জন্মে অঁকা।

একাদশ বিহারেও দেখলাম সেই চার হীরকের একমুখার শিল্প-চাতুর্য। আর একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলাম এই যে, হীরক গ্রাসে বৃক্ষমূর্তির চতুর্দিকে প্রদীপ-পদ্ম আছে—যা নাকি অন্য কোন বিহারে নেই।

আসেই বলাই, এ গুহাটির কাল-নির্ণয় নিয়ে মতামতের ঘর্ষেই বিশেষজ্ঞদের মধ্যে। পার্সি বার্টন সাহেবের গ্রন্থটি পূর্বে প্রকাশিত। ফলে, অনুমান করছি, পরবর্তী গ্রন্থকাররা পরবর্তী গবেষণার ফলস্বরূপই এটিকে পঞ্চম শতাব্দীতে চিহ্নিত করেছেন। আর্কিওলজিকাল ডিপার্ট-মেন্টে এ-সব গবেষণার ফলাফল নিশ্চয়ই পড়ার ব্যয়; সহজলভ্য গ্রন্থপট থেকে আমি তা বুঝতে পারিনি। সত্যায়ণ বর্ণক হিসাবে আমার তো মনে হয়েছে, পার্সি বার্টন সাহেবের যুক্তি একেবারে টাঁকুরে দেওয়া যায় না। কারণ, এই একাদশ গুহাতেও দেখছি নৃসিংহের অনুকরণে সেই প্রস্তর-খন্ড—যা নাকি ত্রিংশতি, লতম, ম্যাদশ ও গ্লোদশ বিহারের বৈশিষ্ট্য বলে মনে হয়েছে। পঞ্চম শতাব্দীতে নির্মিত পঞ্চদশ, ষোড়শ বা সপ্তদশে তো জা নেই। তাই আমার মনে হয়েছে, এ গুহা-বিহারটি মহাবান যুগের উষ্মকালেই প্রথম খনন করা শূন্য হয়েছিল—বাইও গভর্নিমেন্ট প্রদীপ-পদ্মসম্মত বৃক্ষমূর্তি, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি অনেক পরের যুগের যোগনা। অবশ্য বিশেষজ্ঞের নিষেধে আমার এ নিম্নক আলোচ্য ভ্রাম্যক বলে প্রমাণিত হতে পারে।

দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ গুহার কথা আমরা আসেই বলছি। পঞ্চদশ গুহার বৈশিষ্ট্য হল এই মধ্য ও বে, এটি হীন্যান যুগের না-হওয়া সত্ত্বেও এতে কোন স্তম্ভ সোপান বিহীন সেই।

এরপর আমরা হেস্কে-সম্মত ষোড়শ বিহারে পদার্থপর করতে পারি।

এই ষোড়শ বিহারের প্রবেশ-পথে দুটি অশ্বের ভাস্কর্যের নিদর্শন দৃশ্যের দুটি আকর্ষণ করে। প্রথমটি হল নায়রজা ও নায়রানী, দ্বিতীয়টি হল বিশালভাটন দুটি বতহানু হস্ত-মূর্তি। প্রবেশ-পথে বলা অবশ্য ঠিক হল না। যে সমস্ত মূর্তিটি বাসোজা নদীর চরবর্তনের সমান্তরালে অমলতা-গুহাদ্বারকে সম্মুখ করেছে, সেই পথ থেকে ষোড়শ বিহারে প্রবেশ করতে হলে আমার কতকগুলি সোপান অতিক্রম করে আসতে হয়। সেই সোপান-প্রাঙ্গণ প্রথম ধাপের কাছে আছে যুদ্ধ হস্তী, মধ্যপথে বা ল্যাংকিঙে আছে নায়রজা ও নায়রানী মূর্তি।

নায়র-মূর্তির মূর্তি একটি কুম্ভাঙ্গুর মধ্যে খোদিত। বলে আছেন যুদ্ধে একটি প্রস্তরাসনে। রাজার বামপদ প্রদীপিত, বামহস্তে দেহভের সযুক্ত। দক্ষিণহস্তটি ছেড়ে গেছে। নায়রানীর মূর্তি ইঞ্চি কেমনে, তিনি যেন সোপানযুগী ব্যাটীর দেখছেন। রাজার

দক্ষিণে একজন চামরধারিণী। রাজার মাথার কিরীটকার ন্যায়ের কল। কুলদ্বিপার দৃশ্যে দুটি শতম্ভ—ফোলাকৃতি, কোন পদধাতি নেই; কিন্তু শীর্ষশীর্ষে মল্ললককল ও অমলক আছে।

শিবীর ঘৃতি\* অর্থাৎ নতজানু হুগল হস্তিমুখিতর বিধে মহম্মদ ইস্রাইল সাহেব আমাকে একটি কৌতুহলোদ্দীপক তথ্য জানিয়েছিলেন। কিন্তু তার আগে মহম্মদ মীর ইস্রাইলের† পরিচয় আপনাদের জানতে হয়।

অমলতার পেঁচে গৃহ্য-মন্ত্রিগণের অবস্থান দেখাবার উদ্দেশ্যে আমি একটি সাইট-স্যান অবিস্মার চেষ্টা করি। আমার সে প্রচেষ্টার পরিণাম এ গ্রন্থের চিত্র—১। গাইত বইতে অমলতার ম্যাপ ছিল না।

অমলতার বিষয়ে একটি চিত্র-মহল মোটে বই সম্পন্ন নিয়ে গিয়েছিলুম। সত্তর টকা দাম। তাতে অমলতার কোন ম্যাপ নেই। ইরানস্থানী সাহেবের চার খণ্ডে প্রকাশিত প্রামাণিক গ্রন্থে ম্যাপ আছে, কিন্তু উত্তর-নির্দেশক রেখাটি নেই। কলকাতা জাতীয় গ্রন্থাগারে লোভ হেরিয়ারাম-সংকলিত যে গ্রন্থটি আছে, তাতেও অমলতার ম্যাপ পাইনি। সে প্রাচীন গ্রন্থে গ্রন্থের দশটি পৃষ্ঠাই নেই। আমার সঙ্গে এখানে ছিল ভারতীয় স্বাধীনতার উপর একটি প্রামাণিক গ্রন্থ; কিন্তু মুশকিল এই যে, সে বইতে ম্যাপে যে উত্তর-নির্দেশক রেখা আছে, আমার কম্পাস কাছে সেটা দাঁড়ান দিকট। সূর্য তখন মাথার উপর। উত্তর দিকটা সমস্ত করতে পারছি না। ফলে, রীতিমত মুশকিলে পড়লুম। সূর্য-স্বাক্ষের অবস্থানের সঙ্গে উত্তর-নির্দেশক রেখাটির নিবিড় সম্পর্ক—ওটা না হলে চলেবে না। জরীপের কালে হুগোর বহু সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি; কিন্তু প্রামাণিক গ্রন্থের নির্দেশ এভাবে লগায়ে করেনি কখনও আমার দীর্ঘ-দিনের সহচর এই মোট কম্পাসটি।

শেষ পর্যন্ত কম্পাসটি হাতে নিয়ে হাজির হলাম অর্কিওলাজিকাল বিভাগের অফিসে অর্থাৎ চিকিট-ঘরে। অফিসরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলি—ম্যাপ করবেন, আপনাদের এখানে উত্তর দিক কোন্‌দিক?

ভুলোকে হেসে বলেন—এমন অস্বভাব কথা তো কখনও শুনিনি। আপনাত হাতে কম্পাস, আর আপনি উত্তর দিক বুঝতে এই অফিসের ভিতরে এসেছেন?

আমি বলি, কিন্তু মুশকিল কি জানেন, কম্পাস ছাড়াও আমার হাতে রয়েছে ভারতীয় স্বাধীনতার উপরে একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ।

বইটি মোলে ধরি ও'র সামনে।

ভুলোকে অবাক হতেন। অফিসের আলমারি থেকে ও'র নিজস্ব বইটি বার করে দেখে বলেন—অস্বর্ষ, এটা তো এতদিন নজরে পড়িনি।

এই সূত্রে আলাপ হল ভুলোকের সঙ্গে। আমার উদ্দেশ্যের কথা শুনেন বলেন—আজ্ঞা, আপনার একটি সুবিধা করে দিই। জ্যে ইরানদলার একজন বৃদ্ধ ছাত্র এখনও এখানে আছেন। নিলাম সরকারের পুরাতত্ত্ব-বিভাগে চাকরি করতেন, জ্যে ইরানদলার দ্বারা ইঙ্গাবে দীর্ঘদিন এই গৃহ্য-মন্ত্রির তার সঙ্গে কাজ করেছেন। অবশ্য নেয়ার পুত্র অমলতা ছেড়ে যেতে পারেননি। তিনবুনে তার তেউ নেই। এই গৃহ্য অক্ষরিত্রী এখনেই পড়ে আছেন, এখন গাইলের জীবিকার প্রসারস্থান করেন।

\* পুরোস্তর একজন বৃদ্ধ\* নামে একটি প্রবল-সাহিত্যী দেশ পত্রিকার একবার লিখেছিলেন। তাতে একাত্তার একটি কলির কল কলিয়ে করার অন্তরে পরে নিরত হতে হতেই, দশক-সবরীতে বর্ণিত কয়েকটি চরিত্র সম্প্রদায় ও গায়ের কল বহু প্রকারে এসেছিল। তাই মিলিয়ে কল রাখতে চাই—এ সমস্ত কলিয়ে, কলিয়ে বার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল তাকে বারে সবার কল না বার তাই তার নাম-রূপে ইচ্ছাকৃত পরিবর্তন ঘটিয়েছি।

† Ajanta & Ellora—By Gupta & Mahajan, Taraporevala, Bombay.

‡ Indian Architecture (Buddhist & Hindu Period)—By Percy Brown, Taraporevala Publication, 2nd Enlarged Edition, Page 28.

উনি খবর পাঠলেন। ভদ্রলোকের আসতে যেতেন, ঘেরী হল তার মাঝে আমাকে সন্ধান করে দিলেন—গুণীলোক, বুকেছেন, কিন্তু ভরী ধামধেরানী। ভাতকের কাহিনীগুলি ও'র কণ্ঠস্থ—জ্যেব বুকে প্রতিটি চিত্রের অবস্থান বলে যেতে পারেন।

তারপর টিকিটমাস্টর দিকে আড়চোখে একবার তাকিয়ে একটু বুকে পড়ল আমার দিকে। অনুচ্চস্বরে বলেন—আর একটা যোগান কথা। এই গৃহা-চিরগুণিলির মধ্যে বিশেষ একটি সূন্দরীকে নাকি উনি ভাব্যবাসভেন, আর তাই এখানে থেকে অন্য কোথাও গিয়ে বৈশি-দিন টিকতে পারেন না। বায়োয়ানদের অনেকেই বলছে—যাত্রী না থাকলে উনি সেই যাত্রী-চিঠির সামনে নাকি ছুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকেন ঘড়ির পর খটী।

প্রশ্নও কৌতূহল হল, বলি—কোন চিঠি কখন তো?

কিন্তু সে প্রশ্নের জবাব শুনেবার আগেই শ্বাসপ্রশ্বাসে পদাটনি শুনেতে পেলুম। এসে উপস্থিত হলেন ভদ্রলোক। মহম্মদ মীর্জা ইস্‌মাইল। শপি'কার বৃন্দ, মাঝার একমাথা সাদা চুল—মৌক-নাড়ি কামানো। গারে গলানন্দ কোট, হাকডার, পরিধান্যে পারজামা। বিশৃঙ্খল ইংরেজি বলতে পারেন। আমি অজানতার নিম্নে প্রশ্ন-প্রকাশ ইচ্ছুক শুনে পারছিলাম আমাকে নিরে বার হলেন।

অনুভূত গুণীলোক। ভাতক-কাহিনীগুলি তাঁর কণ্ঠস্থ, এমন দরম দিয়ে চিরগুণিলির মর্মকথা বর্ণনা করতে থাকেন যে, মৃদু হয়ে শুনেতে হয়। কিন্তু নবম গৃহা পর্বন্ত এসে লক্ষ্য করলুম, ভদ্রলোকের কথা বলতে কণ্ঠ হচ্ছে। ক্রমাগত কাশছেন। প্রশ্ন করে জানি, গলরোগ থেকে তাঁর সর্পি'কালি হয়েছে। বলি, আমি এখানে দু-একদিন থাকব, কাল না হয় আঁকটি দেখা যাবে।

ভদ্রলোককে তাঁর পারিশ্রমিক মেঝার উন্মোচন করতেই তিনি এক-পা পিছিয়ে গিয়ে বলেন--মাশ করবেন। আপনাদের কাছে কিছু নিতে পারব না।

আমি অবাক হয়ে বলি—সে কি, কেন?

—ভাতারে কি ভাতারের কাছে কি নেয়?

—তার মানে?

—আপনি জগন্নাথ দেখতে আসেননি, দেখতে এসেছেন। আপনি টুরিষ্ট নন, আপনি গাইড। আমি ও আপনি মিলেছে।

অনেক পীড়াপীড়ি করেও যখন কিছু হল না তখন বলি—তাহলে এক কাজ করুন। আপনি বিশেষী যাত্রী যোগাড় করুন। আমি যখন গাইড তখন আপনার সাক্ষরনি করব। আপনাকে কথা বলতে হবে না—শুধু শোনা থাকবেন। আমি কোথাও কিছু ছুলা বললে শ্বরে গোপন শব্দ।

—ভাতে কার কি লাভ?

—আপনার লাভ আর্থিক, আর আমার লাভ এভাবে ছুলা-ছুটিগুলি শ্বরে নেব। বারে বারে দেখে ও কল ছবিগুলি মনে পড়া হয়ে যাবে।

রাজী হলেন শেষ পর্বন্ত। ইস্‌মাইল সাহেবের সাক্ষরনি করে আমিও কম লাভবান হইনি।

যাক সে কথা। সে কথা কলিহিলাম। ষোড়শ গৃহা-মন্দিরের প্রবেশপথে এই বৃদ্ধ নভজান্দু হস্তিমর্জিত সোঁপারে উনি বলেন—মিউ এন-ক্লাড কখনও জুজুড়ার আসেননি; কিন্তু বোধ প্রমত্তের মধ্যে শুনে তিনি দ্ব্যধিকারের একসারি অশুর্বা গৃহা-মন্দিরের উত্তর করছেন তাঁর ভ্রম-বৃত্তান্তে। বলছেন, সেন-নর-নাগ-গন্ধর্বেরা তো কট্টেই, এমনকি ঐরাবতকুলা বৃন্দলহন্তী নভজান্দু হয়ে সেখানে ভ্রম্যন্ত বৃন্দাধিক শাসনকাল হয়ে প্রকাশ করছে।



যোড়শ গৃহ-বিহার

যোড়শ গৃহ-বিহারের স্থান ও শিলা-নির্দেশনামূল্যের অবস্থান চিত্র—৩৮-এ দেওয়া গেল। প্রথমেই একটি প্রশস্ত অলিখ, ২০ মি দীর্ঘ ও ৩ মি প্রশস্ত। সম্মুখে ছটি আটকোনা মস্তক এবং দুটি অশ্বমস্তক। অঙ্গিম্বের বামপ্রান্তে পাহাড়ের গায়ে শিলালিপি থেকে জানতে পারি, ককাতক রাজবংশের রাজা হরিজব্বের আমলে (৪৭৫-৫০০ খ্রীষ্টাব্দ) এই বিহারটি নির্মিত হয়।

অঙ্গিম্বের পর মূল বিহারের প্রান্ত-চতুর্কোণ হ্রদ-কাষায়। ২০-২ মি × ১৯.১ মি। অলিখ পার হয়ে উপরে অকালেই নজরে পড়বে ক্ষুদ্রকায় বামনের চল বীম বা কতিপয়লিক পিঠ দিয়ে ধরে রেখেছে। উপরের চাপে বেশ তাদের শ্বাস বুখ হয়ে আছে (১৬।১)।

গৃহটির পূর্ব-প্রান্তের বৃক্ষসেবের জীবনের আবির্ভাবের ঘটনামূল্য কালানুক্রমিকভাবে সাক্ষ্যদান করছে। চিত্রের অবস্থানে অনুযায়ী কান্না না করে বরং বৃক্ষসেবের জীবনের ঘটনাচক্রে অনুসারে তা বর্ণনা করা যাক। চিত্র—৩৮-এ লিখিত নির্দেশ অনুসারে পঠকের পক্ষে চিত্র-গুণে সনাক্তকরণ কঠিন হবে না।

যৌতুমবৃক্ষের লম্ব-সমন নিয়ে পিণ্ডভয়ের মধ্যে মৃতবিরোধ আছে। কেউ বলেন, তিনি খ্রীষ্টপূর্বাব্দ ৫৬০-তে লম্বগ্রহণ করেন, কেউ বলেন আরও তিন বছর আগে, অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব ৫৬৬-তে। নেপালী শাস্ত্রকারদের মতে, আরও পঞ্চাশ-ছয় বছর আগে অর্থাৎ ৬২৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। শাক্য সিংধার্থবংশে লম্বগ্রহণের পূর্বে তিনি বিভিন্ন রূপ নিয়ে নানাবিধে লালন-রক্ষা করিয়াছেন। কখনও জলপুত্র হয়ে, কখনও নাগ, কখনও হস্তী, হস্তীপুত্র হস্তীর রূপ পরিগ্রহ করেছিলেন। তাঁদের বংশগুণে চিহ্নিত করা হয় না—তারা সবাই যৌথিত। বৃক্ষসেবের অংশ-অবতার।

বৌদ্ধ শাস্ত্রমতে, শূন্যস্থান-পূরে সিংধার্থবংশে লম্বগ্রহণের পূর্বেও স্বচরন (কাগ ও মতে, চ্যাম্বার জন) বৃক্ষ-যৌথিতক নন-পূর্ব বৃক্ষরূপেই এ প্রভাবে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। অনেকের মতে, এদের মধ্যে বস্তুতঃ চাম্বার জন। ললিত-বিস্তার ও মহাবাসুযতে, যৌতুম বৃক্ষ-লীলপঙ্করের জগীনে বৃক্ষমলাভ করতে যত্নস্ব করেন। বহু লম্বগ্রহণের অতিক্রম করে অবশেষে তিনি তুর্কিত-স্বর্গে এসে শেষবারের মতো পেছাবরণের জন্য অপেক্ষা করে রইলেন।

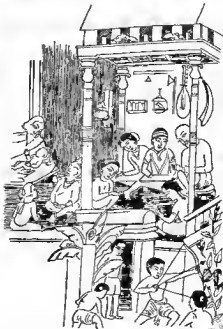
যৌতুমবৃক্ষের তুর্কিত-স্বর্গে এসে তিনি চিন্তা করতে থাকেন অজ্ঞপ্তর কোন্ ভূ-অঙ্গে জীবনলব্ধ। তিনি অবতীর্ণ হবেন। বৃক্ষসেবের জীবনীর এই অংশটুকু অবলম্বন করে আশ্চর্য কতকগুলি প্রাচীন-চিত্র আমরা প্বিতীর বিহারে ইতিপূর্বেই দেখেছি (চিত্র—২।২-ক-৫)। এখন, এই যোড়শ বিহারে প্রথম চিত্রটি (চিত্র—৩৯) দেখছি। সপোজাত সিংধার্থকে জোড়ে তুলে নিয়ে মহর্ষি অসিত তাঁকে নিরাকুল করছেন। ভবিষ্যৎবাণী করছেন, জাতক সংসারে আবদ্ধ থাকলে হবেন ঐক্যবদ্ধ রাজচক্রবর্তী, আর যদি কোনদিন মৃত্যুভয় হয় তাঁর মস্তক, অঙ্গে ওঠে পীড়িত অবতীর্ণ, তাহলে তিনি স্বর্গে অবতীর্ণ হবেন। শ্বশুর-সম্মিলিত অসিতের মৃত্যুটি অবলম্ব্য। তাঁর সে মুখে অসিত ও বিবাদের অশ্রু সর্গমন্ত্রণ। কিন্তু বিবাদ কেন? তার জবাব পাচ্ছি ইশানচন্দ্র ঘোষ মহাপুত্রের সম্মিলিত বৃক্ষসেবের জীবনীতে। যৌথ-মণ্ডি লিখেছেন, এই ভবিষ্যৎবাণী উদ্ধারণ করার পর মহর্ষি অসিতের শীর্ষ গণ্ড বেয়ে অশ্রুমালা গড়িয়ে পড়ে। বিস্মিত মহারাজ শূন্যস্থান গ্রহণ করেন—মহর্ষি আপনি রোদন করছেন কেন?

উত্তরে মহর্ষি বলেছিলেন, মহারাজ, এই সপোজাত শিশু যখন পরম সত্যের সম্মান পাবেন,



তার পূর্বেই আমি বেহরকা করব। এ'র শিখায় গ্রহণ করার সৌভাগ্য থেকে আমি বঞ্চিত হয়েছি। একলাই রেগেন করছি শাক্য-অধিপতি।

এই কথা বলে সেই সন্ন্যাসীরা শিশুর সম্মুখে মর্হা'র অসিত ভূমিষ্ট হয়ে প্রণাম করলেন। তখন মেলানি অন্যান্য কনিষ্ঠ শিশুকে প্রদীপ্যাত করলেন। তাই বেশে বিনয়সাহিত মহারাজ শূন্যোদন প্রণাম করলেন নিজ পুরুষে।\*



চিত্র—৩১ঃ শিম্বাধের দিয়া ও অন্যান্য (অবস্থান—XVI/20, 21)

শিম্বাধের জন্মের সপ্তম দিবসে তাঁর গর্ভসারিণী জননী মার্যাবেনী স্বর্গারোহণ করেন। শিশু শিম্বাধকে হান্নন করে ডোলেন মার্যাবেনীর জননী ও শূন্যোদনের অপরা মর্হিষী মহা-গৌতমী বা মহাপ্রজাপতি। এই মহাগৌতমীর একটি পুত্র ছিল। তার নাম নন্দ। শিম্বাধ অন্যান্য রাজপুত্রদের সঙ্গে একত্রে বড় হয়ে ওঠেন। বয়সময়ে তাঁদের হাতেখড়ি ও চূড়াকরণ হল। শিকলদেহ অ্যারব' বিশ্বাসিতের চতুঃপাঠীতে তাঁদের বিদ্যাভ্যাসের চিত্রটিতে (চিত্র—৩২)

\* মৌর্য শাসনকালে, মহারাজ শূন্যোদন চারবার স্বর্গে গিয়ে গৌতমকে প্রণাম করেছিলেন। যেটি ঘটনাই স্বীকৃত। সমসাময়িক আ কথা আছে। এটিই প্রমাণ।

এবার আমরা মনোনিবেশ করতে পারি। দেখছি শিশু সিম্বাধের এ-পাশে মহাযান, হাতে লেখনী, সম্মুখে ভূরূপ—এ-পাশে আরও কয়েকজন মহাযানী। তাঁরা সকলেই শাক্য রাজ-পরিবারের শিশু—রাজপুত্র; মহাযানীতমীপুত্র নন্দ, অরব, মহানাম, দেবদত্ত এবং অনুরূপ। পাঠশালায় চার-চালা ঘরটি যেন বাংলা দেশের চার-চালা। শিল্পী এ চিত্রে আরও দু'টি জিনিস এঁকেছেন, যা খুঁটিয়া দেখার অপেক্ষা রাখে। একটি শিজরারখ পক্ষী ও একটি বীণাবন্ধ। পাঠশালায় খরোজ পরিবেশে এ দু'টি খুবই প্রাসঙ্গিক; কিন্তু যেন হয়, শিল্পী এ দু'টিকে প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যেই এঁকেছেন। পাঠশালায় এ আবেশনীয়ত মূর্তিকামী সিম্বাধের অর্থ্যা কি শিজরারখ এ শিক্ষাবর্কের মতো নয়? মহাজানের মূর্ত নীলাকাশে মূর্তশক বিহঙ্গমের মতো গুপ্তে কেঁজাবার জন্য যার লক্ষ্য, পাঠশালায় এ পিরাবের ব্যাকরণ আর নানান পাঠ্যদ্রষ্টার শৃঙ্খলে কি তাঁকে বেঁচে রাখেননি প্রব্রুদশাই? আর এ বীণাবন্ধটি? নীরব বীণামলের তন্ত্রী মতো এ শিশুর অন্তর মহাবীণাকরের অঙ্গুলিস্পর্শে যন্ত্রিত হয়ে উঠবার জন্য যেন প্রহর গুণছে।

কিন্তু রাজার মেলাকে তো শব্দ বিনয়ভাষ্য করলেই চলেবে না—তাকে শিখতে হবে অশ্বারোহণ, যুদ্ধবিদ্যা। তাই ঠিক নিচের চিত্রটিতেই দেখছি শিশু সিম্বাধ তীর-খন্ডক নিয়ে পরলন্দান অভ্যাস করছেন (চিত্র—৩৯)।

ওদিকে কাঁপায়বস্তুর রাজ্যান্তরপুরে কিন্তু রাজার মনে শান্তি নেই। কিছুতেই তিনি ভুলতে পারছেন না সভাশক্তিভ্র ও মহাবি' অন্তরের ভবিষ্যৎবাণী। প্রতিজ্ঞা করছেন মনে মনে, এ ছেলে যেন কোনদিন পীতবলনারী না হয়, ওর এ কুণ্ডিত কেশভাস যেন কোনদিন মস্তকক্লুত না হয়, এ স্বাক্ষা তাঁকে করতেই হবে। সিম্বাধ' রাজপুত্রের মনে ব্যস্তোন্মত্ত। সেই হুবহু। রাজ্যশাসনের ভার আর উপযুক্ত হস্তে সমর্পণ করতে পারলে তবেই তাঁর হৃদি। তাই সেই তিনি বানশ্রম নিয়ে পরমপ্রাণ্ডির শেষ লক্ষ্যে মাত্র করতে পারবেন।

পরবর্তী চিত্রটির প্রসঙ্গে আসার পূর্বে একটি ব্যক্তিগত কথা বলতে হচ্ছে। পরবর্তী চিত্রটি কালবে সম্পূর্ণ অজস্র; আমি 'অঙ্গরূপা অঙ্গরূপ' প্রথম প্রকাশকালে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছিলাম, কোন ছবি এঁকে গিইনি। সেই প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থের একটি কপি পড়ে আমাদের জাতীয় অধ্যাপক প্রিন্সেপীতকুমার আমাকে দেখেন—এটির রেশ চিত্র এবং বিস্তারিত আলোচনা চাই। বলারহুক্য এ অবশ্য শিরোমার্গ করে আজ আমি ধন্য। বহু সন্ধান করে ১৮৯৬ সালে প্রকাশিত গ্রিফিথ-সারেবের এলেনবর্মের একটি কপি সংগ্রহ করে বর্তমান সংস্করণে এই অঙ্গুলিপিটি (চিত্র—৪০) সংযোজন করলাম (Plate No. 46, 47 and 48 of Griffith's Album, 'The Painting in the Buddhist Caves of Ajanta, London, 1896')। জাতীয় অধ্যাপক অচার্য প্রিন্সেপীতকুমার এটিকে কেন অতটা গুরুত্ব দিয়েছেন, আসুন, এবার সেটা দেখি:

চিত্রে তিনটি খণ্ড-দৃশ্য। সর্বপ্রথমে একটি মণ্ডপে রাজা শুম্বোদন এবং 'মহাযানীতমী' মণ্ডপ করছেন—কীভাবে সুব্রাহ্মণ সিম্বাধকে সঙ্গে করে আনছে বলে রাজা মুগ্ধ। রাজা-রানীকে ঘিরে আছে একজন নরনারী, কিন্তু লক্ষণীয় কেউই হু-পাশের দু'টি শব্দটির অতর্কতী অর্থে প্রবেশ করেনি; অর্থাৎ রাজা-রানীর নিবৃত্ত অশ্রুশ্রো 'বিশ্ব' শব্দটা করেনি। তারপর মন্ডপের মণ্ডপে পুনরায় একজন পুরুষ ও রমণী বাস্পতঃপ্রাণধিনরত। বিশেষভাবে কেউ কেউ বলছেন—এ চিত্র সিম্বাধ' ও মহাযানীর দাম্পত্য-জীবনের এক ষণ্ডচিত্র। তবে অর্থ—হয়তো এইটাই ঊনৈর বাস্পতঃপ্রাণধিনর একমাত্র চিত্র যা অঙ্গরূপের আঁকা হয়েছিল, অন্যতম অঙ্গরূপের আবিষ্কৃত হয়েছিল। আর তাই তার নাম।

যা বসেবস্তুর বহু আলোচ্য বহুস্থানে দেখেছি—কিন্তু কী আশ্চর্য, বস্তুর মনে পড়ছে, সেই মনোভাবনারী আলোচ্য দেখেছি মাত্র দু'টি পরিবেশ। হয় তিনি দ্বিভাষীভূত—বহুযেহের গৃহভোগ-রজনীতে, নয় তিনি রাজহুলকে নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন সেই মহাভিক্তর সম্মুখে।

সহস্রাব্দীকাল ধরে অজন্তার শিল্পীর—আর মধ্য-অজন্তা-শিল্পীকে সঙ্গে নিয়ে কী হবে— সমগ্র বৌদ্ধ ভাস্করের শিল্পদল হস্তাক্ষরগণী যশোরাজকে যেন অন্য কোন পরিবেশে কল্পনাই করতে পারেননি। সেই নির্ভর আত্মীয়-পুঞ্জিভাজির কালমুখই যেন তাঁর জীবনের একমাত্র সত্য—অথবা সেই মহাকাব্যিকের কাছে প্রত্যয়যাত্রা হলোই তাঁর একমাত্র নিষিদ্ধ। যেন এ দুটি ঘটনা ছাড়া অন্য কোন ঘটনা ঘটেনি তার জীবনে—যদিও প্রয়োজনবোধান্বিত দাম্পত্য-জীবনে তিনি হাস্যনন্দ, কাঁচনেনি, ভালবাসেননি, ব্যর্থ-বংশে বর্ণী হয়েনি। শুধুমাত্র শাস্তিসংগীত

কিন্তু বৌদ্ধশিল্পীরাই কি গোধা নিয়ে কী গায়? মহাস্থানগড়ের জীবনশিল্পীদের এই স্বাক্ষর অনিবার্য নিয়তি। স্বাধীনতাও ভুলেছেন, বিরাহণী উম্মিলার মনোবেগের কথা লিপিবদ্ধ করতে, বাগভটীর পরলেখাও হলেছিল কানো উপেক্ষিত। বিক্ষুব্ধতার মর্মবেগে নিয়ে কটকট রচিত হয়েছে ঐক্য-কাহিনী? গুরুদ্বন্দ্বকের ধর্মপত্নী, তাঁর দুই সন্তানের জননী সুলক্ষ্মী অথবা গুরু গোবিন্দের তিন পত্নী—জিহে, সুলক্ষী, কিম্বা সহযোগিনীর জাগরণ কথা কটকট করেছে শেরেছেন শিবধর্মের প্রবক্তার? সন্ত-তুলসীদাসজীব নাম এই হিন্দু-জাতির প্রতিটি প্রত্যক্ষদেশে নিজে উচ্চারিত, কিন্তু কতজন জানে তাঁর সৎধর্মপণী তারক-জননী রজনালী রূপের কথা?



বিধ-৬০ : সিদ্ধান্তের প্রস্তুতকরণ ও প্রত্যয় (অধ্যায়—XVI/2c) :

অন্যদিকে খোঁজ নিয়ে দেখেছেন, এরা কেউই স্বাধীন সাধারণ পথে বাধ্য হয়ে গাড়ানি, বেঞ্চের কুছুরাঘান স্বীকার করে লানচেল স্বাধীনকে হুকুমতী হতে সাহায্য করেছেন। বিশেষতঃ সেই সীমিতসীমার মধ্যে সর্বাঙ্গতন্ত্র-বিনতি করে উপেক্ষিত। সুদূর এলিয়-পথে অতীত নিখুঁত ব্রহ্ম শিল্পসভ্যতার মধ্যে অতি তেজসবান-স্বীকৃতি হুঁতী হুঁতী নিখুঁত হুঁতু পেরোতে। প্রথমতঃ ব্রহ্মসভ্যতার একটি চিত্র-এ : শিল্পীতী অসম্ভব এই পথে দিতে। অসম্ভব

[illegible]

(চিত্র—৪০, মহাংশ) দেখছি বুঝেছে তার নাম হাতখার্নি বাড়িরে হাশাখার চপ্পক-জপ্পলি গ্রহণ করছেন। লক্ষণীয় তার পদতলে একটি রক্তমল্লম্বা। তিনি কি তার ভাবী পরীকে অপদুরীয় পরিরে বিচ্ছেদ?

চিত্র—৪০-এর দাঁকপপ্রান্তে যে খণ্ডচিত্র ছিল তার সনাক্তকরণ বিষয়ে মতাবিরোধ আছে। কে কী বলেছেন তাই আসে লিপিবদ্ধ করি, তারপর আমরা আমাদের সিদ্ধান্তে আসব।

সোলাম ইরাজদানী বলেছেন, “বার্জেস্” এবং জট দ্বারীর হাতে এই খণ্ডচিত্রটি মহানিষ্কলণের। পালমের শারিত্রা রমণীমূর্তি বংশধরার। কিন্তু সে-সঙ্গে এখনে বুঝেছে যে মূর্তি জাঁক হল না কেন? পূর্ববর্তী প্যানেলেও বুঝেছে অনুশ্লিষ্ট। কট্টচার পূর্বোক্ত খণ্ডচিত্রটি (চিত্র—৪০, দাঁকপপ্রান্তে) ম্যারাদেবীর পর্বসম্মতের চিত্র বলে ধরে নিয়েছেন। অর্থাৎ পালমের শারিত্রা নারীমূর্তিটি ম্যারাদেবীর এবং শ্বিতীর চিত্রটি (অর্থাৎ চিত্র—৪০, মহাংশ) সে-সঙ্গে রাজা শূন্যোদনের সমস্ত শব্দ-মল্লম্বের জিহ্বা বলে ধরে নিতে হবে। আমার বিশ্বাস, বুঝেছে যে অনুশ্লিষ্ট-জনিত কারণে কট্টচারের মূর্তিই মেনে নেওয়া উচিত।”

আমি এখন ইরাজদানী ওরা ফাউচারের সঙ্গে আসে একনজ হতে পারছি না। আমার মতে তাঁদের পূর্বসূরী বার্জেস্ এবং জট-দ্বারীই ঠিকমত সনাক্তকরণ করতে পেরেছিলেন। আমার সিদ্ধান্তে নিম্নোক্ত মতিনিষ্ঠার:

- (i) প্রথমতঃ সর্ববাসমের ল্পটিকে রাজা শূন্যোদন ও মহাপোতমী বলে সকলেই মেনে নিয়েছেন; কাজে ঠিক তার পরের প্যানেলেই পুনরায় কেন একই দৃশ্য আঁকবেন শিল্পী?
- (ii) মাঝের প্যানেলে দেখছি নায়ক নায়িকার কল্পদলি গ্রহণ করছেন, তাঁদের ভাঙ্গিয়া অনুরাগধন-প্রোঁট রাজা শূন্যোদন ও মহাপোতমীকে ঐ জাতীয় শ্রেমিক-শ্রেমিকা রূপে কল্পনা করতে বাধ্য।
- (iii) বামের প্যানেলে বুঝেছে মূর্তির অনুশ্লিষ্টই তো স্বভাবিক; কাজে বার্জেসের হাতে-ঐ চিত্রে রাজাদানী বুঝেছে অনুশ্লিষ্টভাবে পঙ্কমর্শ করছেন, কী-ভাবে বুঝেছে সংসারে অবস্থা রাখা যায়।
- (iv) আমি বুঝতে পারিনি-কেন ইরাজদানী বলেছেন শেষ প্যানেলে বুঝেছে অনুশ্লিষ্ট। তারই নিম্নেই ফটো এলাবাসে ফোট LHM, তৃতীয় খণ্ড বুঝেছে যে জো দেখা যাচ্ছে! বার্জেস্-এর এলাবাসে, যেটি আরও হাট-সত্তর বসের পূর্বে জাঁক-বুঝেছে যে জাঁক অনুশ্লিষ্ট-রূপে দেখা যায়।
- (v) আমার সংজ্ঞায় বড় মূর্তি ঐ-চিত্রে আলোকসম্পাতের জটুর্বা এবং কয়েকটি মূর্তিচিত্রটি প্রা। শিল্পী সে-ওয়েল-প্রদর্শিত একটি একতরঙ্গা এঁকেছেন। একতরঙ্গা রাজপ্রাসাদে প্রাসাদিক বান্ধক নর, কং উদাসীন ঠামাদান ভিক্টোর সোডক। এ-রাজ্য দেখছি একটি মূর্তিদানী-বুস আত্মজ্ঞানের প্রতীক, সে নিজেই লক্ষ্য করে জপ্পক-বুঝেছে জিহ্বা। তৃতীয়তঃ পালমের নিচে দেখছি একটি নির্দলিষ্ট-দীর্ঘায়িত। সম্ভবতঃ সেটি মল্লম্বাধীনী মল্লম্বার ঠামাদেশবর্বাধ্যাণী বিদ্যুৎ-জীবনের অবদান যোগ্য করছে। মহানিষ্কলণ দৃশ্য বলেই চিত্রটি তলোক্ত; মহা-আবির্ভাব-দৃশ্য শব্দই আলোকসম্পাত নিজেতে অজস্র আনন্দ।

কাল্যাকল্পতে সে-দৃশ্যে মহা-আত্মসত্তার হলকরণ উৎসব হ'ত। পরবর্তী চিত্রে দেখছি, তদুপে সিদ্ধার্থকে দেখানে নিয়ে আসা হয়েছে। উৎসব-রঞ্জন নরমহীর মিছিল, তার মাঝখানে সুখসুখে বলিবর্ষারের প্রেমে কণা চিন্তা করে দেখছি নিম্ন হতে পায়েছেন রাজপুত্র।

প্রসঙ্গতঃ বলি, এখনে একটি আলোকিত ঘটনার আভিভূত হয়ে মহাপাল শূন্যোদন শ্বিতীর প্রথম করেন সোঁতমল্লক। মহারাজ লক্ষ্য করেন, উৎসবের আসর থেকে সরে গিয়ে বালক সিদ্ধার্থ একটি বৃক্ষছায়ার খানমণ্ডন হয়ে বলে আসেন, আরও বিশ্ময়ের কথা, সমস্ত

দিনে বৃক্ষের ছায়া একটুও সরলো না। ধ্যানসিঁড়িমিত গৌতমকে আতপতপ থেকে রক্ষা করতে বৃক্ষ তার ছায়াকে সমস্ত দিন অপসারিত হতে দিল না। এই অশ্রুত দৃশ্য দেখে বিম্বসাবিষ্ট শূন্যোদয়ন পুরুষে সান্ত্বনা প্রদান করেছিলেন, জীবনে স্থিতিরব্যব।

বৃক্ষদেবের জীবনীতে এর পরের ঘটনা হচ্ছে, মথুর-ভ্রমণে বেরিয়ে ব্যাধি-কণা-মুক্ত ও সন্ন্যাসী দশন। তখনই তিনি উপলব্ধি করলেন, সন্ন্যাসের পথেই শান্তি পাওয়া সম্ভব। তিনি মনশিব করলেন, অচিরেই পরমসুখপ্রাপ্ত করতে হলে তাঁকে।

অকস্মেৎ জাগতিক দৃশ্য-বস্তুটির হাত থেকে পরিচালনের কথা ভাবলেন তিনি—এখন তিনি উনর্নিবেশ অবস্থার পূর্ণ ব্য়াপ্তকর। যৌবনের সেই অত্যন্ত শিবরচয়িত রাজভোগ থেকে অবসোহণ করে সন্ন্যাস নেবেন স্থির করলেন। প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করে সংরাম পেয়েলেন রাজকন্য যশোদারা একটি পুত্রসন্তান লাভ করেছেন। প্রাসাদে সৈনিক জনসেনার শব্দ। রাজশূদ্রকে বলে বলে পুরবাসীরা অভিনন্দন জানাতে থাকে; কিন্তু সিংহাসনের মনে তখন অন্য চিন্তা। তিনি ভাবলেন, পুত্র হয়েছে তাঁর, সন্ন্যাসের বন্ধন কাড়ছে। আর বিলম্ব করা উচিত নয়। স্থির করলেন, সেই রাতেই গোপনে গৃহত্যাগ করলেন।

উত্তরাধার্য নাকরে আঘাটী পূর্ণিমার পূর্বে তিথি পৌঁট। গভীর রাতে নিজ শয়নকক্ষ থেকে বার হয়ে এলেন তরুণ সিংহার্ঘ্য। দেখেন উল্লস-ভ্রমন্ত নর্তকীর দল যে যেখানে স্থান পেয়েছে—নিদ্রামগ্ন। মহারাজের মহলে সেমে এসেছে মৃষ্টির অশ্রুতর। ঘন মেঘলালে পূর্ণচন্দ্র অবলুপ্ত। ধীরে ধীরে সিংহার্ঘ্য এগিয়ে এলেন অশোভার্যার স্তম্ভিতমুখে। পুরে রাজকন্য একবার চোখের দেখা দেখে রাখেন। স্থায়ী নিদ্রাভিভূত—প্রমথো প্রবেশ করলেন সিংহার্ঘ্য। দেখলেন—মুই আর পশ্চাত্তালে জাকর্ষী পালঙ্কে ভ্রান্তিতে নিদ্রামগ্ন যশোদারকে। ঘরে জ্বলছে নির্বিশেষমুখ একটি রত্নমণি। তারই কাঁপ আলোয় দেখলেন, যশোদারা পশ্চাত্তোরককৃত্য একটি হাত রেখেছেন সন্ন্যাসজাত শিশুর মস্তকে। পুরুষে কোলে তুলে নেওয়ার দুরন্ত প্রয়োজনকে বহন করলেন সিংহার্ঘ্য—ভ্রান্তে নিদ্রাভ্রম হতে পারে রাজকন্য। নিশ্চলকরণ বর ছেড়ে পেরিয়ে এলেন রাজশূদ্র। আকাশে বিদ্যুৎ চমকে ওঠে একবার।

এই অনবদ্য বিষয়-বস্তুটিকে উপেক্ষা করেননি শিল্পী। সে কথা আগেই বলেছি (৪৮—৪০)।

পরবর্তী প্রাচীর-চিত্রের বিবরণে উল্লিখিত গ্রামে। কিন্তু কতবর্তী কালের ইতিহাসটুকু আলোচনা করে নিয়ে সে দৃশ্য উপনীত হব আমরা।

সেই নির্মূর আঘাটী পূর্ণিমার সন্ধ্যাজাত শিশুশূদ্র ও তার মনভাগিনী জননীকে জাগ করে সিংহার্ঘ্য বেরিয়ে এলেন প্রাসাদ থেকে। পথেরে নর-সাক্ষী চম ভাঁকে তাঁর প্রিয় রত্ন করেই পৌঁছে দিল রাবাসীরাতে। জ্বলন নবীর তীরে এসে তিনি রত্ন গায়তে করলেন। বিস্ময়কর অনুর সাংগী চম এতক্ষণ কোন প্রশ্ন করেনি, এখনও কোন প্রশ্ন করোনা না। গতিব্যয় সম্প্রদায় করলে ধরে। সেমে এলেন রাজশূদ্র—স্নেহে বাড়ে হেঁকে ওঠে কালেন তাঁর মহাবাসনার কথা। এইখানে, এই মুহূর্তে, নগরপ্রান্তে এই শিশু-কন্যে তাঁর প্রত্যা গ্রহণ করলেন। স্তম্ভিত হয়ে গেল চম। একে একে রাজ-পরিচার্য মূলে ফেললেন সিংহার্ঘ্য; মণিময় মূর্তি, কণ্ঠস্বর, মণিকল, কেরুর। তুলে দিলেন চমের হাতে। তারবার নিশ্কাশিত করে স্বহস্তে কর্তৃত করলেন রাজশূদ্রের দীর্ঘ দনুভিত কেশদাম। শীতবসনে আবৃত করলেন দেবদুল্লভ কান্দি।

চোখের জলে ভেসে গেল চম, কালো—ভগবৎ, কাল প্রান্তে মহারাজ বহন করলেন, কেন তুমি তাকে খেতে দিলে?

সিংহার্ঘ্য বললেন—কালবে, তুমি আজ্ঞাবহয়ত, তোমাকে আমি আদেশ করেছিলাম এই বিদ্বান অরুণ আমাকে পরিচাল্য করে নগরে প্রত্যাবর্তন করতে।

মুটি হাত কোড় করে চম বলে—আর কি কোনদিন দেখা হবে না প্রভু?





করেছিলেন মাভলের অগ্রসরে শবরী, প্রীরামস্কেন্ডের প্রতীক্ষার তাঁর ফল-ফলের খালাসানি শাঙ্কিরে।

অনাহারক্লিষ্ট সময়সী অরশেবে একাধিন অনুযায়ন করলেন শরীরকে অহৈতুক পীড়ন করলে কেন লাভ হয় না। মাত্ৰাতিরিক্ত অছোরে বা মিত্রর বেমন ইন্দ্রির অশ্ব হতে বার মাত্ৰাতিরিক্ত নিপীড়নেও ভেদানি দুর্বল এক অশ্ব হতে বার শবরী। অগাডিক কয়েন-বাসনার হাত থেকে মনকে মুক্ত করতে হলে এ দুটি চরম পথ পরিভাষ্য করে পরিমিতর পথে অভ্যস্ত করতে হবে দেখকে। তিনি স্থির করলেন, খেদ-পীড়নের উপসায় ত্যাগ করবেন এবার। কিন্তু হার, এ সিদ্ধান্ত যখন নিলেন সিদ্ধার্থ, ততালিনে তাঁর দেহ এতদূর অশ্ব হতে পড়েছে যে, আসন ত্যাগ করে আবহাৰের কাছে পৰ্বন্ত তিনি এগিরে যেতে পারেন না। সিদ্ধার্থ অনুভব করেন, ভুলের প্রারম্ভিত করতে হবে তাকে, সাধনার সিদ্ধিতে তাঁর পলাট-লিখন নয়। মৃত্যুক চক্রে সম্মুখে দেখলেন তিনি। অনাহারক্লিষ্ট তাঁর দেহ লুটিরে পড়ল ভূমিসাগরে।

ভারতবর্ষের ইতিহাস, সংস্কৃতি, ভর ধর্ম, ভর মর্মবাণী একটি অখ্যাত গোপালার কাছে একান্তভাবে কণী, সে এ সূজাত। সে লক্ষ করে, তৎবে ত্যাপের অনাহার-মৃত্যুর উপলব্ধ। সূজাত হুটে চলে বার নিজ হুটিরে। প্রধান করে গোপালার প্রেই কৃক-বেদুর মৃত্যু প্রস্তুত পারলেন। পারস হো নয়, অমৃত। সে অমৃতের অমিত প্রভাবেই পৃথিবী একাধিন শবনেত পেয়েছিল সেই মৃত্যুঞ্জয়ী বাণী: অহিষো পরমোর্থঃ।

চিরে সের্ণাধ (16/2r), লিখিত গৃহকোণে মৃগ্যায় পারলেন প্রস্তুত করছে গোপকনার সূজাত। বাহির-শবরে বিপ্রাকরত তার চারটি ফেদ।

শলকর বহুবার অলসেদন, নিলের হাতে দুটি রেখে লামনে বসিরে পুত্ৰসমানদকে খণ্ডা-বার সূযোগ গেলে করতীর মেয়রা আর কিছু চার না। আহার মনে হয়, তার কারণ এ সূজাতের আর শবরীর হার আসের ধননীতে প্রবাহিত হয় বলেই।

পরের প্যালেসক্লিষ্টে বৈশাধ, সময়সীরা পদপ্রান্তে সূজাতা\* পারলেনের জাণ্ডটি নামিয়ে রাখছে। দুই হাতে অর্ধসামের ভাঁপতে সে ধরেছে অমৃতজাত, নতলানু ভাঁপ তায়।

পারলেন আহার করে সূক্ষ্মবেধ করলেন সিদ্ধার্থ। সম্পূর্ণ নুতন পথে সাধনা শুরু করলেন এবার। দেখকে নিপীড়ন করা বন্ধ করলেন, ও বিকরে পরিমিত অহোর-মিত্রকে তিনি বরণ করলেন অগ্রসর। এই সময়েই সিদ্ধার্থের পরিজন অনুভব তাকে ত্যাগ করে কথিতনা অকিমুখে প্রস্থান করেন। সিদ্ধার্থকে কঠোর উপলক্ষ্যের পথ ত্যাগ করতে দেখে তাঁর চেতনোছলেন, তিনি এতালিনে হলেন স্নাত, হতভূত।

আতে হুকেপও করলেন না সিদ্ধার্থ। ধানের জগতে তিনি অভিতুত হয়ে রইলেন চরম সত্যের সম্মানে। মৃশকল্যাত করার পথে যখন অশ্ব মাত বাকি, তখন এলা সটেনা মার। কিন্তু পরানিত হলে সে। প্রথম দুইবার চিত-১১ বর্শা-কালে সে-বাহিনী কিস্তিরিত-অলোচনা করেছি।

সেই রাতেই সিদ্ধার্থ পরমজ্ঞান লাভ করলেন। সিদ্ধার্থ ক্লিষ্টের হলেন পরমমুখ। সেটিও ছিল বৈশাধী পৃথিবীর ক্লিষ্ট-গুহু পৃথিবী। মৃশকল্যাত করে শাকতিসিহে অনুভব করলেন চার প্রকার আর্গসজ্ঞা এক ধর্শন করলেন পরমপ্রসিদ্ধ অক্টমুখী পথ। তিনি অনুভব করলেন-অজ্ঞতা থেকে জ্ঞান্যাত করে কামনা, কামনা থেকে দেহজ দুঃখ-কষ্ট-জন্ম-মৃত্যু-জরা-মৃত্যু; তিনি প্রলিখন করলেন জাগতিক বত দুঃখ-মৃশশর মূল হল অজ্ঞতা এবং কামনা। ঋষি এই মূল দুটিকে উপসাদিন কর্তা বাক, তবেই হতে পারে পরমমুখি-নির্বাণ।

\* জন্মযোজের মত মনসে এটি সূজাতের আলো নয়, পৃথিবীকৃতীর চিত; কাল-বৈশাধী পৃথিবীর পবনকলতে পৃথিবীকৃতী বাণী হতে সূজাতা কৃক সূক্ষ্মপথে প্রেরিত পারলেন ভগবৎ।

† বর্তমান কলীর নিবট।

সিদ্ধার্থ এই পরমজ্ঞান লাভ করায়, বৃদ্ধ হওয়ার, অন্ধার ঘিরে এল মার। বললে—তুমি তো মহাপরিনির্বাণের পথের সন্ধান পেয়েছ, তবে আর অহেতুক বিলম্ব করছ কেন—মৃত হও এ জাগতিক বন্ধন থেকে।

হেসে বৃদ্ধের বলালেন—তোমার অসং উপদেশ বৃদ্ধকে পেরেছি আমি : কিন্তু তোমার ইচ্ছা পূরণ হবে না। বর্তমান না এ সম্বন্ধের নিকট প্রচুরের সন্ধানোন্ধান করতে পারছি, বর্তমান না এ মরণগতে মৃত্যির বাণী প্রচারের আয়োজন হচ্ছে, ততদিন আশ্রিত মৃত্যির সন্ধান আমি নির্বাণ লাভ কব না।

শেষ প্রাণে বিফল হয়ে গেল মার।

পরমপ্রাপ্তির পরে বৃদ্ধসেব এক সপ্তাহব্যয় সেই ধোঁবদুন্দের তলাতেই অবস্থান করলেন—শিবতীর সপ্তাহে তিনি বিদ্রাম নিলেম পার্শ্ববর্তী একটি নদীরে বৃদ্ধতলে। তৃতীয় সপ্তাহে যখন মৃত্যুনিম্ন বৃদ্ধতলে তিনি অবস্থান করতেন, তখনও তাঁর সেই দুর্ভাগ্য, তখন আবার জুড়ে নামল দ্বীপ আর দ্বীপ। তখন নামলো মৃত্যুনিম্ন অঙ্গন ফল বিনষ্টার করে রক্ষা করলেন বৃদ্ধসেবকে। লুন উৎকলী বধিক এই সময় সেখান গিরে তাঁদের বাসিন্দা-সম্প্রদায় নিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁরা সেখানকার শ্রমজেন, পথপার্শ্বে একজন মহামানব অনন্তে আছেন। তাঁর দুজনে অল্প-কিছু অসংবদ্য করেই সেখতে সেলেন ধানসম্ব বৃদ্ধসেবকে। পরম প্রত্যাহারের মতক ও পরমজ্ঞের অর্থালান কলসেন তাঁরা ঐ মহাসম্মানীকে। এই উৎকলী বধিকম্বর হলেন প্রসূনা ও ভল্লিক।

পরের প্যানেলটি এই বিষয়-বস্তু নিয়েই আঁকা (16/20)।

বৃদ্ধসেব তখন চিন্তা করতে থাকেন—কোথায় গিয়ে, কার কাছে উপস্থিত হয়ে সম্বন্ধের প্রথম প্রস্তাব করবেন তিনি। প্রথমেই তাঁর মনে উদয় হল, রাজদ্বারবাসী সন্ন্যাসী আত্মার কালম ও উৎকলের কথা : কিন্তু ধানযেহে তিনি উপলব্ধি করেন ইতিমধ্যেই তাঁর লুন মেহরকা করেছে। ফলে, বৃদ্ধসেবের শিরে করলেন, প্রাপ্তপথেই পরিবর্তে তিনি করেন কল্মহিত—কোথায় ছিলেন তাঁর সেই পটভূমি মলভ্যাবী অমৃতের। বৃদ্ধসেব অতঃপর অতঃপর হলেন কল্মী অভিমুখে। তাঁর সেই পটভূমি অমৃতের সেখতে গেরে কলসেন বৃদ্ধের গৌতম, আমর জালি করিন উপলব্ধী করেও তুমি পরমসত্তার সন্ধান পড়েনি—শেষ পর্যন্ত তুমি ভাগ্য করেছিলে দেহ-নিপীড়নের পথ। এখন তুমি কী উপেক্ষা আমানের কাছে এসেছ?

বৃদ্ধসেব প্রত্যাহার বলালেন—আমি পরমপ্রাপ্তি লাভ করেছি, আমি আর ত্যাগত বৃদ্ধ। তোমার আমরক আর পল্লু গৌতম বলে সন্ধানন করে না, এতে আমার কোন ক্ষতি নেই—কিন্তু তোমারই অধ্যাপিত হবে। আমি যে সত্য অনুমান করেছি তা তোমাদের কাছে বিবৃত করতেই এসেছি, অধ্যয়ন কর এবং এই জগৎ-প্রপত্তের দ্বাবতীর লুপ্ত-লুপ্তিয়ার হাত থেকে মৃত্যু-পথের সন্ধান জেনে নাও।

তিনি সেই সারনাথ মৃগদবেই প্রথম উদ্যোগ করলেন তাঁর সম্বন্ধের মূল দ্বীপ। অতঃপর হল সর্বপ্রথম সেই মহাপরিচয়। তিনি কলসেন—

: মৃত্যু চরম পদই পরিচায়ক। কী সেই চরম পদ? প্রথমতঃ, ইন্দ্রিয়ক স্মৃতি-সন্ধান, শিবতীরক ইন্দ্রিয়-নিপীড়ন। তোমাদের অবস্থান, ভূগতে হবে মহাপথ। কী সেই মহাপথ? সে হল জ্ঞানের পথ। অষ্টাঙ্গিক সত্তারার্থ! কী সেই অষ্টাঙ্গীক সত্তারার্থ? সম্মা-বিন্দি (সত্তা-বিন্দি), সম্মা-সম্বলপ্পা (সত্তা-সম্বলপ্প), সম্মা-ন্যা (সত্তা-ন্যা), সম্মা-কল্লো (সৎ-কল্ম), সম্মা-অজীবা (সৎ-অজীবা), সম্মা-ন্যায়ো (সৎ-উদ্যোগ), সম্মা-বতি (সৎ-চিত্তা বা সৎ-বৃত্তি) এক সম্মা-সম্মি (সৎ-মান)।

• তাঁর পটভূমি চরমে এই বিষয়-বস্তু নিয়ে একটি দৃশ্য জাম্ববতীর নিদর্শন করে।

: হে পণ্ড সন্ন্যাসী, বন্দন-বৃত্ত কী? অবধান কর :- কন্স-বাণি-করা-মৃত্যুই বন্দন।  
অগ্নিরে সন্তান মিলন হৃদয়ের, প্রিয়-বিরহ প্রকৃত হৃদয়ের, পরমলভ্যাস্তে বসিত হওয়া  
ইহম হৃদয়ের।

: হে পণ্ড সন্ন্যাসী, এই বন্দন-বৃত্তের মূল কারণ কী? অবধান কর :- কামন-বাসনাই  
এ বৃত্তের মূল, এ বন্দনের বিনিয়াদ। ইন্দ্রিয়ের বৃত্তের কামনা, আত্ম-কৃষ্টির বাসনা,  
অহং-বোধ-সম্পৃক্ত হলের অভ্যাসই এই বন্দন-বৃত্তের মূল।

: হে পণ্ড সন্ন্যাসী, এই বন্দন-বৃত্তের মূলোৎপাটনের উপায় কী? অবধান কর :- কামন-  
বাসনাকে নিরপেক্ষ পরিভাষা করাই এ মূলোৎপাটনের উপায়। পূর্বের অতীত-  
সংসারার্থে এ মূলোৎপাটন সম্ভব।

এই হল তথ্যগত বৃত্তের প্রথম বাণী। সারনাথ যখনবে এই ধর্মোপদেশই স্বর্ভট  
অনুশীলনের সূচনা করল। প্রথমদায় তিন্দু বোমস বৃত্তদেবেষ চরণে প্রাণিগত করে কলেন—  
প্রভু, আমি উপাসিত করছি, আপনাই প্রকৃত বৃত্ত। আমাকে পরজ্ঞান দান করুন, প্রভু।

তিনিই হলেন বৃত্তদেবের প্রথম শিষ্য। অল্প পরে অপর চারজনও তাঁর শিষ্য গ্রহণ  
করেন। সারনাথের আরও কয়েকজন মূদুক, এ সময়ে তাঁর শিষ্য গ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে  
কাশীর বনিকপ্রভু বন্যবোধের নাম উল্লেখযোগ্য। যশের জননী এবং স্বামীও এই সময়ে গ্রহণ  
করেন। কাশী থেকে বৃত্তদেব পুনরায় উদ্ভবিত প্রায়ে দ্বিগুণ আসেন। সেখানে উদ্ভবিতকালোপ  
এবং গয়াকালোপের দীক্ষা নেন। এতদিনে বৃত্তদেবের পশ্চিমতের উপর শিষ্য হয়েছে। এবার  
তিনি শিষ্য রাজগৃহে আসেন।

সর্বোদ গেরে বিবিসর নবরপ্রান্তে এসে শিষ্য বৃত্তদেবকে অভ্যর্থনা করেন। রাজা  
তাঁকে সশাৰ্দ্ধ, রাজপুত্রের অবস্থানের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। কিন্তু অসম্মত হলেন  
বৃত্তদেব, বললেন—তিনি তিন্দু উপরে অকালতলেই তাঁর আসাস। তখন মহারাজ নিম্নসার  
রাজগৃহ-প্রবেশপথে একটি মনোরম উদ্যানে তাঁর নিভ্রামের আয়োজন করেন। বেন্দুদে নামে এ  
উদ্যানটি রাজগৃহের আশেই দেখতে পাওয়া যায়।

যেদশ হুয়ার যে চিত্রাবনী আমরা দেখছি, তার পরবর্তী প্যানেলটি এই বিষয়-বস্তু  
অবলম্বনে রচিত। পূর্ব-চিত্রের নীচেই প্যানেলে দেখছি প্রস্তরাসনে আসীন (চিত্রটি প্রায়  
নষ্ট হয়ে এসেছে)। সম্মুখে লোড়হস্তে মহারাজ বিম্বিসার—তিনি আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন  
বৃত্তদেবকে, প্রাসাদে অতিথি হওয়ার জন্য। কিন্তু বৃত্তদেব সম্মত হলেন না। তাই দেখছি  
(16/2m) বৃত্তদেব জোরশমীর অভিজ্ঞান করে তিন্দুকে বের করেছেন। পাশেই বাঁধা রয়েছে রাজা  
বিম্বিসারের শেওবর্ষের অবস্থিতি।

এটিকের প্রাচীরে চিত্র-কাহিনীর এখানেই শেষ। মণ্ডপের অপর প্রান্তে নব্বের দীক্ষা ও  
মরণহত্য রাজকুমারীর অপর চিত্রাবনী। কিন্তু সে প্রসঙ্গে আসার আগে আমরা বৃত্তদেবের  
জীবনীর পথ করে আরও কিছুটা এগিয়ে যাব।

বৃত্তদেবের বেদুনে অবস্থানকালে সন্ন্যাসী সমাজের দুই শিষ্য রাজগৃহে এসে বৃত্তদেবের  
শরণ নিয়োজন। তাঁরা হচ্ছেন সারিপুত্র ও মৌধ্যগয়ান। এরা দুজনেই আবাস্য বন্দু এবং  
হরিহরব্রা। পরবর্তী কালে এরা দুজন বৃত্তদেবের প্রভাবভিত্তি শিষ্য বলে স্বীকৃত হন এবং  
এঁদের পূজ্যস্থিতি অবিস্কৃত হয়েছে সীতার তিন নং শতাব্দীর ভিতর থেকে।

রাজগৃহে তথ্যগত প্রায় দুই মাসকাল অবস্থান করেন। কাশীলাবস্তুর রাজা বৃত্তদেবের  
কাছে এই সময় লোভে পেঁচাল যে, তাঁর গৃহভাগ্যী পুত্র বৃত্তদেব দায় করেছেন এবং রাজগৃহে

\* বৃত্তদেব, যে প্রকৃতিই অবলম্বন—একটি কালোপদেই দুই প্রায় অশীকার করে বৃত্তদেব তাঁর  
অসৌন্দর্য্য কামনা প্রকাশিত করতে ব্যস্ত হয়। তিনি নৈকজনা নবীর জলের উপর দিগে পায়ে হেঁটে নবী পাঠ  
হন। সীতার পূর্ব রোডে এই ঘটনাটি অবলম্বনে একটি অপর ভাস্কর্য্যও আছে।

† এই ব্যাকরণের নামই বৃত্তদেবের নামের মধ্যে বৃত্ত হার উদ্ভবিত প্রায়ে করে বৃত্ত-পত্র।

অবস্থান করছেন। পুত্রবর্শনে ইচ্ছুক রাজা শুম্ভোদন একজন অমাত্যকে পাঠালেন পুত্রকে অন্বেষণ জানাতে, কিন্তু সেই অমাত্য রাজপুত্রে এসে বৃদ্ধসেবকে ধর্মান্নিহা তঁার কর্তব্য বিস্মৃত হলেন এবং বৌদ্ধ ধর্মে শীক্ষা নিয়ে সেখানেই বাস করতে থাকেন। শুম্ভোদন এর পর ক্রমাগতই ন্যূনতম অমাত্যকে পর পর প্রেরণ করেন এবং সবসেই রাজপুত্রে এসে রাজকর্তৃক বিস্মৃত হয়ে বৌদ্ধ হয়ে যান। শেষ পর্যন্ত তিনি একজন অত্যন্ত বিবশত রাজানুচর কাশ্মীরীকে প্রেরণ করলেন ঐ একই উদ্দেশ্যে। এবার সন্ধ্যাে সেলেন বৃদ্ধসেব। আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন তিনি। সপার্বন্ত বৃদ্ধসেব অগ্রসর হতে থাকেন কপিলাবস্তুর উদ্দেশ্যে। বিবশত শাকা-অমাত্য কাশ্মীরী দ্রুতগতি অশ্বে পুর্বেই সে সন্ধ্যা নিয়ে উপস্থিত হলেন কপিলাবস্তুরে। সুসজ্জিত করা হল কপিলাবস্তুর রাজপ্রাসাদসন্নিকটস্থ নগ্নোদ্যানে বিহার। মহাপুত্রসেব অগমন-সন্ধ্যাে প্রাপ্তিমাত্র রাজা শুম্ভোদন শাকা-অমাত্যের সঙ্গে নিয়ে অগ্রসর হলেন নগ্নোদ্যানের বিহারের অভিমুখে। কিন্তু একটি প্রশ্ন মাগল তঁার মনে। সম্যাসী-বর্শনে মাগেল তিনি। ভারতীয় সমাজব্যবস্থার সম্যাসীর শ্মশন নৃপতির উদ্দেশ্যে। রাজাই সম্যাসীকে প্রণাম করে থাকেন—প্রথা তাই বলে। সামাজিক অনুশাসনের তাই নির্দেশ। কিন্তু এক্ষেত্রে সম্যাসী যে তঁার প্রাণ্যপেক্ষা গির পুত্র—সেই নিশ্চয়, সেই পৌত্ৰ—থাকে বৃদ্ধসেব-পিত্রে করে মান্দ্য করেছেন তিনি। এ-কথা রাজা শুম্ভোদন কেমন করে ভুলে যাবেন? তাহলে? ধর্ম অঙ্গনের পর পুত্র পিতাকে প্রণাম করবে, না নৃপতি প্রণাম জানকেন মহাসম্যাসীকে? উৎকীর্ণত মহারাজ প্রশ্নটি নিবেদন করলেন মহামন্ত্রীকে; কিন্তু পণ্ডিতপ্রবর মহামন্ত্রী-ও এ সমস্যার কোন সন্তোষজনক উত্তর বৃদ্ধে দিলেন না। একটি অলৌকিক ঘটনায় এ সমস্যার সমাধান হয়ে গেল আপনা থেকেই। শুম্ভোদন লক্ষ করে দেখেন, তঁার সঙ্গে মিলিত হবার উদ্দেশ্যে বৃদ্ধসেব অগ্রসর হয়ে আসছেন ভূমি স্পর্শ না করেই। বালু-ভাঙিত মেঘের মত শুনো ভেসে আসছেন তিনি। স্তম্ভিত মহারাজ দ্রুতগতিে পড়লেন সম্যাসীর চক্রেমুখে।\*

স্তুতিপদকাল বৃদ্ধসেব অবস্থান করছিলেন নগ্নোদ্যানে। তঁার প্রতিদিনের ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ উল্লিখিত আছে বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থে। সে একটি অপরূপ নাটক। মহারাজ শুম্ভোদনের জ্যেষ্ঠপুত্র জরালে সম্মান নিয়েছেন। কিন্তু তিনি কর্ত্তর নৃপতি। অহঙ্কালে শাসন্যর ব্যবস্থা তঁার জ্ঞান নয়। তাই এই শোভাবহ বৃদ্ধটিকে শ্রদ্ধার করে নিয়েছিলেন তিনি। এতদিনে শাস্ত করতে পেরেছেন ছন্দকে। শ্মির করছিলেন, শিম্বাধের জন্মে মহাগৌতমী-তনয় কুমার নন্দকে কপিলাবস্তুর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করবেন। রাজাজ্ঞার আর তিনি বইতে পারছেন না—এবার অবসর নেছেন। পজ্ঞাশোধ বসে হয়েছে তঁার—এবার বনপ্রস্থ গ্রহণ করবেন। এসম্মখে জ্যেষ্ঠপুত্রের সঙ্গে পরামর্শ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এসব পার্শ্ব প্রসঙ্গে সন্ধ্যারতাপী সম্যাসী কোন মতামত প্রকাশ করেননি। শুম্ভোদন তখন ঘোষণা করলেন, জ্যেষ্ঠপুত্রের কপিলাবস্তুর-অবস্থানকালের মধ্যেই তিনি নন্দকে ঘোষণা করে অধিষ্ঠিত করবেন। রাজা জানতেন, কপিলাবস্তুর জনপদের সুশ্রবীত্রেয় জনপদ-কলাশ্রীরা সঙ্গে নলের সোপান প্রণয়ের কথা। তাই তিনি আরও ঘোষণা করলেন—অভিষেকের শুভদিনেই এই দ্রুতি মিলন-ভূমিত তদ্রূপ-তদ্রূপীক পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ করে দেবেন।

দ্রুতগামী ছোবকের মাধ্যমে এ আনন্দবার্তা বর্ষায়মে মৌসুমী মেঘের মত ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত রাজ্যে। লগ্নে লগ্নে প্রজাবল আসতে থাকে কপিলাবস্তুর অভিমুখে। রাজ্যেশে নগ্নটিকে সজায়ে হল উলব-সাজে। গৃহে গৃহে উজ্জ্বল নিশান, পথে পথে নির্বিত হল পুষ্প-ভোজ, \* সটির উত্তর ভোজের পশ্চিম দিকস্থ শ্রব্ধের সর্বনিম্ন ভাগের স্তুতি। এই কাহিনীটি সেখানে রচিত-কালে খোদাই করা আছে। এই নিয়ে তিনবার শুম্ভোদন প্রণাম করলেন বৃদ্ধসেবকে।

† জনপদ-কলাশ্রী—পালি ভাষায় এই নামের অন্তর্গত চারজন জনপতির উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রথমজন কলাশ্রয় নামধার, দ্বিতীয়জন নন্দর প্রতিনি, তৃতীয়জন বালেশ্বর জননী অর্থাৎ শিম্বাধের পিতৃব্য-কন্যা এবং একজন বারবীনতা (চৈনপত্র-জরক)। সন্দেহও অবশ্য-কলাশ্রী কোন নাম নয়, হৃৎকর্ণনামক উপাধিহীন।

দীপাবলীরে সজ্জিত হুল জনপদ। নূর গ্রামপ্রান্তের উৎসব-বিনাসী প্রকার ভীড়ে জনকীর<sup>\*</sup> হয়ে গেল রাজধানী। রাজা শূন্যস্থান বুৎখণ্ডকে অনুরোধ করলেন, এ কাণ্ডিন তিনি স্নান-প্রাসাদেই অধিষ্ঠিত হন। সম্মত হলেন না বুৎখণ্ডেব। বললেন—তিনি সম্যাসী, প্রাসাদে তাঁর স্থান হবে না। তবে আনন্দেন, পরদিন ভিক্ষার্থে তিনি নমর-ভ্রমণে যাবেন এবং রাজপ্রাসাদেও গিয়ে ভিক্ষা চাইবেন। শিঙার আগহাতিশয়ে তিনি সেখানে মহাঘা-আহারেও শ্বীকৃত হলেন।

বৌদ্ধ শাস্ত্রকার বলেছেন, রাজপ্রাসাদে যির এসে শূন্যস্থান যখন সান্নায়ে একধা যোগ্য করলেন, তখন একজন পুরকামিনী আর স্থির থাকতে পারেননি। ক্ষুব্ধবশে প্রতিবাদ জানিয়ে কমেছিলেন—রাজপুত্র সামান্য ভিক্ষকের মতো স্থানে শব্দের ভিক্ষা চাইবেন—এমত অসহ্য। তাঁর সে প্রতিবাদের কথা বুৎখণ্ডকে জানানোও হয়েছিল; কিন্তু মহাভিক্ষু নির্বিকার-ভাবে বলেছিলেন—আমি ভিক্ষু, পূর্বপ্রায়ে কী জিহান সে প্রশ্ন অবতের, ভিক্ষালব্ধ অয়ে স্বাধীনতাই আমার ধর্ম!

সে কথা শুনে রাজকণ্ঠপুত্র সেই রমণীর কি প্রতিরিজা হয়েছিল, শাস্ত্রকার তা আর জানাননি। যেন কীর সেই মহিয়ার অপারিসরী অভ্যাস, মর্যাদিত অপরূপতার সম্মানই পাননি শাস্ত্রকার। তিনি শূন্য জানিয়েছেন সেই স্বাধা মহিয়ার গরিষ্ঠ—তিনি স্যামীতরার শূন্যবুৎখণ্ডেরা 'বশাদরা' (=গোপা, ভদ্রা, বিদ্যা)। না, নামটি পূর্বশত জানননি, শূন্যমত বলেছেন—'প্রহ্লাদ-মাত্র'।

পরদিন রাজপথে সভাই দেখা গেল এক সেবস্বর্গভাষিত মহাভিক্ষুককে। পুরবাসী ভিক্ষা যেনে কি, লক্ষ্যায় অনুশ্রুতভার জরা বুৎ করে মের কাঠারন—প্রাচীন রাজপুত্রকে ভিক্ষা সেবার মত স্বর্গীয় সাহস কার আছে? শূন্য ভিক্ষাপাত্র হাতে ধীরপথে এগিয়ে এসেন মহাভিক্ষু রাজপ্রাসাদের সম্মুখে। স্মারপাল শিহরিত হয়ে বুৎ লুকাল লজ্জায়। মর্যাদামস্তক গীত-করনধারী সম্যাসী অকস্মে এসে উপনীত হলেন জাতি-পরিচিত একটি ককের সম্মুখে। তাঁর সঙ্গে ভজ তাঁর দুই প্রধান শিষ্য মহাভিক্ষু সারিপুত্র ও মহামোঘজায়ান। গীর্ষাবিন পূর্বে এক আঘাতী শূন্যমার এ গৃহ থেকে তিনি সেখবার বোয়নে এসেছিলেন।

বৌদ্ধ শাস্ত্রকার কহতে ভুলেছেন, সেই নামহীরা 'প্রহ্লাদ-মাত্র' শূন্য ভিক্ষাপাত্রটি পূর্ব করে সেবার উপলক্ষে স্থার বুৎ বোয়নে এসেছিলেন ঠিক না। অথবা মহান অতিথিকে নিয়ে মহারাজ শূন্যস্থান যখন কস্ত, তখন সেই প্রাসাদের অপর প্রান্তে নিভৃত ভূমিখণ্ডায় কেউ অপ্রের বন্যার ভেসে গিয়েছিলেন কি না শাস্ত্রকার সে-কথার উল্লেখ করতে ভুলেছেন।

কিন্তু ভোলেননি অজন্তার শিল্পী। লজ্জাশ গৃহায় তিনি রঙে ও রেখার সেই বস্ত্র মুহূর্তটিরই মহাকলের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে শাস্বত করে রেখে গেছেন। সে-কথা বখাশ্ব্যনে।

বুৎখণ্ডের রাজপ্রাসাদে সেদিন মহাঘা-আহার হয়েছিল। আহাশ্রান্ত শূন্যস্থান তাঁর কাছে রাজকু-বশাদরার কৃষ্ণসাদনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন।\* উত্তরে মহাভিক্ষু বললেন—শূন্য, সেই জন্মেই নয়, পূর্বে পূর্বে জন্মেও তিনি বুৎখণ্ডের প্রতি একান্তপ্রবীণ ছিলেন। প্রসঙ্গভ্যে, তিনি পূর্বজন্মের চন্দ্র-কিরন-জাতক-কথা পুরবাসীদের শুনিয়েছিলেন। করনসী-রাজ রজসত্ত কী ভাবে চন্দ্র-কিরনীর রূপে বুৎ হয়ে তার স্বামীকে হত্যা করে, তারপর কী ভাবে সন্তোষিখণ্ডার কাছে বিবাহ-প্রস্তাব করে প্রত্যাখ্যাত হইল, এবং কী ভাবে শব্দের আশীর্বাসে

\* সিংসার্ব সঙ্গার তায় করিল বশাদরা পরিতরার অপরী নাম প্রোথিত লুৎকা স্রা পালন কলেন। তিনি যখন শুনিলেন সিংসার্ব মস্তক মূড়ন করিয়াছেন, তখন নিজেও মর্যাদামস্তক হইলেন; যখন শুনিলেন সিংসার্ব চীরবর পরিয়া করিয়াছেন, তখন নিজেও উৎকণ্ঠ কন পরিত্রাখ করিয়া চীরবারী হইলেন; সিংসার্বের মত তিনিও একবারী, ভূষাশালিনী হইয়াছিলেন। যুৎখণ্ড যিহ তিনি অন্য কোন পায়ে জাহ্নে প্রহস করিতেন না। এই সময়ে অনেক রাজকুমার তাঁহার পরিগ্রহণী হইয়াছিলেন; কিন্তু সিংসার্ব যিহ অন্য শূন্যস্থানে কল তিনি কখনও স্থানে যেন নাই। বৌদ্ধরা বুৎখণ্ড, অতীত জন্মেও তিনি বহুবার ভেটিমবুৎ স্বধর্মিনী ছিলেন এবং এইস্থানে সত্তীরের মস্তক রাখিয়া থিয়ামেন।  
—ইশানন্দ মোহ

স্বামী পুনর্জীবিত হলে চন্দ্রা বলে, চলুন প্রভু, এই ইবাঁ ও কামের বশবতী মন্থা-সমাজকে ত্যাগ করে আমরা সেই চন্দ্রসর্বভেই ফিরে যাই যেন :

কল্যাপনকে শূশনীভব কর রাহে চোতশারী সেই দিগন্তে  
ডুরেদি দ্বিগি নার দিগন্তে অতর চব্ব মন্থের শব্দে :—  
চল দুইজন বিহারি সেবারে, মান্থের পথ করিগা বধন,  
যাপিগা লীল মন্থে অনুকণ করি পল্লব প্রিয় সাধন।

রাজপুত্র নন্দ গিরেখিচেন কণিলাবন্তুর অপর প্রান্তে একটি নিভৃত নিকতনে জনপদ-কল্যাণীর গৃহে। তাকে আসন্ন উৎসবের সংবাদ দিতে। মিলনকামী দুটি তরুণ-তরুণীর সৌন্দর্য শব্দটির লিখে রাখবার মত।

দিবসান্তে নন্দ ফিরে এলেন নারায়ণার বিহারে। প্রচণ্ড কোঁড়ুল হয়েছিল তাঁর। প্রশ্ন করে বললেন অগ্রজকে—এই রাজেশ্বরীর বিনিময়ে, যশোবন্তর মতো ন্দী, রাহুদের মতো পুত্রের বিনিময়ে কী সম্পদ আপনি পেয়েছেন?

বৃন্দেব বললেন—শুনতে চাও তা? কস তাহলে শুনায়ে।

যতপ্রবীণ-কল্যাণী সেই নিদান সখার বৃন্দেশ্বরীকে ককে দুই ভাইরে কী কথোপকথন হয়েছিল, তা তুতীর করির করখোজ হারান।

গভীর রাতে শ্যার শুলে যেহিরে এলেন বৃন্দেব। সারিশব্দকে ভেঙে বললেন—নন্দকে প্রজ্ঞা দান কর। সে সন্ন্যাস নেবে।

পরদিন সন্ধ্যা পেরে ছুটে এলেন শূশোনন, এলেন মহাপোতমী। কিন্তু সর্বশেষ যা হবার পূর্বে রাগাই হয়ে গেছে। রাজকুমার নন্দর বনতক মৃদুভব—তার দিক দিগন্তে ভিকলায়, অঙ্গা পীত অগ্নি! মৃদুভা হার পড়লেন মহাপোতমী। আর বজ্রাহত সর্বভ-শিখরের মত এ চমক আঘাত অবলম্বিত গ্রহণ করলেন মহারাজ শূশোনন। তিনি ক্ষতি, অশ্রুর সাধনা তাঁর মন নয়—তার ঘোবে এক ফোঁটা জল নেই।

ফিরে এলেন নতমস্তকে রাজপ্রাসাদে। হাহাকার উঠল সমস্ত রাজ্যে। নিখির দেওয়া হল উৎসব-দীপাবলী, ভেঙে ফেলা হল পুষ্পভোজন। দীর্ঘশ্বাস পড়ে শূশোননের—অচিরে অবসরগ্রহণ তাঁর লগাট-লিখন নয়। বতদিন না বাসক রহুল উপস্থিত হয়, ততদিন তাঁর মৃতি নেই। এ মর্মান্তিক দুঃসংবাদে নীরবে নতমস্তকে ফিরে গেল প্রজাপন যে ব্যাঘ্র গায়ে।

নাটকের চরম মৃদুভব কিন্তু এখনও আসেনি।

কণিলাবন্তুর অপর প্রান্তে নিভৃত নিকতনে প্রসাবনন্দ্য জনপদ-কল্যাণীকে সাক্ষি করে তুলছিল কল্যাপন। আজ তাঁর বিবাহ এবং আজই হলেন এ রাজ্যের রানী। অকৈশোরের শব্দ আজ সফল হতে বাসছে কল্যাণীর। সেই উৎসবমুখের নিভৃত কুঞ্জে এসে দাঁড়াল একজন চন্দ্রপুত্র, নন্দের অনুচর। তার হস্তে নন্দের প্রজাপ্রান্ত রাজমুদ্রা। হতভাগ্য সংবাদ কহন করে এনেছে—রাজকুমার নন্দ প্রজ্ঞার গ্রহণ করেছেন।

এ মর্মান্তিক দুঃসংবাদ শু্য করবার ক্ষমতা ছিল না জনপদ-কল্যাণীর! মৃদুভবের মৃত্যুজিনী শূশিরে পড়ল দুর্দশপঞ্জার। সে মৃদুভা আর তার ভগ্নেহন।

লীলবিজয়নন্দ্য যে মর্ষা তাকে সেদিন রাজপুত্র নন্দ, অঙ্গ-শব্দমুখে মর্ষা তাকে দান করেছেন অঙ্গভার শিল্পী—কিশোর অন্যতম প্রেষ্ঠ রিহের সে আঙ্গ বিবর-বন্দু। অঙ্গভার যোড়শ পুত্রায় মরণাহত রাজকন্যার অলোকে শান্ত হতে আছে সেই হতভাগিনী বৈজয়নন্দী। সেই বিজ্ঞাত—The Dying Princess.

এ-খন্ডের পর সপ্তদিকস অভিজ্ঞাত হয়েছে। রাজপ্রাসাদের এক নিভৃত কক্ষে প্রচণ্ড অন্তর্জর্জরায়, দুঃখত অভিমানে দম্ব ইচ্ছিলেন রাজল-কননী যশোবন্ত। আজ সেই সপ্তম দিনের চিহ্নিত মৃদুভব। আজ তথ্যাত বৃন্দ ভোগ করে থাকেন নারায়ণার বিহার। আজ ফিরে আসেন যশোবন্ত। শিখর করলেন, আজই তিনি হালকেন চরম অগ্রহাত। যে মান্থমুগী তাঁর লীল, তাঁর যৌবন, এ রাজ্যের বৃন্দ-স্বাচ্ছন্দ্য নির্মমভাবে দলিত, মথিত

করেছে, তার উপর প্রতিশোধ নিতে হবে তাঁকে। বিমুক্ত রাজধানীর কালুয়ারীকে ভেঙে আদেশ করলেন, পুরা রাহুলকে একবার ন্যগ্রোধারাম বিহারে নিয়ে যেতে। সপ্তমবর্ষীয় বালককে শিখরে দিলেন, সে যেন ঐ নির্মূলের উদাসীন মানুহটার কাছে পিতৃদন প্রার্থনা করে। পুরোকে জন্মানন করেই পিতার কর্তব্য শেষ হয় না, তাকে লালন-পালন করাও পিতার কর্তব্য। এই নিম্নকল্প সত্যোপদেশে সত্যানন্দী হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পুরোকে পঞ্চ-ভাষার পাথর তৈরি পিতাকেই যোগাতে হয়। অতিমানস্কৃৎ রাজবন্দু বৈধতে যেন সেই নির্মূলের সর্বভাষা সম্যাসী কী পিতৃদন দিয়ে পুরোকে প্রতি পিতার এই প্রাথমিক দায়িত্ব সম্পাদন করেন।

অর্থীর আগ্রহে প্রহর গুনছেন ঘণেশ্বর। আজ তাঁর বার বার মনে পড়ে যাচ্ছে সত্যানন্দ চন্দ্র-কিম্বর-কাতক-কথা। আশ্চর্য, সে জীবনের কথা আজ তাঁর কিছুই মনে নাই; কিন্তু ঐ অশ্রুত মানুহটি নাকি ওলসাকুলে পূর্বনিয়মজ্ঞান লাভ করেছেন। ঘণেশ্বর ভুলে গেলেন, কিন্তু বৃন্দেবের ভোলেগনি চন্দ্র-কিম্বারীর সেই জালুল আবেশন।

কলকাত্তে পুণোচিত কত বহু প্রোচনশী সেই শিখরে  
ভূমিহীন হুঁসি মল্লি হৈলোলে জ্বাল প্রলম্ব হুঁসুর শ্বরে ;—  
এল হুঁসুরে বিহারি সেখানে, হানুয়ের পথ করিয়া বর্জন,  
বাগিচা জীবন যুগে অনুকূল করি পরম্পর প্রিয় সম্ভাষণ ॥

অথচ কী আশ্চর্য, সব কথা ভুলেও আজ ঘণেশ্বরের হৃদয়ে সেই বাণী কল্কত হয়ে উঠেছে ; আর সব কথা না ভুলেও এ আদ্যানে বৃন্দেবের মনে কোন মাজা লাগছে না! কেন এমন হয় ? অথচ সৌম্য কী ধরনভরেই তিনি আশ্রিত করছিলেন, ভাল হুঁসুরে বিহারি সেখানে, হানুয়ের পথ করিয়া বর্জন, বাগিচা জীবন যুগে অনুকূল করি পরম্পর প্রিয় সম্ভাষণ!

কিন্তু এত বিলাস হচ্ছে কেন রাহুলের প্রত্যাবর্তনে? ঋমে দিনান্তের ক্রান্ত পূর্ব অস্তা-চলগামী হুঁসুর—বনরমানে হল সান্ধ্য অলংকার। আজ হুঁসি জমকোয়া? বাতরান-পথে হুঁসিট মেলে বিরে সেখেন কাছিরে ফলাফল। রাজ্যোদানে জোনাকির আলোয়। চিন্তার উদ্বিগ্ন হুঁসে চলল ঘণেশ্বর। তবে কি পুরোকে হুঁস সেখেন মনে টেলেছে সেই উদাসীন সম্যাসী? তাকে কি হুঁসে টেনে নিয়ে আসার করছেন তিনি? তাকে কি পাশে বসিয়ে জাতকের কাছিনী শোনাচ্ছেন? তিনি কি পুরোকে কচি-কিলারতুল্য নয় হাতটি ধরে শ্বরে তাকে পেঁপেই দিতে আসবেন এই কহে? ঐ কি তাঁদের পদধ্বনি।

পদশব্দে প্রত্য হারিবার মতো হুঁসে আসেন ঘণেশ্বর। শ্বর উদ্দেশ্যে করত গিরেও হাত ওঠে না। বহি শ্বর হুঁসে সেখেন, ও-প্রান্তে হুঁসুরে আছেন সেই দেবদুর্ভাগ্যবান মহা-পুণ্ডরীক!

না, পিতাপুত্র নয়—শ্বর হুঁসে ঘণেশ্বর সেখেন, কিরে এসেছেন সেই বিমুক্ত কালুয়ারী। কিন্তু এ কি? তিনি একা কেন? রাহুল কোথায়?

—রাহুল কোথায়? অর্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করেন রাহুল-জননী।

—ন্যগ্রোধারাম বিহারে। আপনার শিকারত সেই আশাপাশি বালক মহাসম্যাসীর কাছে পিতৃদন প্রার্থনা করেছিল। মহাভিক্রু তাঁর প্রেত সম্পদ ধান করেছে, তাকে।

—কী সেই প্রেত সম্পদ?

—প্ররম্ভ! বালক রাহুল আজ সম্যাসী।

হস্তাহার মত হুঁসুড়ে চুম্বনবার লুটিরে পড়েছিলেন হুঁসহতা রাজবন্দু ঘণেশ্বর—ঘণেশ্বর নয়, এবারও নামহীন। সেই মনভাগিনী রাহুল-মাতা।

\* বৌদ্ধ শাস্ত্রমতে, বৃন্দেবের কীর সত্ত্ব বৃন্দেব পূর্বনিয়মজ্ঞানও (মোতিশব্দ) লাভ করেছিলেন। পূর্ব পূর্ব জন্মে তিনি বৌদ্ধধর্মগ্রন্থে যে সব শাস্তা করেছেন, তাঁর শ্রবণে আসে। বৃন্দেবের কণ্ঠ-প্রসঙ্গে বিবরণে তিনি সেই সব শাস্তা-কথা বলে গেলেন।

† বৌদ্ধধর্মের সঙ্গীতের "জাতক"কবি" নামক হুঁস পালি ভাষার লিখিত গ্রন্থ থেকে গ্রীষ্মকালের যোগে মহেশ্বর কল্কত হয়ে কলকাতা।

না! এ নাটকের চরম মুহূর্ত! কিন্তু এখনও আসেনি। এ ভেঙে কোন পরিষি নাট্যকারের নাটক নয়—এ যে মহাকাব্যের সংস্কৃত-লিপিত মহা-নাটক!

সবের শেষ সীমান্ত অতিক্রান্ত হল, আর নশ্বিত শূন্যস্থানের! এ সংযোগে তিনি বিশ্বায়কের মত জ্বলন্ত উঠলেন। উদ্ভবের মত ছুটে আসেন মনোযোগারাম বিহারে। সেখানে, পাশাপাশি বসে আছেন তিনজন ডিক্—পূর্বরূমে বাসের পরিচয় ছিল সিদ্ধার্থ, নল ও রূহল—ওঁর জয়গান্ড হৃদয়ের তিনটি গম্বুজ।

সেবিশব্দে মত ঐ সন্তমবধীর বালকের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন মহারাজ। কঠি-কিশলয়ের উপর বাল্যকস্মিনের রত্নমাতার মত দেখতে পেলেন সেই বালকের অননে এক শব্দগীত জ্যোতির আভাস। কাত বর্ষের অনুশ্রবণ আর মনে বইল না শূন্যস্থানের—মুটি নয়নের বাঁধ কেড়ে অশ্রুতের নিঃস্রব বস্তুর কনয়ার ভেসে যেতে ইস্তা হল তাঁর।

কিন্তু না! কাঁদবেন না তিনি। তিনি শাস্তি দিতে এসেছেন তাঁর সুবিনীত পুত্র সিদ্ধার্থকে। কঠিন কণ্ঠে প্রশ্ন করেন—ঐ বালককে কোন অধিকারে প্ররজা দান করছে তুমি?

নির্বিকার বৃন্দবেষ কালেন—সে পিতৃদন প্রার্থনা করতে এসেছিল। আমি ভিক্ষু, এই একটিমাত্র সম্পদই ছিল আমার কাছে। তাই দান করেছি ওকে।

: তুমি তো উদাসীন সন্ন্যাসী! পিতৃদানের সম্পদ কি স্বীকার কর তুমি?

: এ লগতে বিনি আমাকে এনেছেন, তাঁকে যেমন করে অস্বীকার করি মহারাজ?

: কিন্তু পুত্র কি পিতৃদন গ্রহণে বাধ্য?

: বাধ্য বইকি মহারাজ। পিতৃদন তো কেউ প্রজ্ঞাধানে করতে পারে না।

কাত ভেঙ্গে অজাতকথের মত জ্বলন্ত ওঠে মহারাজের মুটি আরও চক্। বজ্রকণ্ঠে কালেন—তাই যদি হবে, তবে কোন মহাসন্ন্যাসী, আমি কপিন্দ্যবস্তুর শালক-নৃপতি মহারাজ শূন্যস্থান। আমি জনৈক শাস্ত্র সিদ্ধার্থের জনক। যে উদাসীন নির্ভর সন্ন্যাসী, এবার আমার প্রপণের উত্তর দাও : আমার সেই পুত্র সিদ্ধার্থ কি আজ প্রস্তুত আছে তার পিতার হাত থেকে কিবা বিচারে পিতৃদন গ্রহণে?

শিহরিত হয়ে ওঠেন সারিপুত্র, উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েন মহাকৌণ্ডিন্যায়ন। এ কী কথা! আসন ত্যাগ করে হুতরুরে উঠে বাঁধান বৃন্দবেষ। অবিস্মৃতিতে বলেন : আছে বই কি মহারাজ!

এ উত্তরের জন্য বোধকরি প্রস্তুত ছিলেন না শূন্যস্থান। জনবৃত্তাতা ভগবান বৃন্দবেষ আর তাঁর সম্মুখে হুতরুরে প্রজ্ঞায়মান। পিতৃদন পোষ করতে উদ্যত তিনি—নিঃসত্তে গ্রহণ করতে চান পিতৃদন। শূন্যস্থানের মনে পড়ে গেল অনেক—অনেকদিন পূর্ববিকার কথা! লিন্দু গোতমের কথা, শালক সিদ্ধার্থের কথা। অপরাধী পুত্রকে তিনি কতবার কত শাস্তি দিয়েছেন। আজ আবার তাকে সেই শাস্তি দিতে হবে। হাঁ, কঠোরতম শাস্তি! সেই সিদ্ধার্থ আর আমার অন্তর করছে। অজান্তে অন্তর। সে কেড়ে নিচ্ছে জয়গান্ড বৃন্দের শেষ বর্ষ। মনে পড়ে গেল, মলভাগিনী কনশপ-কল্যাণীর কথা! এই উদাসীন সন্ন্যাসীর নির্ভর জড়ভেদে হত-ভাগিনী ভন্দ্রকরে প্রায়ত্যাগ করেছে। মনে পড়ল, সেই মূর্ত্যুভিন্দী মৌখোতিমীর কথা—সিদ্ধার্থকে বিনি মান্দ্র করেছিলেন, নন্দকে গর্তে লাথ করেছিলেন—আজ তিনি ভন্দ্রকরে রোগশয্যায় বসিয়া। মনে পড়ল, সব্বার উপরে তাঁর কল্যাণপরী স্নানীতাজা পুত্রবধুর কথা। ডার ঘেঁহা এখনও জাচ্ছেনি। এসের সকলের হয়ে কঠিনতম প্রতিশোধ নিতে হবে তাঁকে। কী শাস্তি দেবেন তিনি? কী অবশ্য করবেন? কখনো কি—ফিরিয়ে লাও রূহলকে? কখনো কি—গাধা-স্বাভ্রমে বিচে আসতে হবে তোমাকে?

প্রপণের মন্ত্রণে মুটি নান্দ, মহারাজের সম্মুখে প্রসারিত করে ভগবৃত্তাতা বৃন্দবেষ কলেন—অপনি আমাকে পিতৃদন দান করুন শিভা।

সারিপুত্র কি একটা কথা বলতে গেলেন, কিন্তু অকালকীর্তি হল না তাঁর।



মার্কসের বিরে পান শত্ৰুমান। কিন্তু নিজের কথা তখন আর তাঁর মনে পড়ল না। বললেন : হ্যাঁ, গ্রহণ কর এই শিষ্টদশ, এ অমাব অনুরোধ নয়, আদেশ! প্রতিভার কর, শিত্তা-মাতার সম্মতি-বাহিতরকে কোন ন্যায়ালকে আর কখনও প্ররঞ্জার মান করবে না তুমি!

: এ আদেশ শিরোমার্গ করলাম শিষ্টদশে।

বৃন্দাবন্যাক করার পর এই প্রথম এবং এই শেখার বিশ্বব্রাজ্য মহামানব গোঁড়মদ্য কেবল মরমানবের আদেশ বিন্যাসিতের নতমস্তকে শিরোমার্গ করেছিলেন।\*

নলের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের চিত্ত প্রথম দৃশ্যে দেখাচ্ছিল, শাক্য-সেনানায়ক কালদারী অশ্বারোহণে কপিলাবস্তুরে আসছেন বৃন্দাবনের অগমনবাহী ঘোষণা করতে (১৬।৩-ক)। কপিলাবস্তুর নথব-ভোজ্য অতিভম করছেন তিনি। ভোজ্যপানের পরেই দেখাচ্ছিল একটি অশ্ব উপদ্রুমে হ্রেশমর্দন করছে। তার পিঠে কোনও সজ্জার নেই। মার্কস অতিভম করে পশতকমলে পেঁচছে সজ্জার বন্ধন খোঁজতে ছেড়ে দেয়, তখন সে ঠিক বেঙোবে আরামে হ্রেশমর্দন করে। পাশেই স্তম্ভমর একটি মস্তপের নীচে বৃন্দাবন; সস্তম্ভত, তিনি ন্যায়োদ্যায় বিহরে পজ্জামান (১৬।৩-খ)।

পরে, একটু নীচে দেখাচ্ছিল, বৃন্দাবন পুনরায় বাঁড়িয়ে আসেন। তাঁর বাহুহস্তে তিক্কাপার, দিক্কাহস্তে তিনি অশ্বারোহণ করছেন একটি মারী ও একটি শিশুকে। একটু সম্মুখে পুনরায় সেই মহাভিক্কুর আলোচ্য (১৬।৩-গ)। এবার লক্ষণীয়, তাঁর সম্মুখে ও পশ্চাতে একই শিশুর চিত্র দৃশ্যের আঁকা হয়েছে। যেন অশ্বনের আতিশয্যে কপিলাবস্তুর পাখে তিক্কাহস্ত বৃন্দাবনকে প্রদক্ষিণ করে নৃত্য করছে একটি শিশু। সম্মুখে আরও সাত-আটজন পুরবাসী। তাদের মুখাঙ্কিত দিক্কা ভরতরী। সর্বান্বনে দেখাচ্ছিল পজ্জামান বৃন্দাবনের পদপ্রান্তে প্রণামহস্ত রাজকুমার নল বলছেন—অর্পণ আমাকে প্রজ্ঞা দান করুন।

এর নীচে কিছু পলঙ্গতারা খসে পড়ছে। তারও নীচের দৃশ্যটিতে (১৬।৩-ঘ) ন্যায়োদ্যায়ের বিহরে নলের মস্তক বৃন্দাবন করা হচ্ছে। সম্মুখে সিংহাসনে উপবিষ্ট তথ্যগত বৃন্দ, তাঁর পাশে অপর একজন তিক্কা-সস্তম্ভত: সারিগুর। প্রায়াদিকের মুখটি নষ্ট হয়ে গেছে। পয়ের পানলে হৃদিতমস্তক নল করলানকপোলে উপবিষ্ট—অত্যন্ত চিন্তাক্রান্ত মূর্তি তাঁর (১৬।৩-ঙ)। অদূরে দৃশ্যন তিক্কা বি যেন লক্ষ্য করছেন—অশ্বদৌল-সম্মুখে নন্দকে নির্দেশ করছেন। তার পরের পানেলে দেখাচ্ছিল, শূন্যপথে বৃন্দাবন ও নল আকাশপথে উড়ে যাচ্ছেন।

কার্হনটী এ অংশটুকু বলা হয়নি, তাই চিত্রদৌল দর্শনাঁকা হয়ে উঠেছে ভ্রম্য। সে-টুকু বলে নিই এখার।

জনপদ-কল্যাতকীর মৃত্যু-কথোদে একেবারে উদ্ভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিলেন নল। তখন বৃন্দাবন তাকে প্রশ্ন করেন—কল্যাণীর বিরহে তুমি এভাবে ভেঙে পড়ছ কেন? কল্যাণীর মতো মন নেই কেন?

নল বলেন—এমন মারীর দিভুবনে আর নেই, আর হবে না!

বৃন্দাবন বলেন—প্রান্ত ধাবণা ভেঙার, এসে আঁমারি সঙ্গ। আঁমি তোমাকে সম্বহারে

\* এই প্রসঙ্গে বলে মার্কস, ইতিপূর্বে সিপিএস কর্তৃক—মহাভারত শত্ৰুমান হারি পরতে চাবার প্রসঙ্গ করেছিলেন। তিনটি কার্হনই ইতিপূর্বে অর্পণ। তাঁর শেষ প্রান্তের কথটুকু বলে মার্কস—পশতকমলে হ্রেশমর্দন শক্তির শত্ৰুমানকে শেষ তাঁর অমাত্যের হস্তে পাবে মহাভারত কিছু একটা চাইছেন—কিন্তু সেটা কী তা বলছেন না। পশতকম এ পৃথিবী থেকে বিহার চোরাহ হ্রেশমর্দন শত্ৰুমান শেখারের মত তার জগৎপুত্রের সাক্ষাৎ চাইছিলেন। কিন্তু বৃন্দাবনের তখন বড় বড় সেনা অগমন করছেন, একটা দলই ছিল মহাভারতের। তাই তাঁর অগমন অসম্ভব। আর করেননি। অশ্বারোহণে মার্কস, একেবারে শেষ হ্রেশমর্দন মহাভারত সম্মুখে পান—সেই মহাভারতটি বৃন্দাবন মারীর তাঁর সম্বহারে এসে পজ্জামান হয়েছেন। পুরোভিত্তক মহাভারত একেবারে সার্বভৌম প্রসঙ্গ করেন বৃন্দাবনকে। আর এতটা না।

স্বর্ণ নিয়ে বান। সেখানে স্বর্ণের অপরূপের দেখলে বুঝতে পারবে, চিত্রকল সম্বন্ধে তোমার যা ধারণা, এ বিশ্বরসাত্ত্ব হয়ে চলেও যড়।

বিশ্বাস হয় না নন্দের। বুধদেব তখন জনুকে নিয়ে যান স্বর্ণে। নন্দ হুশ হয়ে যান মৃত্যুলালসার দেখে! নারীর চেহে যে এত রূপ থাকতে পারে, এ তাঁর কপনাই ছিল না। মর্ত্য মিরে এলেন ওরা। নন্দ বলেন—অর্পণ যে সব অনুশাসনের কথা কামেন, তা তিক তিক মেনে চলো আদি অন্ততমে ঐ রকম একটি নারীর পর?

বুধদেব মৃদু হেসে সঙ্ক্ষেপে বললেন—তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হবে।

বুধ হয় বোধে ভিত্তি হল। ওরা বাল্য-বিদ্যে করে। এমন কি ওদের একজন বলে—রাজকুমার নন্দ উন্মাদ হতে পারেন, কিন্তু প্রভু কি করে ঐ রকম প্রতিশ্রুতি দিলেন?

শুনে জানবুধ সারিগুহ তাকে বিক্রম দিয়ে বলেন—তোমরা কি প্রভুর বিচার করতে চাও?

গম্ভীর হর সেই বোধে প্রমথ; প্রায়শ্চিত্ত করতে বসে সে।

পনেরার বোধে নন্দ একই প্রস্থ করলেন তাঁকে, তখন তিনি বললেন—নন্দ, এতদিন তুমি জনশব্দ-কল্যাণীর রূপে অল ছিলে। আজ স্বর্ণের অপরূপের দেখে তাকে তুলেছ। নতা কি না? নন্দ গম্ভীর হয়ে স্বীকার করেন সে-কথা।

বুধদেব বলেন—কিন্তু এ-ও তোমার প্রাপ্তি নন্দ; এর চেয়েও মহৎ সম্পদের সম্ভান এখন পাবে, তখন দেখবে স্বর্ণের অপরূপের কথাও ভুলে গেছ তুমি!

মহামন্ত্র গম্ভীর নন্দ। এর পর থেকে কারামনোবাক্যে স্বর্ঘ্যচরণে মন দিলেন তিনি। বস্তুতঃ, সেইদিনই তিনি হলেন প্রকৃত স্বর্ঘ্য!

আকাশপথে উজ্জ্বলমান ঐ মূর্তি দুটি এক বিমর্ষ নন্দের দিকে নির্মমরত বোম্ব ভিক্ষু, এ-দুটি এই কাহিনী অবলম্বনে অঙ্কিত।

এর পরে বলতে হয় মঙ্গলহতা রাজকন্যার চিত্রকথা (১৬।৩-৬) :

অঙ্গুর্যর এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রটি দেখে গ্রীকি বলেছিলেন—“The Florentines could have put better drawing, and the Venetians better colour, but neither could have thrown greater expression into it. . . .”

চিত্রে (চিত্র-৪১) সর্ববামে দেখছি দুটি পুরুষচিত্র। একজনের হাতে নদের রাজমুকুট, অপরজন জনশব্দ-কল্যাণীকে কিছু বলতে চায়। কল্যাণী একটি শব্দার অর্ধ-স্মরণে—মুছাটুর মূর্তি তার। রাজমুকুটের দিকে বেচারী ওরকতে পারছে না। সত্যমোক্ষ কল্যাণীকে পিছনে থেকে একজন ধরে আছে। সম্মুখে আর একজন সেবিকা তার নাড়ির গতি লক্ষ্য করছে।

মঙ্গলহতা জনশব্দ-কল্যাণী দুতীর দণ্ডারমনা একজন বাল্মিকা তাকে বাতাস নিয়ে। প্রত্যেকের মূর্ত্যই উদ্বেগ ও হতাশার ছায়া। মুছাটুরই একটি মরুরী। কল্যাণী সে মাথা নিচু করে ঘন লক্ষ্যে মূর্তিতে মিশে যেতে চায়। মরুর সৌন্দর্যের চোতুর্ক। দিল্পী কি বলতে চান ঐ মরুর চিত্রিতা বারিকার প্রতীক? মৃত্যুর খাঁড়-নিচের ওপাশে আর একটি কণ্ডমুখ্য। মঙ্গলহতার বাহিরে একজন কন্দরী (মুগ্ধবক্তা) নিদ্রা। একজন মহিলা চিত্রকর্মের নিকট পরামর্শ চাইতে এসেছে। চিত্রকর্মের প্রায়শ্চিত্ত উৎস-কৃপার, দক্ষিণ-হস্তের করালমুখ দুই-সংখ্যাকে সূচিত করেছে। তিনি হয় কামেন—আর দুই হাতের ভিতর যোগিনীর বস্ত্রাঘর চির উপশম হবে; অথবা কামেন—উৎস দুইবার সেক।

চিত্রটির বর্ণনামে গ্রীকি বলেছেন—“For pathos and sentiment and the unmistakable way of telling its story, this picture, I consider, cannot be surpassed in the history of art.”

বোধ করি এ-চিহ্নের সমালোচনায় এঁরাই শেষ কথা।

সম্মুখের প্রাচীরে হস্তি-জাতকের একটি কাহিনী ছিল (১৬।৪) : বর্তমানে কিছুই বোকা যায় না। পশ্চের প্রাচীরে আর একটি জাতক-কাহিনী (১৬।৫)। চিত্রদুর্লভ জগত : কিন্তু এটিকে সমান করা যায়নি। দেখছি, একজন অশ্বমেধী একটি হালক চারজন লোককে তি কলছে। মীড় দুটি লোক এক শিশুকে ধরে আছে। একজন ধরেছে দুটি হাত, অপরজন



চিত্র ১৬।৪ মহাভারতের রাজকন্যা (অনন্তা অশ্বমেধী) : অঙ্কন—XVI/3 F.)।

দুটি পা। তৃতীয় জন ভরবারি উত্তোলন করেছে শিশুটিকে শিখাভিত্ত করতঃ। গাইত হরতো কলবে এ সেই বাক্যের জ্বালায় গল্গ। সেই দুটি নারী একটি শিশুকে নিলের সন্তান বলে দাবি করে এবং কাজী এই বিবাদের মীমাংসা করিতে চান শিশুটিকে শিখাভিত্ত করে। অন্তঃস্থ আত্মকে গাইত তাই কল্যাণ। কিন্তু কাহিনীটি আ নর—দে দুজন শিশুটিকে ধরে আছে তার একজন রমণী, অপরজন পুরুষ।

নগের কাহিনীর পরে কয়েকটি মানুসী-বৃক্ষের চিত্র (১৬।৬)। তারপর প্রাচীরের প্রান্তে দুটি ছোট চৌদ্দপাতে দুটি অশ্ব-শিল্প-নিদর্শন। একটি পুরুষ (১৬।৭-ক) ও অপরটি নারী-চিত্র (১৬।৭-খ)। মীড়ী ইস্রাইল বলেন, তিনি এদের নামকরণ করেছেন মহানর ও মীননরা।

৫-শাশে বৃক্ষদেবের ধর্মপ্রচারের একটি চিত্র (১৬।৮) নথি হয়ে গেছে। তার পাশে, গ্রীকিধ সাহেব বলেছেন, তাঁর আমলে ছিল একটি হস্তি-শোভাযাত্রার দৃশ্য। অজাতশত্রু হস্তিশেষে

বৃন্দাবনের বর্ণনাদানসে চলছেন (১৬৯)। বর্তমানে কিছুই নেই। অপর প্রান্তে বৃন্দাবনের আর একটি চিত্রও কালের করাম প্রাসে অবলুপ্ত (১৬৯০)।

খোঁজলে এলাম যোড়শ গুহা-হানির খেকে। পথে সেমে ইস্‌মাইল-সহেবকে প্রশ্ন করি—  
আপনি তো কল-রসিক। কালু তো অজন্মের কোন্ নারীচিত্রটি সবচেয়ে সুন্দর?

উনি আড়চোখে আমাকে একবার দেখে নিয়ে বলেন—কলুর উপস্থানটা মন দিয়ে শোনেননি দেখছি।

অব্যক হয়ে বলি—কেন? এ-কথা কেন বলছেন?

—সুন্দর না, মানুষের সৌন্দর্য্যের আপেক্ষিক। শব্দের অপরা না দেখে পর্যন্ত মন মনে করতেন, জনপদ-বলারশীই ত্রিভুবনে সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা!

আমি বলি—কিন্তু আপনি তো প্রায় পঞ্চাশ বছর অছেন এখানে। অজন্মের-চিহ্নসে দেখতে তো আর কিছু স্বাকি নেই আপনার। আপনার ব্যক্তিগত মৃতিভাষাতে কোন্ নারী-চিত্রটি সবচেয়ে সৌন্দর্যের দোতক?

এক টুকরো হাসি খেল গেল ইস্‌মাইলের বালরেশ্মাঙ্কিত মুখে। বলেন—সুন্দর তো চান আমার অভিমত? বেশ বলছি, কিন্তু তার আগে আমার একটা প্রতিশ্রুতির দাবি লেবেন?

বুঝতে পারি ওর প্রতিশ্রুতটাই কী। উনি নিশ্চয় জানতে চাইবেন, আমার চোখে কোন্ নারীচিত্রটি সবচেয়ে ভালো লেগেছে। আমি কোন্‌টিকে সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা বলব। মনে মনে উপযুক্ত উত্তরটি প্রস্তুত করছিলাম, কিন্তু ওর প্রশ্ন শুনলে মনকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল।

কলর—আপনি কি সভাই বিশ্বাস করেছেন ওদের কথা?

অব্যক হয়ে বলি—কাদের কথা?

—ঐ গারোগান, গোট-কীশোর, কিংবা চিকিৎসার কথা?

আম্ভো আম্ভো করে বলি—কি কথা কলু তো?

—সে বুড়ের মীর্জা ইস্‌মাইল একটি ছবির প্রসঙ্গে পাগলামি মেহেরালি হয়ে গেছে।

লজ্জার মাথাটা আর তুলতে পারি না।

উনি হেসে বলেন—আপনি লজ্জা পেরেছেন অবুধি। কিন্তু বিশ্বাস করুন, ওরা বোকার মত ভুল বস। হ্যাঁ স্বীকার করছি, এখনকার একটি বিশেষ জায়গা আমার বিশেষভাবে ভালো লাগে। মাঝে মাঝে একেবারে একা হয়ে পড়লে, ওখানে গিয়ে আমি বীড়াই; কিন্তু কেন জানেন? তার কারণ, এ অজন্ম গুহায় ঐ একটিমাত্র চিত্র আমি আজও ভালো করে দেখিনি। দেখবার সুযোগ পাইনি। ওর সামনে দিয়ে যখনই বাই, দোঁধি দারোগানগুলো আমার দিকে পাট পাট করে ডাকিয়ে আবে, যা টোপা-টোপি করছে, হাসছে। ওদের উপস্থানে, বিশ্বাস করুন, আজ ছয় মাসের মধ্যে সেই চিত্রটির দিকে একবারও মন ভুলে জাকাইনি।

মরমে মরে গেলুম আমি।

কিন্তু এর পরের প্রশ্নটিতে আবার লগেই হল—ভুলোক কি সম্ভবতঃ সুন্দর-রসিক? হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে উনি বলেন—আপনি আপনায় স্বীকে ভালবাসেন?

জবাব দিতে আমার বিলম্ব হওয়া স্বাভাবিক।

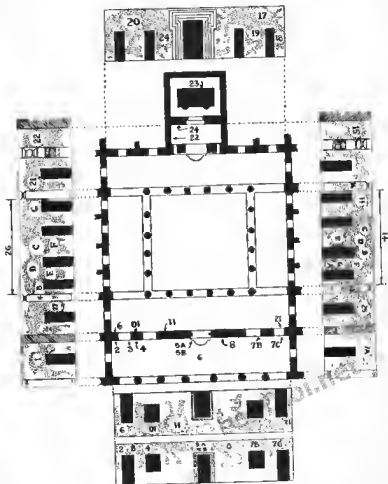
কিন্তু আমার জবাবের অপেক্ষা না করেই উনি কলতে থাকেন—কিন্তু কেন? তার কারণ, তার সঙ্গে আপনার ভীষন অচ্ছেদ্য-বন্ধনে আবদ্ধ। তাঁকে আপনি নিষ্ঠা সেবেন, তার সঙ্গে আপনার অন্তরের প্রাণ-বিনিময় হয়। এই চিত্রগুলির সঙ্গে আমার সম্পর্কটাও তাই। এখানে যখন প্রথম আসি, তখন আমার বয়স বাইশ-তেরইশ। মহলার আমার কেউ নেই, চিত্রগুলিই আমার খেলার সাথী। দীর্ঘদিন ওদের মাঝে থাকতে ওদের ভালবেসে ফেলা কি আমার অপরাধ, না সেটা অসম্ভব কিছু?

আমি বলি—আমি তো তা বলিনি।

আমার কথা শুধু কানে যায় না। কেমন যেন একটা ভাবাবেগে বিহীন হয়ে পড়েন বুঝ। দুর্বিশেষের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্কের মত আমার হাতটি তুলে নিয়ে বলেন—খ্যাতি! আমি গাঙলা ডাকা জানি না—কিন্তু ইংরাজীতে আপনাদের রবীন্দ্রনাথের ‘স্বাধীনতা পদার্থ’ গল্পটি আমি পড়েছি। আহা, আপনি বিশ্বাস করেন এমন ঘটনা বাস্তবে ঘটতে পারে?

আমার ঘরে কাটা দিয়ে ওঠে!

ঠিক সেই সময়েই কলারক-মুন্সীরত কলেজের একদল ছেলেমেয়ে হৈ হৈ করতে করতে এসে হাজির হল বিপরীত দিক থেকে। বোধ হয় চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল ও’র। যেন সর্বোচ্চ ফিরে এল ক্ষেত্র। আমার হাতটি ছেড়ে নিয়ে বলেন—লেট’স নাট গো টু কেভ নাম্বার সেভেনটিন—হা টোয়ার হাউস অব অলম্ভা প্রেসেন্স।



চিত্র-৪২.৪ সঙ্করভদ্রা বিহারের মন্দির।

## সংকলন পুঁজি-বিহারের প্ৰায়ন

- ১ সোলাহ-ওজ
- ২ ফলের পুঁজি
- ৩ পুঁজি-বিহারী ও কিশোর
- ৪ মস্তক মস্তকী প্ৰায়ন  
(চিত্র-৪০)
- ৫ মস্তক মস্তকী পুঁজি
- ৬ মস্তক মস্তকী পুঁজি
- ৭ মস্তক মস্তকী পুঁজি (চিত্র-৪৫)
- A পুঁজি-বিহারী পুঁজি
- B মস্তক মস্তকী পুঁজি
- C মস্তক মস্তকী পুঁজি
- ৮ পুঁজি-বিহারী পুঁজি (চিত্র-৪৬)
- ৯ মস্তক মস্তকী পুঁজি
- ১০ মস্তক মস্তকী পুঁজি (চিত্র-৪৭)
- ১১ মস্তক মস্তকী পুঁজি (চিত্র-৪৮, ৪৯)
- ১২ মস্তক মস্তকী পুঁজি (চিত্র-৪৯)
- ১৩ পুঁজি-বিহারী পুঁজি  
(চিত্র-৫০)
- ১৪ পুঁজি-বিহারী পুঁজি  
(চিত্র-৫১)
- A পুঁজি-বিহারী পুঁজি
- B মস্তক মস্তকী পুঁজি
- C পুঁজি-বিহারী পুঁজি
- D পুঁজি-বিহারী পুঁজি
- E পুঁজি-বিহারী পুঁজি
- F পুঁজি-বিহারী পুঁজি
- G পুঁজি-বিহারী পুঁজি
- ১৫ মস্তক মস্তকী পুঁজি
- ১৬ মস্তক মস্তকী পুঁজি
- ১৭ মস্তক মস্তকী পুঁজি
- ১৮ মস্তক মস্তকী পুঁজি
- ১৯ মস্তক মস্তকী পুঁজি (চিত্র-৫২)
- ২০ মস্তক মস্তকী পুঁজি (চিত্র-৫৩)
- ২১ মস্তক মস্তকী পুঁজি (চিত্র-৫৪)
- ২২ মস্তক মস্তকী পুঁজি  
(চিত্র-৫৫)
- ২৩ মস্তক মস্তকী পুঁজি
- ২৪ মস্তক মস্তকী পুঁজি  
(চিত্র-৫৬ ও চিত্র-৫৭)
- ২৫ মস্তক মস্তকী পুঁজি (চিত্র-৫৮)
- ২৬ মস্তক মস্তকী পুঁজি
- A মস্তক মস্তকী পুঁজি
- B মস্তক মস্তকী পুঁজি
- C মস্তক মস্তকী পুঁজি
- D মস্তক মস্তকী পুঁজি
- E মস্তক মস্তকী পুঁজি
- F মস্তক মস্তকী পুঁজি
- G মস্তক মস্তকী পুঁজি





সেই কালিদাসের মেঘদূতের একটি বিখ্যাত চরণ—‘সিদ্ধাম্পদে কলকণ্ঠপ্রাণীর্গীতমুদয়মাধব’। অর্থাৎ, মদে মদে মেঘ গেয়ে আসছে মেঘে সিদ্ধাম্পতি বীণা হাতে মৃদু পাগোছে, তাদের গর হঠাৎে জনকগণ তাদের বাখ্যবল ভেঙে নষ্ট হয়ে যাবে।

আমার কেমন জ্ঞান মনে হল, অমলতা-শিল্পীর মনে মেঘদূতের ঐ কবিতাটি নিশ্চয়ই আগরু ছিল এ-পটিকল্পনার সম্বন্ধ। কিন্তু জা কি সম্ভব?



সি—৪০৬ সপারধু ইন্ডের মডেল আভাস (অমলতা—XVII/4)।

এই সপ্তদশ বিহারটির নির্মাণকাল ৪৭০—৪৮০ খ্রীষ্টাব্দ। কালিদাসের কাল নিয়ে পণ্ডিতরা একমত হতে পারেননি—কিন্তু মাল্যসেনের সুবংশীণের বংশভূক্তি-লিখিত একটি লিপি পাওয়া গেছে, যার সময় হল ৪৭০ খ্রীষ্টাব্দ। তার মধ্যে একটি শ্লোকে কালিদাসের ‘বিশদেবতং ললিতবনিত্যং সেস্ত্রাপং বহিত্যঃ’ শ্লোকের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্টভাবে পড়েছে। তাই দেখে ইতিহাস-বেত্তা বের্ত্রজেন কীথ বলেছেন, ‘সুতরাং কালিদাস জীবিত ছিলেন খ্রীষ্টীয় ৪৭২ অব্দের পূর্বে, কালেই তাঁর কাল খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে নির্দিষ্ট করে সম্পূর্ণ হুঁতুলগত।’

ফলে, এই শতাব্দীটিরই আমি যদি মেঘদূতের প্রভাব লক্ষ্য করে থাকি, তাহলে আমার ব্যতিক্রম উড়িয়ে দেওয়া চলবে না। মাল্যসেনের-উৎকর্ষ ঐ শ্লোক জার অমলতার এই গুহা একই মতাবলী, একই ধর্মের সম্পদ। আর এই সময়কালের প্রায় সত্তর-আশি বৎসর পূর্বে হুঁতুলগত শিবতীর চন্দ্রদেবত বা বিজয়াদিত্য মন্দির কল প্রভাবভী গুপ্তসার মন্দির সাক্ষাতক-শ্রুতি হুঁতুলসেনের বিবাহ দিরাছিলেন। অমলতার ঐ যুগের শিল্পীরা বাগতকী প্রাঙ্গণের

অনুগ্রহভাজন ছিলেন এ-কথা মনে করা স্বাভাবিক, আর শ্রদ্ধাযতী দেবীর সঙ্গে গদ্যভঙ্গ্যের রাজসভার কয়েকজন বিশিষ্ট সভাসদ যে ব্যাকতিক রাজসভার এসেছিলেন, তারও ঐতিহাসিক নজির আছে। সুতরাং যদি বলি যে-শিল্পী ঐ চিত্রটি এঁকেছিলেন তিনি মহাকবি কালিদাসের স্বমুখেই এই শ্লোকেটি শ্রবণেছেন তাহলে অন্যতর ‘প্রাণজনিম্’ বোধে সে উক্তিটি দৃষ্ট হবে না।



চিত্র—৪৪৪ কলা-অঙ্গুর (মল্লভট্ট—XVII/৪)

প্রবেশপথে ভোরশের উপর আটজন মানুষী-বংশের (১৭/৫) অলঙ্কার। তার নীচে আটটি ছোট ছোট চৌখুপিতে আট জোড়া লিখন-চিত্র। প্রবেশপথের দু'পাশে দু'টি মর্মর মূর্তি—শালভঞ্জিকা নারীমূর্তি। অলঙ্কারের সিলিংকে কেন্দ্রস্থলে ছয়জন নর্তকী (১৭/৬) হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে। লক্ষণীয়, তাদের ছয়জনের সর্বসমস্ত ছত্রটি হাত আছে—অরোচি নয়।

শ্বরের দুই প্রান্তে দু'শ্রমেবের গীর্জনের একটি মঙ্গলীর অলৌকিক ঘটনা—নর্দারিদমন (১৭/৭)। কিন্তু তার পূর্বে বলতে হয়, এই প্রাচীরেই আছে অজন্মতার অন্যতম প্রেরণ নারী-চিত্র—বিখ্যাত কলা-অঙ্গুর (১৭/৮)। এই কলা-অঙ্গুরও কারুঘরে ফেলে গেলেই অকালপথে—

বিত্তর জন্য তাঁর কণ্ঠের ইস্তিকানশ্রমনির্ধচিত শব্দনরী একদিকে বেঁকে গেছে। মাথার ঠোঁটরা ও ও মগুটে মূঢ়ার কাগজদুলিও সব একদিকে হেলে আছে। কিন্তু এ চিত্রের আসল অবদান কলা-অপরূপার ভারসাম্যমিত মনবিহীন অর্ধ-নিম্নীলিত দৃষ্টি নয়নের দর্শিত্বে (চিহ্ন-৪৪)।

নলগিরি-ধমন কাহিনীটি 'বিনয়-পটিকা' থেকে সংগৃহীত। বিশ্বাসাবের পর অজাতশত্রু তখন মায়ের সিংহাসনে। 'পিতার ধর্ম' শোণিতের স্রোতে হুয়ে যেসে লিতে তিনি বশ্যপরিবর। বিশ্বাসাবের জ্ঞাতিভ্রাতা সেনবন্ত জোপনে হতবস্ত করলেন—বৃন্দাবন হখন শহরে প্রবেশ করলেন তখন রাজহস্তী নলগিরিকে মসোৎসব করে তাঁর দিকে ঘাবিত করে নেতলা হলে। রাজা অজাতশত্রু বেধ, রাধাশ, রাধা ছাড়া আর কোন কিছুকেই পূজনার মনে করেন না, তিনি সম্মত হলেন এ বড়মুখে। ঘটনায় এই কড়ালপেটের কথা বৃন্দাবনের অমৃতকূপের কানে যায়। তাঁরা মহাভিক্ষাকে অনুদোধ করলেন—এ অবস্থায় তিনি শহরে প্রবেশ করার পরিকল্পনা ত্যাগ করুন; কিন্তু তথাগত কর্পণাত করলেন না। সারিপুত্র ও মৌল্যায়নকে নিয়ে তিনি বখারীটি বেন্দেন থেকে শহরে এগোন ভিকরতে। পরিকল্পনামত হস্তিখলার মাহুত নলগিরিকে জড়না করল। রাজপথে গ্রাসের সঙ্গর করে প্রভজনবগিতে নলগিরি এগিয়ে এল বৃন্দাবনের দিকে। কিন্তু বৃন্দাবনের সমীপবর্তী হতে সে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। এই হচ্ছে সপ্তমবেশ নলগিরি-ধমন কাহিনী।

এই কাহিনী-চিত্রের অঙ্গ-বিশেষ আমরা এখানে সন্নিবেশিত করেছি (চিহ্ন-৪৫)। নিম্নাংশে রাজপথের দৃশ্য, উপগ্রন্থে শ্বিতল-প্রাসাদের গুহাক ও আলিঙ্গ। যদি ঐ অলিম্বাসিনীরের নাম হয় প্রীমতী ও মালতী, তাহলে মহারানী লোকেশ্বরীর অস্তরপূরে ওয়া কি বলাবলি করছে তা সহজেই অনুমেয়। রাজপথে বামপ্রান্তে দেখছি অমরোহী প্রহরীরা সাবধানবাণী উজারত করছে। শিল্পী গজরাজকে বৃন্দার একেছেন। প্রথমবার সে মনমত, কিন্তু শব্দে করে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক হতজায়েক। শ্বিতরীবার দেখছি সে সামনের দৃশ্যে হুড়ে বসে পড়েছে। হাতীর দৃষ্টি জিতে শব্দমাত্র জোব দৃষ্টি লক্ষ্য করলেই নলগিরি চোখের পরিবর্তনটা বোঝা যায়। দক্ষিণপ্রান্তে প্রক্ষুদ্রিত পশ্চিম উপর তথাগত বজ্রায়ান, তিনি নলগিরি থমকুস্তে মনোহে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। ঠিক তাঁর পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন সারিপুত্র।

এই চিত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গেও আমি জে ইরাজদানীর সঙ্গে একমত হতে পারিনি। ইরাজদানী বলছেন, 'অলিন্দে অবস্থিত পুরোহিত্যমীনের বৃন্দারনে শিল্পী কল্পনার প্রসার ও বর্ণিকাজেশের গন্ধতা দেখেছেন শব্দিকার কীর, তবু বলব—মহর্ষি চিত্রটির বিন্যাস শিল্পরসের রসিকের ততটা ভাল লাগবে না, হতটা লাগবে হস্তি-গল্প দেখতে অজান্ত দর্শকের। কারণ হস্তিপ্রবরকে অসম্ভাবিকভাবে প্রকাশ্য করে আঁকা হয়েছে, হস্তীই কেন গোটা চিত্রের সিংহভাগ লক্ষ্য করেছে।'

এ প্রসঙ্গে আমাদের বিতর্ক : প্রথমতঃ অজাতার চিত্র-কল্পতে কোন কোন প্রধান-চরিত্রকে অসম্ভাবিকভাবে প্রকাশ্য করে আঁকতে দেখেছি ; এ কোনও নতুন কথা নয়। এ জন্য আসক্তির কোন কারণ দেখি না। প্রথম গৃহের 'অলিন্দিকৃতেশ্বর পশ্চপারি', (চিহ্ন-৪৬) সাংলন-গৃহের গোপা-রাহুলের তুলনায় বৃন্দাবন (চিহ্ন-৪৭) অথবা পূর্ণ অলিন্দে চিত্রে পূর্ণ (চিহ্ন-২২) 'অলিন্দিকৃতভাবে প্রকাশ্য' করে আঁকা—জতে কোন বস্তুজস্ব হুয়েই বলে তো মনে হয়নি। বস্তুজঃ প্রধান চরিত্রকে বৈশিষ্ট্য বেওয়ার এ একটি প্রতিকৃত প্রণীত—অন্ততঃ অমলজার জগতে। প্রশ্ন হতে পারে, সে ক্ষেত্রে চিত্রের সিংহভাগ কেন খালি করল নলগিরি, কেন নয় স্বয়ং বৃন্দাবন? জবাবে প্রতিপ্রশ্ন করব : তাহলে আদি কবি বাম্বাটিক কেন রাকবের বিদ্রুবন জয়ের বর্ণনা বিলাস, ভেল নয় অনন-কর্তব্যিলাসী বলেই অগিনায়ক রামচন্দ্রের? রাম বর্তৃক রাবণবধ লক্ষ্যাকাতে লিখতে হবে বলেই ইন্দ্রজিত-কুলতর্ক-রাবণের বিবধ তিনি বিপদভবে বর্ণনা করেছিলেন। এখানেও ঠিক সেইভাবে শিল্পী অন্যায়সে চিত্রপটের সিংহভাগ ছেড়ে দিয়েছেন বৃন্দাবন গজরাজকে।

শ্বতীয়াত মহাকবি হ্যুজ কোনও ব্যক্তিগত শিল্পকর্মে নবরসের এমন সূচনায় সংস্থাপন আর কোনও সন্দেহই বলে তো মনে পড়ে না। নবরসের সঙ্গর হয়েছে :

আদি রাজ্যতঃপূর্বে মিথুনমূর্তি (চিত্র-৪৫-এর বাঁহায়ে)।

রৌদ্র নলগিরির উদ্ভব আত্মদেব।

বীজবসু...হস্তিগণ্ডি হাতভাণ্ডা ও শূণ্ডে জড়িত ব্যস্তির মূর্ত্তা।

অশ্বত্থ, হিমসার শ্বারা অহিমসার মুনোদেবনের দেবভক্ত পতিকল্পনা।

জয়ানক...কিছু পল্লবান।

বীর অশ্বারোহী সৈনিকের পক্ষ পঞ্চভাবীর বজ্রবীর প্রচেষ্টা।

হাস্য...হস্তীর সম্মুখ থেকে পলায়নশির বামন (চিত্র-৪৫-এর বাঁহায়ে)।

কাহ্না...কেন্দ্রন-বিহারে বৃন্দাবনের মূর্ত্তি (ঐ)।

শান্ত...নলগিরির সম্মুখে শ্ববৎ বৃন্দাবনে।



চিত্র-৪৫ : নলগিরি-বন।

উদ্ভঙ্গ কলপ্রপাত যেমন বিশাল ক্রুরের বৃকে জাঁপিরে পড়ে একেবারে নিজের অকস্মিত ঘটার, তক্কালহরাস তেহাই যেমন সুসমরে খামে সমের মাঝার, ঠিক তেমনি জানি প্রভঞ্জন-পাত চিত্র-নাটকের স্বনিকট-পতন ছলি নলগিরির মনো। তাই আমি কখনোই ইচ্ছায্যারীর সঙ্গে একেতে আমি একমত হতে পারলাম না।

অদ্বৈত আভিভব করে মন্ডলের ভিতরে আসি। এখার প্রবেশদ্বারের দিকে মূখ করে A. B.-চিহ্নিত প্রাচীরের ফ্রেসকোপটিল একে একে দেখতে থাকি। বামপ্রান্তে হস্তি-জাতকের কাহিনীটিকে উন্মার করা গেল না (১৭১৯); কিন্তু তার পাশে মহাকবিগীতারক্তের প্রথম কাহিনীটি আছে অক্ষত (১৭১৩)।

স্বর্বাঙ্গে বোধিসত্ত্ব ব্যাঘ্রসদীর উপকণ্ঠে এক মহাকবিগীত্রে জন্মগ্রহণ করেন। ক্রমে তিনি হন সেই অশ্বপের বানররাজের প্রপাদ। তাঁর অধীনে তখন ছিল আশি সহস্র বানর। ব্যাঘ্রসদীর

দক্ষিণ গলপাতীরে ছিল একটি অতি বিশাল অট্টবৃক্ষ। সে বৃক্ষে ফল হত যেমন অম্বাজারিক রকমের বড়, তার ম্যাপও ছিল তেমনি অতুলনীয়। গলপাতীরে এক বিকল অরণ্যের একান্তে এই ফলবান বৃক্ষটির স্থান পায়নি নিকটস্থ গ্রামের মানুষ; তাই কপিরাজ এই নির্জন অরণ্য-বৃক্ষটিতে সপার্বর্ষ বসবাস করতেন। বাস্তিপ্রিয় কপিরাজ এভাবেই মানব-সমাজকে এড়িয়ে নিরুপলব্ধ বানরকুলকে প্রতিপালন করতেন—তিনি করে করে অনুচরদের বলাতেন, যেন এই

মহাবর্ষ-হাতক

যোগ্যন সংঘটিত নিকটস্থ গ্রামে জলোজানি না হয়ে যায়। বেরুসালেমের মহামানবের শ্বাশন শিবের মধ্যে যেমন আশ-যোগ্যন করে ছিল বৃন্দে, বানররাজের অনুচরদের তেমনি লুকিয়ে ছিল এক বিশ্বাসঘাতক। শব্দে, তথ্যে এই যে, বৃন্দাশ্ব একবারই বিশ্বাসঘাতকতা করবার সুযোগ পেয়েছিল, আর এই বিশ্বাসহস্ত্য প্রতি জন্মে বোধিসত্ত্বের সঙ্গে লক্ষ্যগ্রহণ করেছে এই ধরাধামে, আর প্রতিবারই উপকারের বিনিময়ে বোধিসত্ত্বের সর্বনাশ করবার চেষ্টা করেছে এবং প্রতি জন্মেই বোধিসত্ত্ব তাকে কন্দা করেছেন। শেষজন্মে বোধিসত্ত্ব যখন আবির্ভূত হলেন শর্যাপিসহে গোতমবৃন্দাশ্বশ্রেণে, তখন সে-ও লক্ষ্যগ্রহণ করেছিল ঐ কপিরাজবৃক্ষের রাজপ্রাসাদেই—সিদ্ধার্থের অনুচর সেবকরূপে। কপিরাজের ভয় ছিল সেই কপি-সেবকদের মাধ্যমে যেন না জানাজানি হয়ে যায় এই অট্টবৃক্ষের অস্তিত্বের কথা।

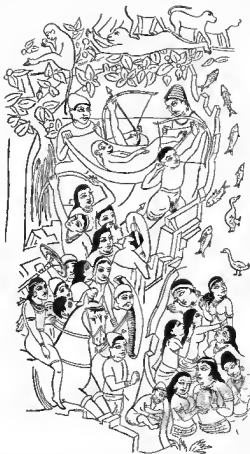
ঘটনাক্রমে কোন একটি বানরের হস্তচ্যুত একটি আম গলপাতীতে পড়ে যায়, এবং সকলের অলক্ষ্যে সেটি স্নোডের টানে ভেসে যায় উত্তর দিকে—ব্রাহ্মণসীর দিকে। কোন একটি ধীরের কালে সে ফলটি আটকে যায়। ধীর সেই বৃন্দাভদ্রশর্পন ফলটি নিয়ে যায় কাশীরাজের দরবারে—সম্মুখ্যে উপহার দেয় ব্রাহ্মণসীরাজকে। মহারাজ হৃদয় ধরে গেলেন। তিনি অনুচরদের ডেকে কলসেন, এই ফলবান বৃক্ষটির অবস্থান বুঝে বার করতেই হয়ে। সৈন্য বাহীরাজ গলপাতীর ধরে দক্ষিণাভিমুখে চলেতে থাকেন; গলপাতীতে যখন ভেসে এসেছে এ ফল, তখন নিশ্চয়ই গলপাতীরে আছে এই বৃক্ষটি। অকলশেই সত্যই তিনি একদমই আশ্চর্য হয়ে ফেলেন সেই রসাল বৃক্ষটিকে। বানর-সমাজীর্ণ সেই বৃক্ষটিকে দেখে মহারাজের দৃষ্টিতে জেধ হল, তিনি ভীরল্যাজ বাহিনীকে আদেশ করলেন, কপিগুলোর হাত থেকে বৃক্ষটি মুক্ত করো। অপাংখা সৈন্য হুহুডময্যে গাছটি ছিঁরে ফেলে; সপার্বর্ষ কপিরাজ বৃক্ষে বন্দী হয়ে পড়েন; পাছ থেকে সেয়ে যে গাল্যাকেন, তারও পথ রইল না।

বানর-সেবক দেখে এই সুযোগ; সে অন্যান্য বানরদের বলে—বানররাজের জন্যই এ বিশদ। এস, আমরা আমাদের রাজাকে কন্দী করে কাশীরাজের কাছে সমর্পণ করি। তাহলে তিনি আমাদের ক্ষেত্র দিতে পারেন।

কিন্তু বোধিসত্ত্বের প্রতি ক্রিয়ন্ত অজ্ঞান বানর প্রত্যাখ্যান করে এ বৃণ্ডিত প্রস্তাব। বোধিসত্ত্ব বানররাজ তখন নিরুপায় হয়ে নিজ অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় দিতে বাধ্য হলেন। নিজ সেই ক্রিয়ান্তরিত করে তিনি গলপার অপর ভীতের একটি বৃক্ষকে হাত দিয়ে ধরেন—তার বিশাল সেহে এভাবে লক্ষমবৃন্দার সেতুর মত গলপার দুই প্রান্তে বোধিসত্ত্ব রচনা করল। বোধিসত্ত্ব বাল্লন—আমরা এই সেহ-সেতুর উপর দিয়ে তোমরা গলপার অপর পারে পলায়ন কর। অতীতকালসঙ্গে সঙ্গে বানরকুল ঐ পথে গলপার পরপারে পলায়ন করতে থাকে। বিন্দুই কাশীরাজ ভীতল্যাজের নির্যাস করেন—বৃক্ষটিকে বানরশূন্য করাই ছিল তার উদ্দেশ্য। অজ্ঞান, তিনি এই অশুদ্ধ ও অলৌকিক কল-ভর শেষ দেখতে কৌতুহলী হয়ে পড়েন।

একে একে আশি সহস্র বানর বিশুদ্ধ হবার পর সর্বশেষে এটির আসে দেববন্ত। সে-ও নিরাপদে ওপারে অভিজানক হত, কিন্তু সেহ-সেতু থেকে নিরাপদ আগ্রের উল্লঙ্ঘনের সময় সেই বিশ্বাসঘাতক প্রবল পদাঘাতে বোধিসত্ত্বের মেরুদণ্ডের অস্থি স্থানচ্যুত করে দিয়ে যায়।

আশি সহস্র বানরের সেহজারে ক্রান্তভন্দু বোধিসত্ত্ব এ পদাঘাত সহ্য করতে পারলেন না—



ଚିତ୍ର—୩୬ । ମହାବୀର ଶରଣ (ବିଜୟ—XVII/10) ।

সম্পদে পতিত হলেন গঙ্গাগর্ভে। কাশীরাজ এতকাল সমস্ত নাইকটি দেখাছিলেন। তাঁর আদেশে রাজদ্বারের গঙ্গাগর্ভ থেকে উপহার করে আনে বোধিসত্ত্বের মুমুর্ধ দেখাই।

মহারাজ এতকাল অনুযায়ন করেন, এ সামান্য জানর নম—এ কোন শাপগ্রস্ত বেকরা। নলদ্রমে তিনি হলেন—আপনি যখন এত অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী, তখন আমার সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধদান করলেন না কেন?

বোধিসত্ত্ব বলেন—প্রাণি-হত্যার জন্য এ ক্ষমতা প্রয়োগ করি না আমি—অর্ডের গ্রাণের জন্যই শৃঙ্খ অলৌকিক ক্ষমতার ব্যবহার করি।

—কিন্তু আপনি যাদের উপকার করলেন, তাদেরই একজন ভেে আপনাকে বধের উদ্দেশ্যে পদাঘাত করে গেল?

বানররাজ শ্রিতহস্যে বলেন—তাই তো এ দুনিয়ার নিয়ম কাশীশ্বর! আমার এ জাতি সহস্র অশ্রুচর নিয়ে বহি নিত্য ব্যাঘ্রসমীপে অস্বার্থ সত্ত্বে যেতাম, তাহলে উপদ্রুত ওত সেই শাস্ত জনপদ। তাই নিরুপে এদের ক্ষমিবৃষ্টির আয়োজন করেছিলাম আমি। আমার সে উপকারের প্রতিদানে মহাব্যর্থিক কাশীরাজ কি আরোকে বধ করতে উদ্যত হননি? দেখলেন তো সামান্য জানর!

গঙ্গার অধোবন্দন হলেন কাশীরাজ। জোড়হস্তে বলেন—আপনি আমাকে ধম্মা করুন—আপনাকে সম্মানে আমার রাজসভার অধিষ্ঠিত করতে চাই।

বানররাজ বলেন—জা যে হকার নয় কাশীরাজ। আমার এ-কন্মের গুণকীলা শেষ হয়েছে। ভগ্ন ঘেদেস্ত নিয়ে আমি জীবিত থাকতে চাই না। বিদায় দিন আমাকে।

সাত্তুলোচনে কাশীরাজ বললেন—আমি হৃদয়ে পেয়েছি, আপনি শাপগ্রস্ত কোন দেহতা। আপনি নিশ্চয়ই কোন সম্বর্ধ প্রচারের উদ্দেশ্যে এসেছিলেন এ বোধ্যেই। অনুগ্রহ করে অজ্ঞাকে সেই সম্বর্ধের মর্মকথা বলে যান, যাতে আপনার আরেক কথ আমি কিছুটা অঙ্গর করে নিতে পারি।

বোধিসত্ত্ব বলেন—এ অতি শূদ্র প্রসন্ন। আপনি অবধান করুন—ধর্মের মূলকথা আপনাকে জানান করে আমি দেহভাগ্য করব।

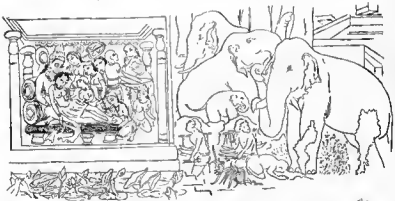
অতঃপর অধিসংসর্গের মূলকথা বর্ণনাস্ত বানররাজ বোধিসত্ত্ব তাঁর মর্ত্যলীলা সংবরণ করেন।

জাতকের এই কাহিনীটিকে অজ্ঞতার শিল্পী রূপায়িত করেছেন (চিত্র—৪৬) এই প্রাচীরে (১৭।১০)। দেখছি, কাশীরাজ সসৈন্যে আক্রমণের সম্মানে নির্ধৃত হয়েছেন গঙ্গাতীরে, সৈন্য-দলের হাতে তাঁর, ধনুক, তরবারি, ভাঙ্গ প্রভৃতি অস্ত্র একেবারে উপরে দেখছি, গঙ্গার দুই তীরে দৃষ্টি বৃক্ষ ব্যতীত হাত এ পা দিয়ে আঁকড়ে ধরে বানররাজ দেখ-সেতু রচনা করেছেন—ভীতভঙ্গ বানরকুল অতিভঙ্গ করে যাচ্ছে সেই সেতু। দেখছি, পরেই পানোলে ওহাত কান্ড-জঙ্ঘের বেহ দুইজন বাহক নিয়ে আসছে রাজসকাবে। শেষ পানোলে (চিত্র—৪৬-৪৭ খাতিরে) দেখা যাচ্ছে, বানররাজ ধর্মচর্য্যদ্বার কাশীরাজকে উপদেশ দিচ্ছেন।

প্রসঙ্গভে বলি, সীতার পশ্চিম তীরের দক্ষিণ-মধ্যভাগে শীতপাঠি বা আবাকসের ঠিক নীচেই এই ভাতব-কাহিনী অকালপনে একটি ভাস্কর্য আছে। ভাও দুর্বে ভাওহুতে-প্রাপ্ত একটি প্রস্তরখণ্ডে একই শৈলীতে এই কাহিনীটি বিস্তৃত। অজ্ঞতার চিত্রের সঙ্গে সেই দৃষ্টি ভাস্কর্য-নির্মালনের পরিচলনপনাত সাদৃশ্য লক্ষণীয়। ভাওহুত-সীতার ভাস্কর্যই সরসে প্রাচীনতর। মনে হয়, অজ্ঞতার শিল্পী সীচি ধর্মন করে এসে এই প্যানেলটি রূপায়িত করেন।

এই প্রাচীরের অপর অঙ্গল বড়দন্ত-জঙ্ঘকের একটি কাহিনী-চিত্র আছে। চিত্রের নীচের অংশ অনেকটা নষ্ট হয়ে গেছে, উদ্দেশ্যের খানিকটা আঙও দেখতে পড়ার দায় (চিত্র—৪৭)।

হৃদয়স্ত-কাতক কাহিনীটি দশম গৃহ্যের অন্তর্গত চিত্রাকীর্ণ বর্ণনা করার সময়েই বলছি। এখানে চিত্রে দেখছি নীচে একটি পশুঘরের আভাস। এ অংশটি প্রায় সম্পূর্ণ অন্ধকূট-বদ একটি পশুঘর ও পশুগায়ে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। গজরাজের উৎকীর্ণ শব্দের প্রান্তভাগও নিম্নতলে দেখা যাচ্ছে। উপরে বাক্যব্যয় দেখছি, কান্দী-রাজের মৃগয়াযিগতি শরসন্ধান করছে। দেখছি, বিশালকার শব্দতরঙ্গের গজরাজ নিম্ন শব্দের আলাপন করে গজরাজ কিছু কিছু করছেন। মৃগয়াযিগতিতে পর পর চারবার তাঁকা হয়েছে। প্রথমবার সে শরসন্ধানরত, দ্বিতীয়বার সে গজরাজ-কাঁদে ফিরে আসে—কিন্তু তার হৃদয় গমন-পথের বিপরীত দিকে, সে বেন ফিরে ফিরে দেখছে। তৃতীয়বার দেখছি, মৃগয়াযিগতি ফিরে এসে গজরাজের চরণপ্রান্তে প্রণাম করছে : চতুর্থ চিত্রটিতে দেখা যাচ্ছে, সে এসে উপস্থিত হয়েছে সত্যশোভিত এক মন্ডপের সম্মুখে। অর্থাৎ এই চতুর্থ আলোচ্য আমর মৃগয়াশব্দের এসে পড়ছি। দুই গৃহ্যের মধ্যখানে আছে মন্ডপের একটি শোভাসম্পন্ন বসতি-চিহ্ন। মন্ডপের ভিতরে মৃগয়াশব্দের দেখছি, অন্দের একটি শব্দ-খালিকার গজরাজ নিয়ে এসে উপস্থিত হয়েছে রাজা-রানীর সম্মুখে।



চিত্র—একঃ মৃগয়াশব্দ (অল্পস্র—XVII/11)।

কাশীরাজ ও রানী কল আছেন একটি অন্ধ পালকে। রাজার পিছনে মৃগয়াশব্দটি উপস্থান। চিত্রে দেখা যাচ্ছে, গজরাজ দেখে রানীর শব্দ-অভিজ্ঞান ফিরে এসেছে—তিনি মৃগয়াশব্দ। কাশীরাজ পতনোন্মুখ রানীর দেখভারতক আলাপনবধ করেছেন। মন্ডপে আরও আউলন নরনারীর আলোচ্য—সকলেই ভীত ভীত স্তম্ভিত।

এই গজরাজটির মধ্যে দশম গৃহ্যের অঙ্কিত, অন্দের অন্ধকূট চিত্রটির বিরুদ্ধে অভিন। কিন্তু হৃদয় চিত্রের পরিকল্পনার বশেষ প্রত্যক্ষ আছে। সেখানে রানী উপস্থিত—তিনি মৃগয়াশব্দ—মাত্র, তখনও তিনি মৃগয়াশব্দ হননি। এখানে দেখছি, তাঁর দেখভার রক্ষা করছেন কাশীরাজ—রানী পতনোন্মুখ। বরং এই চিত্রটির মধ্যে পরিকল্পনার দিক থেকে অনেকটা মাদ্রাস লক্ষ্য করা যায় শোভন বিহারে অঙ্কিত জনপদ-কলারগীর মৃগয়াশব্দের মধ্যে (চিত্র—৪১)। এছাড়া, এই বিহারেরই অলিন্দে নিম্নতলে ও মাত্রীর যে মৃগয়াশব্দটি আছে (১৭/১০), তার মধ্যে রাজা-রানী—১৫



রানীর বসবাস ভাঙ্গি, পরিব্রাজকের ভীতকিত দৃষ্টি এবং মণ্ডপের বহিরঙ্গের পরিব্রাজকের আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

কেন্দ্রস্থিত স্থানের অপর পার্শ্বে ছিল মৃগ-জাতকের একটি কাহিনী (১৭/১২) এটিও প্রায় নষ্ট হয়ে এসেছে—আভাসমাত্র দেখা যায়। প্রাচীন একটি অনুদ্বীপের সাহায্যে দুটি চিত্র এখনো সন্নিবেশিত করে দিলাম। প্রথমে কাহিনীটা বলি : সেবার বোধিসত্ত্ব এক মণ্ডপের

মৃগ ধরে ধরাধারে অবতীর্ণ। গভীর অরণ্যচারী তিনি, সত্য-শক্তিক্ত—কেনে শিকারী যেন তাঁর সম্মান না পায়। একদিন এক পখিক পথ হারিয়ে অরণ্য-

জেলন করছে সেবে ধরা-পরবশ হয়ে বোধিসত্ত্ব তাকে উদ্ধার করে দিলেন। অরণ্যের সীমাস্তে এনে গ্রামের পথ দেখিয়ে দিয়ে বললেন, ‘আমার কথা যেন কাউকে বল না’। ইতিমধ্যে কাশীরাজ-মহিষী ফেরা স্বপ্ন দেখলেন যে, অরণ্যে একটি মণ্ডপ স্থাপন করছে। তিনি রাজাকে বললেন, সেই মণ্ডপে তাঁর ছাই। স্বার্থাতি কাশীরাজ ঘোষণা করলেন—মণ্ডপের স্থান যে দিতে পারবে তাকে তিনি সহস্র মণ্ডপ দিবেন। কৃতঘ্ন পখিকটি লোভ সামলাতে পারল না। কাশীরাজকে তার অশ্রুত অভিজ্ঞতার কথা জানালো, এক সেই মৃগ কোন অরণ্যে অবস্থান করে তা শ্রবণ দেখিয়ে গিয়ে রাজারী হল।



চিত্র-৩৮ : মৃগজাতক (অবস্থান—XVII/12)

উল্লেখ্য কাশীরাজ সেই পখিককে পুরোজনে রেখে মৃগসারাগ্য করলেন। গভীর অরণ্যে এসে পখিকই প্রথম মণ্ডপস্থানে দেখতে পায় এবং ছুটে এসে তার মৃগ দৃষ্টি দৃঢ়ভর্তিতে চেপে ধরে। তৎক্ষণাৎ মহিষীকে থেকে তার হাত ছুটি খসে পড়ে। বসন্তের পখিক আতর্জন করে ওঠে। স্তম্ভিত রাজা তখন মণ্ডপস্থানকে প্রশ্ন করেন, সে কেমন করে এমন অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হল। মণ্ডপস্থান বলে, মহারাজ, আমি সাধনা মৃগ, এই অরণ্যের একান্ত আত্মসে আপনমনে সাধন-ভজন করি। ঐ কৃতঘ্ন পখিকের হস্তস্পর্শে সেই মৃগ হওয়ার ব্যাপারে

আমার কোন ভূমিকা নাই। সে কনসেনী আমাকে রক্ষা করেন তিনিই ওর এই শাস্তি বিধান করেছেন।

কৌতূহলী কাশীরাজ প্রশ্ন করেন, স্বর্গসূত্র কেন ঐ লোকটিকে ভূতবাণী কলছেন।

প্রত্যুত্তরে মহারাজ পূর্ববৃত্তান্ত সহস্র খুলে বলেন। তখন মহারাজ জোষের বশবতী হয়ে সেই অকৃতজ্ঞ পথিককে হত্যা করতে স্বয়ং পরমলোভ করেন। মহারাজই তাঁকে প্রতিহত করে বলেন, মহারাজ ও ইন্দ্রিরের বাস। ওকে এভাবে হত্যা না করে বরং কী-ভাবে ইন্দ্রির-সংস্রম করতে হবে তাই আপনি ওকে শোনা। সম্বন্ধের ব্যাপী ওকে শোনান।

রাজা সর্পিষ্ময়ে বলেন, সেটা কী-রকম?



চিত্র-৪১ঃ মহারাজক (অঙ্কন-XXVII/12)।

অতঃপর মহারাজ অহিংসোপন্যাসের মর্মকথা কলতে থাকেন। অনন্তর শুনেন মহারাজ বলেন, মহারাজ। এ ধর্মের ব্যাঘ্র আপনাকে আমার রাজসভার এসে পুনরায় বলতে হবে। কাশীরাজ-মহিষী স্বয়ং আপনার মধ্যে সম্বন্ধের মর্মকথা শুনতে চান। মহারাজ সম্মত হলেন। তখন মহারাজ সূর্বসন্ধ্যাত রখে মহারাজকে সন্ধ্যারবে রাজবাগানে নিয়ে গেলেন। কেমাসেমারী মনোবাসনা পূর্ণ হল। সম্বন্ধের প্রসঙ্গ হল।

এই ব্যতিক-কাহিনীটি শিল্পী কি-ভাবে রূপান্তর করেছেন এবার আমরা তাই দেখব। প্রথম দৃশ্য (চিত্র-৪২) দেখছি কাশীরাজ সৈন্যে অরণ্যে প্রবেশ করছেন। রিগের বামপ্রান্তে তিনজন অশ্বারোহী ও একজন পদাতিক। তারপর দেখছি ভূতলে দণ্ডায়মান পথিক তার দক্ষিণমুখ উত্তোলন করে সৈন্যদলকে ধামতে কলছে—সে কেন কলছে সে, মর্মসূত্রকে সে

সেখানে গেলোছে। চিত্রের দক্ষিণার্ধ হচ্ছে পরবর্তী দৃশ্য। দেখছি মঙ্গলজলের স্থানান্তর দৃঢ়-  
 ঘৃণীভিত্তে ধরতে পথিক দুই বাহু প্রসারিত করেছে, কিন্তু দক্ষিণার্ধ থেকে তার হাত দুটি  
 কঁচড়া। লক্ষ্য করলে দেখবেন তার পায়ের কাছে দুটি বাটা হাত পড়ে আছে। শিল্পী  
 মঙ্গলজলের পিছনে তাঁর নারীকো মৃগীতেও এঁকেছেন—লক্ষণীর মৃগী কিন্তু সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগ,  
 তিনি জানেন কন্যেবী তাঁদের রক্ষা করবেন। এই দৃশ্যে দেখছি কাশীরাজ (চিত্রের কেন্দ্রস্থলে)  
 অশ্বপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করে ভুলেই দণ্ডায়মান। তাঁর দক্ষিণহস্তের মূদ্রা বিশ্বাসঘটক, তাঁর  
 দৃষ্টিতেও একই কাজনা। রাজার পদতলে পথিককে পুনরায় দেখতে পাছি—এবার সে বন্যভার  
 নতলান্ন হুয়েছে। অকৃৎসল সে গভীর অরণ্য তার প্রাণবন্দন দিলশী গুহাজলতরে এক  
 সিংহকেও এঁকেছেন।

পরবর্তী চিত্রে (চিত্র—৪১) দেখছি মঙ্গলজলকে ঋষি তুলে কাশীরাজ রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন  
 করছেন। এবার ঘটনাস্থল গভীর অরণ্য নয়, নগরীর উপকণ্ঠ—পশ্চাৎপটে দুর্গের প্রাচীর  
 পরিদৃশ্যমান। এবার সোভাগ্যবান পূর্বদৃষ্টে তিনিই অশ্ব ছাড়া দুটি রাজহস্তীও দেখছি।  
 এবার রাজার মাথার রাজমুদ্রা, বা গভীরে রুত-বাগদান মঙ্গলজল রাজার মাথার ছিল না।  
 রাজা যে মঙ্গলজলকে সম্মানে নিয়ে যাচ্ছেন এ সজ্জা প্রতিষ্ঠিত করতে শিল্পী রথের উপরেও  
 একটি সম্মানছত্র এঁকেছেন। মঙ্গল-জলের সঙ্গে গুড়িচার্যক কুতূহলও আছে। চিত্রের  
 কল্যাণদ্বয়ানটি লক্ষণীর—প্রতিটি জাঁকই একমুখী, সেন বামপ্রান্তের হস্তী-অশ্ব-মামু ও  
 কুতূহলের মল একটি ভীতের ফলার মত দক্ষিণাভিমুখে চলেছে—এক সেই ভীতের ফলা নির্দেশ  
 করছে এ চিত্রের মূল আকর্ষণ এই মঙ্গলজলকে।

পূর্বদিকের প্রাচীর-দগ্গে একটি অর্ধ-সম্ভব বা পিনাসীতের (১৭।১০) দেখছি প্রায়মানরতা  
 রাজকন্যাবা আরাধ্য (চিত্র—৪০)। এক পার্শ্বে চামরবাহিনী অপর পার্শ্বে একজন কিশোরী  
 প্রাণাল সাময়ী নিয়ে প্রতীক্ষা করছে। 'প্রাণালবরতা রাজকন্যা' নামে এ চিত্রটি বিখ্যাত।

রাজকন্যার স্বাম্যহস্তে দর্শন এবং দক্ষিণকরে কোন প্রসাধন সামগ্রী। গাইত্রক বলবেন, স্বামি  
 চিত্রের নীচে ধরে দেখিয়ে ঘেঁষে রাজকন্যাব শতনরীর মন্ত্রণাবনা কেমন অশুভভাবে চিত্রের সমতল  
 থেকে উঠু হয়ে আছে। অস্বাভূত এ পর্বতভূমির এই ছোট রক্তের বিন্দুগুলি কেমন করে যে  
 আলো টিকে আছে, করে পড়েনি, ভালো অটক হতে হয়।

এর পরের প্যানেলটি বৃহদারতন—সিংহল-অবধান জাতক (১৭।১৪)। কাহিনীও গীর্ষ,  
 তার মৃগায়ণও কিন্তু অংশ জুড়ে। কেন্দ্রস্থ মণ্ডপের সম্পূর্ণ পূর্বপ্রাচীর জুড়ে ছবির পরে  
 ছবি। এই চিত্র-নাটকের রস আহরণেও সেই দুটি বাধা ; প্রথমত, জাতক-বর্ণিত কাহিনীর  
 সঙ্গে দর্শকের অপরিজ্ঞ, আর দ্বিতীয়ত, চিত্র-কাহিনীর বিষয়ে কোন সুসংবোধ আইন মেনে  
 চলে না। অথবা মেনে চলেও আমরা সে-বিষয়ে অবহিত নই। তাই কলেকশ' চিত্রের ভাঁড়-  
 আমরা যারে করে চিত্র-কাহিনীর সূত্র হারিয়ে ফেলি। সর্বপ্রথমই তাই কাহিনীটি মেনে-মোড়ার  
 চেষ্টা করা দ্বারক :

জম্বুদ্বীপে সিংহকল্প মহাজনপদে মহারাজ নিরোকেশরীর রাজাই খসে করতেন একজন  
 ধনী বণিক, সিংহক। তাঁর একটি পুত্রদম্পত্য হল ; সিংহক মনোভ্রমেই কক্ষ গ্রাহলেন সিংহল।  
 শিশু সিংহল অত্যন্ত স্বপ্নিমান, নানা বিদ্যায় সে অদ্বিত্য-পারদর্শী হয়ে উঠল। পুত্রের বিবাহ  
 দিতে চাইলেন পিতা—কিন্তু সিংহলের ইচ্ছা, সে প্রথমে বাণিজ্যভারত যাবে। বণিকপুত্র  
 অন্ততঃ একবার সমুদ্রযাত্রা না করে কি ঘর-সংসারে মন দিতে পারে?  
 সিংহল-বাসন অনিচ্ছাসত্ত্বেও সিংহককে অনুমতি দিতে হল। নানা সম্মে বাণিজ্যভারত  
 সাধিলে সিংহল মাদুর ডিম্বার রঙনা হয়ে পড়ল—দূর দেশের সম্মানে, সমুদ্রপথে।

নানা দেশে বাণিজ্যের সেন-সেন করে লাভবান হল বণিক। দেশ-বিদেশের বাণিজ্যসম্পদে  
 পূর্ণ হল পুণ্ড্রপাত। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পথে একটি অ-পূর্বজাত খ্যাপ অবতরণ করল  
 বণিক সম্প্রদায়। খ্যাপটির নাম জাম্বুদ্বীপ—ইতিপূর্বে জম্বুদ্বীপের বণিক কখনও অপেনি

এ স্বীপে। সমুদ্রমেখলা এই স্বীপে কোন পুরুষমানুষ নেই। বণিকদল সন্নিহনে লক্ষ্য করে দেখে—এ এক প্রমীলারোহা! অশ্রু-সুন্দরী নারীর দল স্বাগত সম্বন্ধে জানাল ওদের। স্তম্ভিত বিস্মিত বণিকের দল সে নারী-রাক্ষসে আতিথ্য গ্রহণ করল। এক-একজন গৃহস্থামিনীর ভবনে স্থান লাভ করল এক-একজন বণিক। শব্দে সুবাসা ও সুগেহই নর, দীর্ঘদিন সমুদ্র-যাত্রায় ক্লান্ত এই নারিকদের শব্যাসলিলানী হতেও আশ্রিত নেই ওদের—এ-ও যে আতিথ্য-ধর্মের অন্তর্ভুক্ত! একেবারে মুখ হয়ে যায় লক্ষ্মীস্বীপের বণিকদল।



চিত্র—৫০১ প্রাসাদবাসী প্রভুজন (অঙ্কন—XVII/13)।

শব্দে কি জানি, কোন অতীন্দ্রিয় অনুভূতিতে সঞ্চিত হয়ে ওঠে সিংহল। নিঃসর অমল্লক আলস্যায় সে বেনে অশ্রু-সুন্দরী করতে থাকে রূপান্তর। দলপতি সিংহলকে সাধরে আমন্ত্রণ করে নিধ প্রাসাদে নিয়ে এসেছিল তত্ত্বস্বীপের অনিন্দ্যকান্তি রাজকুমারী শরৎ। হৃদি-বীণিত প্রসাদ-কক্ষে আহার-পানীয়-ব্যাসনে আরোহণের কোন হুটি নেই; লাস্যময়ী মর্তকীর দল, বাদ্যমণ্ডলীর দল বণিক-পুত্রের অনলম্বাসে কাপশ্য করে না—স্বয়ং রাজকুমারী তার বৌদোনন্দত

হুশের পসরা সাজিয়ে ইপিগত করে করে ব্যারে ; কিন্তু বন্ধক-পুত্রের হায়ে কেমন যেন গাড়া কাপে না। তার কেবলই যেন হার—এ কেমন রাজা? শূদ্রসম্মানই এখানে একবারেই সেই কেন? কেমন করে তাহলে এরা প্রজননের পক্ষে জনসংখ্যা বন্ধার রাখে? রাজ্যে একটিও অসুন্দরী মেয়ে নাকর পড়ল না কেন? সমস্ত আরোজিন এত কৃত্রিম যেন হচ্ছে কেন? জন্মশ্রীপের এতাক কালের বণিকবুল এই সোভেনারী শ্রীপটিকে সবচে এড়িয়ে গেছেন কেন? কেন-কেন-কেন : রাজকুমারীর মদন-মর্শপরে শূভারতির সমস্ত আরোজনের উপরে ক্রমাগত প্রশ্নবোধক চিহ্নের বৃষ্টিতে বণিক-পুত্র হুশ হল হতভৈ, নতক' হল আর চতুর্দশ।

আর এই নতক'ভাই প্রকা করল ডাকে—একমাত্র ডাকেই। পাচশ, অনুচরকে হারিয়ে রিত বণিক একবারে একাই ফিরে আসতে পেয়েছিল সেই তাম্রশ্রীপ থেকে।

তাম্রশ্রীপের অধিবাসিনীরা কবুজ রাক্ষসী—সোহমরী নারীর হুশ ধরে তারা বণিকদের নিয়ে নেত স্বগৃহে। রাতে তাদের হত্যা করে নরমাংসে স্তুতিবর্জিত করত। তাম্রশ্রীপবাসিনী রাজকুমারীকে অঙ্গ করে কোনক্রমে গ্রাস নিয়ে ফিরে এল সিংহল নিগমে। সুহকমরী রাজকুমারী কিন্তু ভয় তার আশা ছাড়ে না। সম্ভোবিবাহিত এক নারীর হুশ ধরে পাশ-পাওয়া একটি শিশুপুত্র-জোড়ে সে এসে উপনীত হল সিংহকল মহারজনপলে। সিংহলের পিতার কাছে সে আবেদন জানায় যে, সিংহল ডাকে বিবাহ করেছে, তার পুত্রসংজনও হয়েছে ; কিন্তু প্রত্যাকর্ষনের পক্ষে বৃত্ত হওয়ার, অমঙ্গলমরী-জ্ঞানে ডাকে ভাগ করে এসেছে। এই অসহায়্য নারীর করুণ আবেদনে সিংহক পুত্রকে জেঁকে আদর্শ করলেন ডাকে গ্রহণ করতে ; কিন্তু সিংহল বখন সমস্ত সোপান কথা ব্যক্ত করে দিল, তখন ঐ ছদ্মবেশী রাক্ষসীকে তিন গৃহ থেকে দূর করে দিলেন। সরোজনে রাক্ষসী এসে আবেদন করল রাজদরবারে। এখানেও মহারাজ সিংহকেশরী হুশ হলেন তার করুণ কাহিনী শুনতে ; জেঁকে পর্যায়েন বণিক-জনজকে। এখানেও সিংহল ব্যক্ত করল তার ভয়াবহ অভিজ্ঞতা, কিন্তু মহারাজ সিংহকেশরী বিশ্বাস করলেন না তার কথা। প্রত্যাবৃত্তা ছদ্মবেশিনী সন্দ্রীকে স্থান দিলেন নিছ রাজ-অভ্যন্তরে।

সেই রাতে রাক্ষসী হত্যা করল রাজাকে। আর সেই রাতেই রাজদরবারে তাম্রশ্রীপ থেকে উড় এসেছিল রাক্ষসী রাজকুমারীর শত সহচরী। দুর্গশ্রীর হুশে দিল দুর্গান্তরবাসিনী রাজকন্যা ; সমস্ত রাত্রিব্যাপী হত্যার উলব চলল রাজ-অভ্যন্তরে।

পরদিন সকালে সংবাদ পেয়ে সিংহল আরম্ভ করল সে দুর্গ। হুশ হল সিংহলের অনুচর-দলের সঙ্গে রাক্ষসীদের। শেষ পর্যন্ত পর্যাণিত রাক্ষসীদল আকাশপথে পলায়ন করল তাম্রশ্রীপে।

শোকসন্তপ্ত সিংহকল অধিবাসীরা তখন সিংহলকেই তাদের অধিপতি করতে চাইল। বণিকপুত্র সিংহল করল—সে শসনবন্দ গ্রহণ করতে অসম্মত নয়, কিন্তু একটি শর্ত আছে। সিংহকল অধিবাসীরা সামনে জানায় তারা সিংহলের আরোপিত সকল শর্তই মেনে নিতে রাজী। তখন সিংহল বসে—তাম্রশ্রীপবাসিনী রাক্ষসীদের উপর প্রতিশোধ না মেটায় পর্যন্ত সে সিংহলেনে বসতে রাজী নয়। যদি সিংহকল অধিবাসীরা তার সাথে তাম্রশ্রীপে বৈশ্বায়া করতে সম্মত হয়, তবেই সে এ দারিদ্ৰ্য্যের গ্রহণ করতে সম্মত।

তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেল ওরা। বিরাটকার অর্ধরক্তপুত্র সেনাদলকে সাহায্যে হল। সিংহল স্বয়ং নেতৃত্ব গ্রহণ করে সে অভিযানে। সদকাগলে সিংহল এল তাম্রশ্রীপে। প্রচণ্ড হুশ হল দুই পক্ষে, কিন্তু অমিতবিরম সিংহলের শৌর্যবীর্যের কাছে নিঃশেষে পরাস্ত হল রাক্ষসীদল। সিংহল হলেন 'বিজয়-সিংহক'। রাক্ষসীদের বিতাড়িত করে তাম্রশ্রীপে উপনিবেশ স্থাপন করল আর্থ জন্মশ্রীপবাসীরা। শ্রীপের নতুন নামকরণ করা হল 'সিংহল'। মহা আড়ম্বরে অভিব্যক-উলব উপাধিপতি হল বিজয়-সিংহকেশর।

বিস্মৃত পৃথ'প্রাচীর স্তুতে এই কাহিনীটিকে হুশারিত করেছেন শিল্পী। প্রথমেই দেখছি সিংহলের প্রথম সমুদ্রযাত্রার ব্যতিক্রমেরী অলম্পদ হচ্ছে (১৭।১৪)। বিজয়-কল্লু ও কম্পাঙ্কিমদের

দিক থেকে এই পঙ্খচিত্রটি পূর্ণ-অবদান জাতকের নৌকাভূমি দৃশ্যের সঙ্গে তুলনীয়। আমার ভাে মনে হল, পূর্ণ-অবদান দৃশ্যটিতেই উন্নততর শিল্পশৈলী বিদ্যমান। সেই প্রেমীগত স্থান্যাসিক কস্পোজিসনে চৈনিক প্রভাব লক্ষ্য করছিলাম—এখানে নৌকাভূমি চিত্রটি আরও বাস্তব, কিন্তু এতে সেন বীভৎসরসের স্বহৃদ্য। বেশ করি সম্পূর্ণ কাহিনীটির বীভৎস ও রক্ত রসের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে গিয়েই শিল্পী এভাবে রূপায়িত করেছেন এই দৃশ্যটি। দেখছি, অনেক নাবিক ধরে পড়ে গেছে, অনেক মৃত্যু ভয়ঙ্কর।

পরের দৃশ্য অরক্ষণীয়ের প্রমীলারাজ্য। নাবিকেরা মোহিনীদেবী রাক্ষসীকে আতঙ্কিত গ্রহণ করছে। চিত্র—৫১-এ অমন একটি হৃদয়বশী মনোহর রাক্ষসীর চিত্র একে দিয়েছি। ঝুসে-পড়া পলোস্তাত্রা-অংশে একটি নাবিকের আশেপাশ ছিল, তার বামহস্তটি শব্দ দেখা যাচ্ছে—রাক্ষসীর বামহস্তের উপর দিয়ে ঘুরে এসেছে। রক্ষসীমূর্তির কবরীদশন রীতি লক্ষণীয়, আরও চূড়ান্ত ওর কর্ণভরণ। আর বামীর কর্ণে দুই ডিভাইসের দুটি অঙ্গলকর অঙ্গলতায় আমার নজরে পড়েছিল। ঐ কর্ণভরণের সূক্ষ্ম ডিভাইসের মাধ্যমেই শিল্পী দ্বিধারে দিয়েছেন মেয়েটি ফিলাভীয়া।—দেখছি, পাশাপাশি তিনটি খোপে তিন জোড়া মিলন-মূর্তি। শিল্পী তাই ও সামিয়ানা একে কেবলতে রেখেছেন নাবিকদের সাময়িক স্থান-সংকুলানের জন্য প্রমীলারাজ্যে ব্যাপক ব্যবস্থা করেছেন। একটি তাঁবুতে দেখছি, আশ্বেষগরনা এক মোহিনী কনিক নাবিককে চকস্পর্শে সূত্রা এগিয়ে দিচ্ছে। এমনই একটি মিলন-মহুর তাঁবুর দৃশ্য নন্দনা-স্বপ্ন এঁকে ছিলাম চিত্র—৫২-তে। তাঁবুর ভিতরের লাস্যমায়ী সন্দরী নারীর প্রকৃত-স্বপ্ন আঁকা হয়েছে তাঁবুর বাহিরে—উপর অঙ্গল। সেখানে তারা হৃদয়বশ ত্যজ্য করে রাক্ষসীকেশে হস্তার উপরে মন্দ—রক্তশানি করছে নরমাসে ভক্ষণ করছে (১৭।১৪-খ)।



চিত্র—৫১ঃ সিংহল-অবদান হৃদয়বশী  
রাক্ষসী (অবদান—XVII/12 a.) :

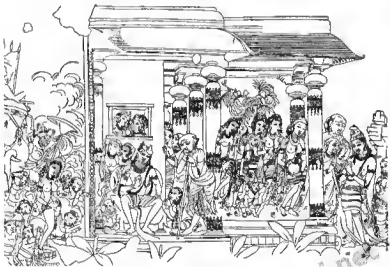
এর পরে একটি শেতবর্ণের অশ্বকে দেখা যাচ্ছে। কল্লুতা, জাতকমতে, সিংহলের উপত্যকার্ণের মূলে ছিলেন একজন শেতবর্ণের পক্ষিজাত অশ্ব—তিনি স্বয়ং বোধিসত্ত্ব। চিত্রে দেখা যাচ্ছে অশ্বরাজের গিটে নিহেল দিয়ে এসেছে সিংহকণ্ঠ জনপদে। অশ্ব থেকে অবতরণ করে সে উপকারী ভোগিত-অশ্বরাজকে প্রদান করছে (১৭।১৪-গ)।

এই দৃশ্যের দাঁকয়ে সিংহকেশরী বরবারদৃশ্য (১৭।১৪-ঘ)। এই অরক্ষণীয়ের অপরূপ চিত্রটির একটি অদৃশ্যিণি করেছিলেন শিল্পী সৈয়দ আহমেদ, এই শ্রুতাবধীর প্রারম্ভে। আরই একটি অদৃশ্যিণি এখানে সন্নিবেশিত হল (চিত্র—৫৩)। রাম-প্রাস্তে রেখাি রাক্ষসী-জননী সিংহলের স্থায় পরিচয় বহন করে রাজসভায় এগিয়ে আসলে। অপরূপা এই নারীমূর্তি—বহিঃপ্রাণের ভেনাস অথবা অর্গুরের ল্যাস্‌সের সঙ্গে তুলনীয়। ধর্মীত্রে আছে একটি প্রস্তুটিত পঙ্খের উপর, যেন তার দেহের নাই। কাম কিত্তর-কিত্তরী নানান গাম্ভীর্য বহন করে এগিয়ে আসছে—নিধান, পজ্ঞা ও পূর্ণমালা নিয়ে সে এক অশ্চর্য শোভামাত্রা। জননীকে দেখছি সম্পূর্ণভাবে ঝুসে আছেন রাজা সিংহকেশরী, তিনি আকল্‌ত্বার রূপে মন্দ। তার পাশেই মহামন্ত্রী বহিঃপ্রাণে তার বিগ্রে ধর্মীত্রে, তিনি চিন্তান্বিত, আতঙ্কপ্রসূত। গরুকে দেখছি লক্ষন রাজমহিষকে—ভীয়া নন্দনতার আবির্ভাবে হর্ষিত। আরও দাঁকয়ে দেখা যাচ্ছে



সিংহেশ্বরী নরনারীকে গ্রহণ করেছেন—নরনারী একটি অন্যতম বালকের হাত ধরে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আছে। এখানেও সেই দৃষ্টান্তভাঙ্গত মহামায়া'কে আহার জীবা হয়েছে।

কাহিনীর পরামর্শ অনুসারে এর পরবর্তী দৃশ্যটি অনেকটা দু'রে আঁকা (১৭ ১৪-৪)। এ ঘটনা সেইদিন প্রায়ঃ। চিত্রে দেখা যাচ্ছে, দু'টি নগর-ভোজনের মাঝখানে দু'দিকের প্রবেশপথ। বামদিকে প্রত্যন্ত মহারাজ সিংহেশ্বরীকে হত্যা করেছে জরাজীর্ণবাসিনী রাক্ষসী। এখানকার চিত্রগুলি নষ্ট হয়ে গেছে; কিন্তু দৃষ্টান্তে যে মহালক্ষ্মী চলেছে, তা এখনও স্পষ্ট দেখা যায়। পাশাপাশি ভিতরটি গরাক। প্রভেদকিত্তিই একটি করে রাক্ষসী ও ভিত-চারটি জরাজীর্ণবাসিনী। মহানন্দে রাজানন্দপুরোহিত নরনারীকে হত্যা করে রাক্ষসীরা আহার করছে। শিল্পী এই রক্তাক্ত দৃশ্যে পঞ্চাংগুটির আকাশকে এঁকেছেন গাঢ় লাল রঙে। অলঙ্কারের অন্য কোথাও এত



চিত্র—৪০০ সিংহেশ্বরীর নরনারী রাক্ষসীর আহার সিংহল অলঙ্কার (অবস্থান—XVII/14 ৪)।

গাঢ় লাল রঙের পঞ্চাংগুটি দেখেই বলে মনে পড়বে না। নীচে দেখা যাচ্ছে, চারটি প্রভেদের দৃশ্য। রাক্ষসীর দু'দিকের ভোজনে দুই দাঁড়িয়ে উঠে আসছে সিংহেশ্বরী, একতরফ ছাড়ে মৃত্যু কৃপাণহাতে সে অস্ত্রমুখ করেছে রাক্ষসীদের। রাক্ষসীরা শূন্যে উঠে গেছে, তাদের হাতে নরনারীর টুকরো। ভোজনের উপরে একটি শতুন, দু'দিক-চারের মাঝখানেও একটি ঘাসোড়ক, পাখী মহানন্দে আহার করছে। অগ্নি কয়েকটি কালো রক্তের রেখার টানে শিল্পী বেজনে করেকটি উজ্জ্বল কাকের চিত্র এঁকেছেন, জা মেখে মনে পড়ে জরাজীর্ণ অবস্থান অথবা শোণাল খোবের আঁকা ছবি।

নীচে দেখা যাচ্ছে শূন্য সিংহাসন।



পরবর্তী জটীর কান্না আবার চলে যেতে হবে ও-প্রান্তে ; চির গ-হ-এর নিম্নাংশে। দ্বীপ্তি গর্ভগুহার অভ্যন্তরস্থ হৃৎ পায়নে সিংহলের দ্বিতীয়ারবরের সমুদ্রদ্বারা ও সিংহল-বিহার-কাহিনী (১৭।১৪-৪)।

চিত্রটির পাঁচটি অংশ। প্রথম, সিংহকল্প গ্রামপ্রাসাদ থেকে বিহারসিংহলের সদলবলে স্থলপথে যাত্রা। দ্বিতীয়, সিংহবন্দীসে ঢৌকাযোগে অবতরণ। তৃতীয়, হৃৎশূন্য। চতুর্থ, রাক্ষসীর পরাজয় ও আত্ম-সমর্পণ, এবং পঞ্চম, বিহারী বিহারসিংহলের অভিব্যক্তি। এই পাঁচটি দৃশ্যের স্থান-কাল বিভাজন—কিন্তু দিল্পী কোন বডি-চিহ্নের ব্যবহারে দৃশ্যগুণী নির্দেশ করেননি। এই শব্দ দৃশ্যের কল্পোদ্ভবনের মাধ্যমে কল্পোদ্ভবন একটি মাত্রার আকারে গড়েছেন তিনি। যেন শেষ অঙ্কের বিহারমাল্য তিনি পরিচয় দিতে চান বিহারী সিংহলের কাছে। মোঘে মেঘে যেমন মিলে যায়, স্থানে স্থানে যেমন মিলে যায়, অথবা আধুনিক চলচ্চিত্রে ভিন্নভ-প্রয়োগ-পদ্ধতিতে যেমন এক দৃশ্য অপর দৃশ্যে নিঃশেষে মিলে যায়, এখানেও দিল্পী সেইভাবে এই পাঁচটি দৃশ্যকে মিশিয়ে দিয়েছেন মাত্রার আকারে।

প্রথমে উপরে দেখছি (চিত্র—৫৪) একটি ভৌকল্পের অভ্যন্তর করে হস্তিপুটে বিহার-অভিযানে যাত্রা করছে সিংহল। রাক্ষসী, এবার প্রথম তার মাথায় রাজমুদ্রা। দৃশ্যে দৃশ্যে সময়-সঞ্চিত, কিন্তু তাদের হাতে রয়েছে চামর—অর্থাৎ সিংহলের নেতৃত্ব যেন নিঃসন্দেহে তারা। সিংহলের মাথায় উপর রাজমুদ্রা—তার দ্বীপ্তি কিন্তু তির্যক্-ভালি—পূর্ববর্তী রাক্ষসী সজ্জায়-দৃশ্যের কথা যেন সে ভুলতে পারছে না। সিংহলের শেষভঙ্গী পাশ্চাত্যী দৃশ্যের স্বর্ণের হস্তীর শব্দ নিঃশব্দে আবির্ভাব করছে—যেন তারাও আসন্ন সজ্জায়ের পূর্বে প্রীতি-সম্ভাষণ বিনিময় করছে। সেপে চলেছে একদল পদাতিক সৈন্য, তাদের হাতে মূল কুশাণ, ভল্ল ও দীর্ঘাণ্য চালিকা। পূর্বদৃশ্যের মধ্যে এ দৃশ্যের বিভ্রান্তা যোগেতে প্রথমেই আঁকা হয়েছে নগর-ভৌকল্পের। এই সময়ভিমান দৃশ্যের সেপে কিংবদন্তি-জাতকের একটি দৃশ্যের (বিহার ও পূর্বাণ্য ইন্দ্রপ্রস্থ ভাগ) সাদৃশ্য রাক্ষসী।

দ্বিতীয় দৃশ্য ওর নীচে—সৈন্যদল ভৌকল্পে অবতরণ করছে। যদিও প্রায়শ কোন বডি-চিহ্ন নেই, তবু পূর্বদৃশ্যের ফিলগুনি থেকে একটু কাঁচ দিয়ে এ দৃশ্যের বিহার-বস্তু আঁকা হয়েছে, যেন শব্দে স্থানটুকুই সেই বডি-চিহ্ন। দেখছি, তিনটি নৌকা। সম্মুখভাগে সেই তিনটি বণহস্তী, পিছনে অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী। হস্তীর তুলনার নৌকাগুনি ছোট সন্দেহ নেই।

তৃতীয় দৃশ্যে দেখছি, দৃশ্যকে ঘোরতর হৃৎ দেখে গেছে। এ ঘটনা অবতরণের পর ; কারণ, রাক্ষসীরা ও জন্মদ্বীপবাসীরা এখন হাতাহাতি হৃৎ করছে।

কামানুভবিকভাবে চতুর্থ দৃশ্য একেবারে নীচে। সেখানে দেখছি, রাক্ষসীরা হৃৎকর কমা ভিক্ষা চাইছে অথবা অন্তর্ভোগ করে দৃষ্ট হাত কুঠিতে রেখেছে।

পঞ্চম ও শেষ দৃশ্য মাত্রার আকারে সাজানো কল্পোদ্ভবনটির একেবারে অপর পারে। এ দৃশ্যটির পরিবর্তনের সময় দিল্পী একটি বডি-চিহ্নের প্রয়োজন অনিবার্যভাবে উপলব্ধি করেছেন। কারণ, হৃৎ স্থান-কাল নয়, হৃৎ ও বীজসংস থেকে এবার অন্য রূপের পরিবেশন করতে হবে তাঁকে। জই রাক্ষসীপুত্রীর একসার তামুর (অভিযানকারী) সৈন্যদলের আগমন-সংবাদে যা সমুদ্রতীরে নির্ধাণ করিয়েছিল রাক্ষসীরা) বডি-চিহ্ন একে তার ওপরে চিত্রিত করেছেন বিহারসিংহলের অভিব্যক্তি দ্বারা। সিংহল সিংহাসনে উপবিষ্ট। পুরবাসীরা গান গাইছে, বাজাচ্ছে, পুরকামিনীরা অভিব্যক্তি-ব্যাপ্তে স্থান করছে বিহারসিংহলকে (১৭।১৪-৪)।

এরপর পুনরায় একটি গীর্ষ জাতক-কাহিনী হৃৎসোম জাতক। এই অল্পান্ত্র প্রাচীর-চিত্রটির একটি অংশ এখানে চিত্র—৫৫-তে পরিবেশিত করা গেল। কাহিনীর হৃৎ হচ্ছে

সর্বানন্দ অংশে। দক্ষিণ দিকে প্রথমেই একটি প্রাসাদ-ভেদন। দেখছি, বারানসীরাজ সুদাস চলেছেন একটি শ্রেষ্ঠ অশ্বশৃঙ্খ, মৃগয়ায়। সঙ্গে একজন অশ্বাবোহী সুভদ্রাসে ভারত দেহরক্ষী এবং দশজন পদাতিক। রাজার হস্তার ছন্দারী রাজহুটে বসে আছে। কিছু শিকারী কুতূহল আছে দলে। এই মৃগয়ালয়ের সম্মুখে একটি বনা শৃকর এবং একটি হরিণকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।...নিচের সারির বামপ্রান্তে এগিয়ে এসে দেখছি, এবার



চিত্র-৪৪০: সুভদ্রাসে ভারত (সংস্করণ-XVII/20)।

রাজা একাকী চলেছেন শিকারে। অশ্বের দ্রুত আশঙ্কিত ছন্দ বা 'স্রোতপাং-পোজ' প্রমাণ দেয় কেন এবার তিনি একা। এবার তাঁর মাঝার হাফেস্ত নাই—কারণ ছন্দারী দ্রুত-শব্দমান অশ্বের সঙ্গে ভাল হাফেস্ত পারছে না। রাজার সম্মুখে একটি চিহ্নিত হরিণ।

কাহিনীর সূত্র ধরে এবার উপরের দিকে উঠতে হবে। সেখানি, যুগান্ত-প্রাপ্ত রাজ্যে  
চূপায়ার নিদ্রিত, একটি সিংহী রাজ্যের গনসংলগ্ন করছে, রাজ্যের শেষত অংশটির অতশঙ্কভাজিত  
দৃষ্টি লক্ষ্য করবার মতো।... তার উপরের প্যানেলে দেখছি, রাজ্যে উঠে আসছেন, সিংহী পিছনে  
যিরে আরে বটে, কিন্তু বাড় বাকিরে রাজ্যকে দেখছে—যাকে বলে বিহসি পালতি নেহাতি।  
কতৃজ্ঞ জাতি-কাহিনী অনুসারে, অসমিতকরম কাশীরাজকে দেখে কনজারিণী সিংহীর মনে  
অনুরাগ সঞ্চারিত হয়েছিল, রাজ্য তাকে সেই বিঘ্নে অরুণা গান্ধর্বমতে বিবাহ করেন এবং  
তাদের একটি পুত্রসন্তান হয়।

অলৌকিক কাণ্ডকারখানা। কলতে পারেন—আবারে গল্প। তবু কল, ‘গল্পের-বাড়’ যাচ্ছে  
উঠলে আপতি করবেন না—এ অলৌকিক কাণ্ডকারখানা যদি মনে নিতে পারেন তবে দেখবেন,  
এটি একটি রসোত্তীর্ণ ছোট গল্প। মানবিক আবেগের ঘাটতি নেই এ কাহিনীতে।

এখিরে যান উপরের দিকে, দেখবেন এবার শোভাযাত্রা বাম থেকে দাঁকনে চলেছে, অর্থাৎ  
রাজ্যে এবার অলম্ব্যুতম আগ্রহ করে রাজধানীতে ফিরছেন। হস্তী-অশ্বের শোভাযাত্রার মধ্যে পারে  
পারে এবার ডিগের উপর সারি ধরে দাঁকন দিকে এগিয়ে যান, নগর-ভোরণ অতিভ্রম করে  
কারণসীতে আসুন। দেখুন, পথের উপরে ফুল ছড়ানো, দুজারে নিশান—রাজ্য নববিবাহিতা  
সিংহী-মহিষীকে নিজ শোভাযাত্রা করে ফিরছেন। রাজপথের মানুষজন ভীত, সন্দেহিত। ওরা  
মনে হচ্ছে তার দিগে এসে আছে পথের দুজারে বাড়ির ছায়ে। হু-একটি পটপটন যেন ইশ্টিত  
করছে সন্দেহিত দাঁকন। আছে শিকড়লে, রাজপথের সমতলে নয়।

এ দৃশ্যের শেষপ্রান্তে একটি ভোরলম্ব্য। সেই স্বতীতিহের ওপারে (বস্তুতঃ চিত্র—৩৫-র  
কাহিনী) রাজসভার দৃশ্য... রাজ্যে শিশুরোড়ে সিংহাসনে... পদতলে সিংহী... গাঙ্গে মস্তী, সভ্য  
সকলেই সন্দেহিত। এ ছোট্ট প্রায় অলম্ব্যুতই করা চলে। তার পরে দেখছি রাজকুমারকে পদ-  
বিহার্য শিক্ত করে তোলা হচ্ছে। একটি কবলী হুকে লম্বা শ্মির করে রাজপথে আসে  
হুত্বছেন। তার পরের দৃশ্যটি রাজকুমারের পাঠশালায়। সেটি সম্পূর্ণ বিনম্র।

সুদাসের পুত্র সৌদাস। হুবারাজ হয়ে বয়ঃপ্রাপ্ত হলেন। রাজ্য সুদাসের স্বর্ণারোহণের  
পর সৌদাসই হলেন কাশীশ্বর। বিধির ক্রিয়ানে তাঁর মিত্র চাঁদ, শৈব সত্তা। তাঁর অকৃত  
মানবের, কিন্তু অশ্বত্থের সোপাপনে হু-করারিত আছে বন সিংহীর প্রভাব। সর্বাধিক-  
পারদর্শম হয়ে উঠলেন তিনি, তবু রাজ্যের মনে হয়—তাঁর জন্মরহস্যের কথা যারা জানে তারা  
অভ্যন্তরে হু-সে, গোপনে হু-কি কান্ডকারি করে—হাজার হোক, লোকটা জানোয়ার তো! সৌদাস  
সর্বাধিক এদিক হীনমন্ত্যের উদ্দেশ্যে উঠুক চোঁটা করতল, ছোট কথা জানে নিতেন না।

একদিন মহারাজ রাজসভায় তাঁর মনোবাসনার কথা ঘোষণা করলেন, আসানের বললেন,  
চল, সবাই মিলে মৃগয়ায় যাই।

একজন রাজ-আমতা কালো, উত্তম প্রসঙ্গ মহারাজ! কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কোন্ অঙ্গুলে পিকারে  
যাব আমরা? বেগানে হরিণ, শশক বা কবাহ প্রণয় বার—নাহি মহারাজ তাঁর শুল্কপানে পিতার  
মত গভীর অরুণা সিংহীর সম্মানে যেতে ইচ্ছুক?

আপাতদৃষ্টিতে প্রশ্নটি সঙ্গল; কিন্তু সৌদাসের নজর হু-কি সভ্য সকলের চোখে-হু-সে  
কৌতুক উপড়ে পড়বে। তাঁর মন্তব্য হল, সর্বাধিক-পারদর্শম সত্তাও কোনও মানবী তাঁর প্রতি  
আজও অকৃত হু-নি! মহারাজ বিনা বাবায়ের সভ্যকক্ষ জগল করে গেলেন।

এইভাবে অকৃত-পদে সৌদাস যখন নিজ পীড়ন সহ্য করছেন তখন এক অশ্রুত ঘটনা ঘটল।  
শিশুরোড়ে থেকেই সৌদাস আশ্রিত-বাদ্য পছন্দ করেন। ছাগ-মৃগ-বা-ই প্রভৃতির হালে তাঁকে  
নিজ পরিবেশন করা হত। সৌদাস রাজ-পাথকের অনবধানতায় রাজ্যের আরো প্রশাসনের কয়েকটি  
পালিত কুতুর খেতে ফেলে। ভীত পায়ক তৎক্ষণাৎ বাজারে দৌড়ে যায়, কিন্তু বহু আয়সেও  
মাংস সংগ্রহ করতে পারে না। আতশঙ্কভাজিত পাচক নিহু-সার হয়ে কথামুখে সন্দেহিত একটি



বন্দীর মৃত্যুসময়ের জন্য থেকে কিছু ভাল কেটে নিয়ে এসে সৈনিক মহারাজকে খেতে দিল। সৈনিক অহাঙ্গনেষ্ট আঁত পৰিতুষ্ট হয়ে পাচনকে গ্রহণ করলেন, এটা কিসের মাংস? পাচক প্রথমটা কিছুতেই স্বীকার করলে না। শেষে মহারাজের কাছে অভয়বাণী গেয়ে সে সব কথা স্বীকার করে ফেলল। সৈনিক আনন্দে শূনে কললেন, এ কথা সেন যোগেন থাকে; আর সেন, কাল থেকে অমাকে এ মাংসই রেসে খাইও।

এর পর শূদ্র হল নতুন অন্ন্যায়। গোপনে। কায়কায়দা নরমাংসের নিত্য ভোগান দেওয়া কষ্টকর হয়ে পড়ল। কলে রাজনৈতিককাৰীরা নানান পন্থায় সবকয়ই বন্ধ্যা রাখার চেষ্টা করতে থাকে। শূদ্র সবল মানব অন্তর্ভুক্ত হয়ে ব্যাব্যর অন্তর্ভুক্ত সংবাদ নিতাই শোনা যায়। গৃহের গুপ্ত গেল, প্রাসাদের ভিতর একটি নরমাংসভুক্ত রান্নাঘরের আবিষ্কার হয়েছিল। মহারাজ নিত্য এ অভিবোধে শোনে, প্রাসাদের প্রতিশ্রুতি সেন এ রান্নাঘরকে তিনি খুঁজে বার করলেন—কিন্তু কোন কিছুইই শূদ্রায়া হয় না।

চিত্র—০০-০৩ স্বর্ণনিধন সারির চিত্র উপরেই দেখা যাচ্ছে কীভাবে রাজকৃত্যের নরমাংসের সবকয়ই অক্ষয় রাখতে। নিম্নলিখিত প্রহরী একজন হতভাগকে হত্যা করছে—তার পাশে দুজন ভৃত্য একজন মানবকে কান্ডুমে নিয়ে যাচ্ছে। এ চিত্রের উপরেই দেখা যাচ্ছে রাজসরকারের দৃশ্য। মহারাজ সৌদাস সিংহাসনে আসীন। তাঁর সম্মুখে নিম্ন-আসনে সেনাপতি কায়কায়ি বসে আছেন। প্রাসাদের সন্মুখের এসেছে রাজার কাছে নালিশ জানাতে। রাজসভার পিছন দিকে অশ্বাশ্ব। সেখানে সারি সারি চরটি ঘোড়া।

কিন্তু পাশ চিবকাল ছাপা থাকে না। কায়কায়ি শেষ পর্যন্ত আবিষ্কার করে ফেলল রাজসভার সেই নরমাংসভুক্ত রান্নাঘরকে।

4237

ফলে, রাজার-প্রজায় শূদ্র বেশ গেল—সৌদাস একটি সোপানের উপর দাঁড়িয়ে মৃত্যুপাথে আত্মরক্ষা করছে। শেষ পর্যন্ত কিন্তু তাকে রাজ্য ত্যাগ করে বনে চলে যেতে হয়।

এর পর সৈনিকের ভীকন শূদ্র হল নতুনভাবে। উত্তম্বর নরমাংসভুক্ত রান্নাঘরের মতো এক গভীর অরণ্যে সে বাস করতে থাকে। পঞ্চাবাসীর হত্যা করে নির্বিচারে। সে সেন মনুসংসমারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে।

খনিজচরের ইন্দ্রপ্রস্থের রাজা শূতসোম এ গভীর অরণ্যে চলেছিলেন সন্ন্যাসী নলের আশ্রমে। রাজা শূতসোম কনুজের জ্যোতিষ, বার্মিক রাজর্ষি তিনি। শিশুপী তাঁকে অনুসরণ করছেন ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে। শূতসোম সর্বোত্তম তাঁকে জানিয়েছিলেন—এ অরণ্যে বাস করে একজন নরমাংসভুক্ত রান্নাঘর। কিন্তু কারও নিকট কানে তোলে ননি শূতসোম। তিনি বেরিয়েছিলেন কিছু নলের আশ্রমের উপস্থিতি। কিছু নলের গৃহে ছিলেন মহামতি বৃষ্ণ-কনুজ। শূতসোম জানতেন যে, মহাকনুজের মুখ-নিঃসৃত চারটি শ্লোক একমাত্র নন্দই জানতেন। সেই মন মনকর্ণে শূদ্রের উদ্দেশ্যে চলেছিলেন তিনি, কারও নিকটে শোনে ননি।

কায়কায়ি গভীর অরণ্যে তাঁর পথ রোধ করে দাঁড়ায় সৌদাস। শূতসোম বুঝতে পারেন, এই সেই রান্নাঘর; বুঝতে পারেন এর হাতে নিশ্চয় সেই। সৌদাস খসে পড়ে অশূতসোম যাত্রা শূদ্র করেছিল পার্শ্বকর। অথ তেমন কী নলের সৌদাস।

শূতসোমের ঘু, চোখ অন্ধ-আঁত হয়ে গুটে।

নিশ্চয়ই সৌদাস হল—অশূতসোম এবার হেসেই বলেন :

চক্ষু মার্জনা করে শূতসোম এবার হেসেই বলেন :

কালি না নিশেই করে

কিছু দায়দুত মেহ

করানো বাস করে কীর না কনুজ ;

সামান্য প্রাণিত

শূতসোম মর্মে আমি

অনুগ্রহ স্বাক্ষরে করি নিজস্ব।

স্বদেশের চিরজা ঘরে

শুনিব কণ্ঠস্বর মত

রাহুলের কাছে এই ছিল অলপীকায়

হল সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ

পরিজ্ঞা ভোগের হৃদয়

এই বুঝে করে বাদুঘর ৪ ০০ ৪\*

সৌদাস কৌতুকবোধ করে, বলে—তাই নাকি? মন্দাঘর্ষে শুনলে আর মৃত্যুসময়ে কান্দবে না তুমি?

সুতসোম বলেন, না।

কম্পিত, রাহুলের ক্ষমিবৃত্তির কন্ড আচ্ছাদনে তাঁর আগন্তি সেই; কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে তিনি ঐ অপ্রতাপপূর্ব মন্দাচ্যুতের শব্দে সেতে পারলেন না বলেই ক্ষম। সৌদাসকে তিনি অনুরোধ করলেন, তাঁকে সাময়িক ঘুরে দেবার জন্য। প্রতিশ্রুতি দিলেন, মন্দাচ্যুতের প্রবণ করে তিনি আবার ফিরে আসবেন সৌদাসের অত্যাশঙ্ক অবাসে, তার ক্ষমিবৃত্তির জন্য।

হা-হা করে হেসে ওঠে সৌদাস। বলে, একবার পালাবার সুযোগ পেলে কি কেউ নিশ্চিত মৃত্যুর মধ্যে আবার ফিরে আসে?

সুতসোম অস্বস্তি হয়ে বলেন—কী কলহ তুমি? সামান্য প্রাণের চেয়ে মৃত্যুর কথা বড় নয়?

সৌদাস বলে—নিশ্চয় নয়। মানদুকে চিন্তে থাকি সেই আমার।

সুতসোম গম্ভীরকণ্ঠে বলেন—নরমায়েজোজী বলে তোমাকে আমি বুঝা করিনি সিংহী-তনয় সৌদাস, কারণ, আমি জানি সেজন্য দারী তোমার জন্ম-ইতিহাস। যিহ্নে অরণ্যক প্রাণীর রক্ত তোমার বমনীতে বইছে বলেই তোমারে চাঁদ্রের এই বিকার—তোমার ও ব্যবহার সিংহীশূড়ের উপদ্রুত ব্যবহার; কিন্তু হে কাশীরাজতনয় সৌদাস, এইমাত্র তুমি যে কথা বললে—সত্যের চেয়ে মানদুকের প্রাণ বড়, এ তো তোমার কাশীরাজতনয়ের মতো কথা হল না। মানদুকের প্রকৃত পরিচয় তো তুমি আজও পছন্নি জাহ্নবে।

কোন ঘেন খটকা লাগে সৌদাসের। নরমায়ে তর আসক্তির কথা জানতে পেরে সমগ্র কাশীরানী প্রজাবল তর বিরুদ্ধে জন্মধাক্ক করছিল—তাকে সিংহাসনচ্যুত করেছে তারা। পোতা মন্দুচ-সমাজের বিরুদ্ধেই প্রচণ্ড অভিমান তর; অকণ্ঠ্য নরমায়েজোজীরূপে সে এইজন্যই প্রতিশোধ নিতে উদ্যত। কিন্তু এলোকটি যে আজ নতুন কথা শোনায়ছে। এ কাহ্নে, সেজন্য সৌদাসকে সে বুঝা করে না। প্রচণ্ড কৌতুহল হল সৌদাসের। বললে—বেশ, মানদুকের প্রকৃত পরিচয় পাওয়ার জন্য না হয় একটু ক্ষমিমই করা যাক। বাও, হুত তুমি!

সুতসোম চলে গেলেন ভিক্স নৃশ্বর কুটীরে। মহানন্দে ইন্দ্রপ্রস্থরাজকে আশ্রমে স্থান দিলেন ভিক্স নন্দ। তাঁকে শোনালেন বৃন্দ-কণ্ঠস্বরের সেই অপ্রতাপপূর্ব মন্দাচ্যুতের। পরম তৃপ্ত পেলেন সুতসোম, মৃত্যুর জন্য আর খেদ রইল না তার। বধ্যপ্রতিশ্রুতে একাকী ফিরে এসেন সৌদাসের অত্যা-অবাসে। তাঁকে এভাবে ফিরে আসতে দেখে স্তম্ভিত হয়ে পেল সৌদাস; বললে—আচ্ছব! তুমি প্রাণ বিতে ফিরে এসেছ?

মহামারিক সুতসোম হেসে বললেন—আপা করি, এতদিনে মানদুকের প্রকৃত পরিচয় বুঝতে পেরেছি তুমি, সিংহীতনয় সৌদাস। নরমায়ে তক্ষণ যদি সিংহীশূড়ের জন্মদায় মন্দোর হয়, তবে সত্যের রক্ষার্থে প্রাণদানে মানদুকেরও আছে মন্দরত অধিকার।

ইন্দ্রপ্রস্থরাজের মহান্দুচবত্য বিহ্বল হয়ে পড়ে সৌদাস। বসন্ত-রাজার পুত্র, সে—একদিন কলত সিংহাসনে, রাজার পরত রাজকন্যকুটী। স্বীকৃতির হাত বুটি ধরে বললে—ইন্দ্রপ্রস্থ-অধিপতি! কীকথাতেই মহাত্ম অধিকার আছে। মহাত্মের পণ্ডিত হারতো আমিও দেখাতে পারতাম একদিন, কিন্তু তোমরা আমার জন্মের ইতিহাসটা যে ছুঁতে পারলে না—শুধু ঘৃণাই করলে আমাকে। তাই আমি আজ নরমায়েজুক রাজস।

সুতসোম বলেন—জন্মের জন্য কেউ দারী নয়। কর্মই তার অধিকার। তুমি ক্ষমিবৃত্তি কর সিংহীতনয়, আমি প্রস্থত।

\* হল পাণ্ডি-রাজের স্ত্রীশ্রমদন্ত দেব-কৃত অনুদান।

সৌন্দর্য বলে—মানবীতনের ইন্দ্রপ্রস্থরাজ, তুমিও এতদিন জানতে না সিংহীশিশুর প্রকৃত পরিচয়। অগাধ কঠি, তুমিও এবার সিংহীতনের প্রকৃত পরিচয়টা পাবে। তেজকে হত্যা করব না আমি। তার প্রতিশোধের আশাকে শৃঙ্গ জানিয়ে দাও বৃন্দ-কশাশের কী বাণী মূনে এসে মৃত্যুকণকেও ভাঙে করেছে তুমি।

সেই বাণী প্রবণ করে সৌন্দর্য সন্ধ্যার অন্তিম সুরে পড়ে।

শিবায় গ্রহণ করে রাজর্ষি মৃত্যুসোমের!

তাই বলছিলেন—মানুষের ঠোঙে সিংহীর গর্ভে সন্তানে উৎসাহের অসামান্য কণ্ঠস্বর যদি গল্পের খাতকের একবার মেনে নিতে পারেন তাহলে এ ছোট গল্পটিকে রসোত্তীর্ণরূপেই পাবেন। জাতককার তার রচনাপ্রণীতে এমন বিভিন্ন ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেছেন যে, পাঠককে বারে বারে ধমক দাঁড়িয়ে পড়তে হচ্ছে—জাবতে হচ্ছে সৌন্দর্যের চরিত্রের রসমানিত্যের জন্য বস্তুতঃ কে হারী? সে কি শৃঙ্গ খট্টা পরুপার পিকার? নারকের চরিত্রটি তিনি খড়ির সোলাবের মত বুলিচ্ছেন—একদিকে তার পিতার ঝাঁপ, মহা, শিবসংঘাত বৃদ্ধ চরিত্র, অপরদিকে তার রক্ত ধারার প্রজব। সবচেয়ে বড় কথা—যবনিকাখাতের পূর্বসূর্যের জাতককার বোঝিয়েছেন কীভাবে সন্ধ্যা পাশবিকতার ভিতর থেকে মানবিকতাকে উদ্ধার করতে পারে।

অতঃপরে পশ্চিমে প্রান্তরে আছে বৃন্দারতন একটি সমাপিকা-চিহ্ন (চিত্র-৫৬)। ঠিক সমাপিকাটির অবস্থা একে কলা উচিত নয়; কারণ, এতেও আছে তিনটি অংশ। অথবা তিনটি শব্দ। এ চিহ্নটি কয়েকটি ভাষায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ, অজ্ঞাতের আঁত অঙ্গসংঘাত চিহ্নই অবশিষ্ট আছে, যাতে রক্ত রয়েছে জটিল। এটি তার একটি। সহস্র বছর পরেও প্রায় প্রত্যেকটি রেখা স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়, যদিও রক্তের ঠোঙালা অনেকটা স্থান হয়ে এসেছে। তবু রেখার কারিমদী, যাকে বলে 'শেন্সিটিভিটি'—তার চরম ঠোঙালা এখানে দেখতে পাবেন। বিবর্তীয়তঃ, এই চিহ্নটিতে সিম্পী বৃন্দার ভায়তের, বস্তুতঃ এ প্রাচ্যক্ষেত্রে, বিভিন্ন জাতের চিহ্ন একত্রিত। বৌদ্ধ ধর্ম যে সমস্ত প্রাচ্যরাজ্যের সম্পদ, সে সমস্ত এ-চিহ্নে সোজা। দ্বিবে আর নিচে মিলিয়ে মিলিয়ে-র বৃন্দার মহামানবের সাধারণতঃ তরঙ্গোচ্ছ্বাস এ আবেশে স্থান পাতলে শৃঙ্গ পড়েন। তৃতীয়তঃ মিলানের একটি মনস্তাত্ত্বিক নীতি গ্যাস্কেসেতে পেওয়েলে জীবা লেমনার্গো-র বিখ্যাত চিহ্ন 'স্যান্টোপার'-এর কল্যাণে যেমন বীশুজীপের সবকটি শিখাসম্মত প্রত্যেক দেখতে পায় খ্রীষ্টান-গণ—এ চিহ্নটিতে তেমন বৃন্দসেবের ব্যবতীয় প্রিয় শিখাসম্মত ভাষায় বৃন্দকে দেখতে পান বৌদ্ধরা।

বৃন্দসেবের জীবনীতে আমরা জেনেছি যে, তিনি যখন তার আভির্ভাবের প্রত্যয়ে ভু-ভারত প্রদক্ষিণ করছেন, তখন স্বর্ণবাসিনী তার গর্ভাধারী জননী মারায়েবীর মনে বৃন্দ হঠাৎ ছিল তিনি পুত্রের মৃৎ-নিরুপ্ত বাণী মূনে বেতে পারেননি বলে। বৃন্দ-জননী এই মারায়েবীর কথা জানতে পেরে স্বর্ণ থেকে যেবারা শর (ইন্দ্র), রক্তা প্রকৃতি মর্ত্যে নেমে আসেন বৃন্দসেবের স্বর্ণের অভ্যন্তর জানাতে। খোঁজবৃন্দ সশরীরে স্বর্ণে গিয়ে আভিভাবের বাধী প্রদর্শন করতে সম্মত হলেন। সেখানে তিনি ব্যবতীয় মেয়েবীর উপস্থিতিতে জননীকে স্বর্ণমের মূলকথা শুনিয়ে আসেন।

স্বর্ণ থেকে অবরোহণ করে বৃন্দসেব দেখতে পেলেন, ষাটতীর পার্শ্বের মূর্তি এবং বৌদ্ধ-প্রধানরা সবচেয়ে হঠাৎ করে সন্ধ্যা জানাতে। সেই সভার মহাভক্ত, সারিগুরুকে লোক-চক্ষুর সম্মুখে মহাঅধঃপাশে সূপ্রতিষ্ঠিত করতে তিনি কয়েকটি প্রথম করেন। তিনি জানতেন, মহাজাননী সারিগুরে এ প্রদর্শনের উত্তর দিতে পারবেন। তার প্রথম প্রশ্নটি ছিল—কতুর সংজ্ঞা কি? সারিগুরে নিভুল উত্তর ছিলেন। তখন আরও কতিন প্রশ্ন করতে থাকেন বৃন্দসেব। একে একে সব প্রশ্নের নিভুল উত্তর দান করে এই দ্বিবি সারিগুরে মহাঅধঃপাশে বৌদ্ধ ধর্মে স্বীকৃতি পান।

শিল্পী এই ঘটনাকে অবলম্বনে এখনে একটি বৃহৎ চিত্র আঁকছেন। আগেই বলেছি, তার তিনটি স্তর। উপরে স্বর্ণ বৃন্দেব ফর্ম প্রচার করছেন। মিতার স্তরে তিনি স্বর্ণ থেকে নেমে আসছেন। ভূতীর ও শেব স্তরে তিনি সারিগুকে পরীক্ষা করছেন (১৭।২২)।

প্রথম স্তরে দেখা যাচ্ছে, বৃন্দেব একটি সিঁহাসনে আসীন। তাঁর বামদিকে বসে আছেন বেকম এক স্বর্ণগত মহিষা পুন্ড্রায়ার ধলা। তাঁর দক্ষিণে মারগেবসমেত দেবীরা বসেছেন। এখনে স্বর্ণের পুন্ড্রায়াদের মধ্যে একটি বিশেষ ছুঁতি দেখতে না গেলে আমি কিন্তু হতাশ হয়েছিলাম। আমার খুব আশা ছিল, শিল্পী শম্ভু-সমন্বিত একটি বৃন্দেব মুখ্যকৃতি এখনে এঁকে গেছেন, যোড়শ গুহার ১৬।২-ক চিত্রটি স্মরণ করে। না, স্বর্ণের কবি অনিতের আকৃতি আমি খুঁজে পাইনি বৃন্দেবের বামে (চিত্র—১৬-এ এই অংশটি আঁকা হয়নি)।

মধ্যখানে দেখছি, তুখিত স্বর্ণ থেকে নেমে আসছেন বৃন্দেব। তাঁর মাথা রয়েছে আরও করেকন স্বর্ণের সহচর। বেশ ক'রি, স্বর্ণ থেকে নিম্নেরে মূর্তিতে ঠিক এসে শেষ প্রস্থ্য নিবেশন করছেন। এখনে লক্ষণীয়, সবক'রটি কিগর-ই যেন ভারহীন—যেন এ তাঁদের শূন্য শরীর নয়, যেন বাতাসে ভাসছেন তাঁরা। পঞ্চদশ শতাব্দীর ইটালীর চিত্রের পেরুজানো-র বিখ্যাত চিত্র 'ক্রিস্টের শিষ্যত্বসূচক'—এ যেমন মনে হয়, কিগরগুণি মনুষ্যকৃতি হওয়া সত্ত্বেও কেমন যেন অপার্থিব, ভারহীন—এখানেও বৃন্দেব ও তাঁর সহচরদের তেমনই মনে হয়। স্বর্ণ থেকে বৃন্দেবের অবতরণের এই বিশ্ব-বস্তুটি নিয়ে সচিহ্ন উত্তর-তোরণস্থের পশ্চিম দিকস্থ স্তম্ভের সর্বোচ্চ প্রান্তেরে একটি ভাস্কর্য আছে। সেখানে শিল্পী তিনটি ধাপ এঁকেছিলেন—এখানে দেখছি মাত্র পাঁচটি ধাপ দেখিয়েই ইঙ্গিতে গ্রিশ-সোপান দেখানো হয়েছে। লক্ষণীয়, পাঁচটি ধাপের মধ্যে একমাত্র বেঁটিতে বৃন্দেবের পদাধি পড়ে আছেন, সেটিতেই লক্ষ্য-কাটা আছে। কিন্তু তা তো হয় না। সিঁড়ির সব ধাপেই তো একই অলম্বকরণ থাকার কথা। প্রথমটি সপাত—বাস্তবিক-হিসাবে আমাকে স্মীকার করতেই হবে—এমন হওয়ার কথা নয়। সব ক'রটি ধাপেই একই রকম অলম্বকরণ থাকার কথা। এই আপাত-বৈসাম্যের ব্যাখ্যা দিতে গেলে আপনাদের একটি গল্প শোনাতে হয় :

নাচটা ঠিক মনে পড়বে না—যেহেতু ইয়োজ-কাঁথ গোষ্ঠীসমূহের জীবনের একটি ঘটনা। ক'বি তখন শুলের হাত। পাঠাপুস্তকে কইবেল-এর একটি অংশ ছিল। প্রভু বীশু এসেছেন মাথার কাছে, সারমাশের নিমগ্ন রাখতে। হঠাৎ প্রভু লক্ষ্য করলেন, পৃথিব্যামনী যেন কিছু অনমনা, কিস্তি। প্রশ্ন করে জানতে পারলেন—ভাঁড়ারে মন কুঁড়িয়ে গেছে, লম্বা নিম্নলিখিতরা তখনও পানীয় চাইছেন। প্রভু মাথাকে কালেন, মন কুঁড়িয়ে যাবে কেন? এ তে এক জায়গা ভর্তি মন রয়েছে। মাথার জবাবে বলেন, আরে না প্রভু, এ জায়গা মন নেই, আছে জল। প্রভু বলেন, কই, জলনাটা খেলে তো। মাথার জলপাত্রের ঢাকনাটা খুলে গিলেন। বীশু উকি মেয়ে মেয়ে বললেন, যা ভেবেছি! ওটা জল নয়, মন! দেখ ভূমি—

মাথার সন্ধিক্ষে দেখেন জলপাত্র প্রকাণ্ড পাটের রুখে উৎকৃষ্ট মন। ক'রি গোষ্ঠীসমূহের মাটেরমশাই হাতের প্রস্থ্য গিলেন—এ অলৌকিক কাণ্ডটির ব্যাখ্যা করতে হবে। জল কেন, কীভাবে উৎকৃষ্ট আসবে রূপান্তরিত হল। গোষ্ঠীসমূহের সহপাঠীরা মেতু-ম, পাতা ধরে খাদ্য লিখন—প্রভু বীশুর অলৌকিক ক্ষমতার কথা, মাথার প্রতি তাঁর স্নেহ, শ্রুত উপলব্ধি বুদ্ধি ও মাথাকে অপমান থেকে বাঁচায়ের প্রয়াস—ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এ প্রসঙ্গের লক্ষ্যে গেলভীক্ষ একটি মাত্র পর্যন্তে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যাটি দিয়েছিলেন, প্রকৃত কবি-সাহিত্যিকের মত। তাঁর সেই এক লাইনের লক্ষ্যেই তিনি সবসময় বেশ নব্বই শেরে-ছিলেন। বলে গেলভীক্ষ লক্ষ্যে লিখেছেন "—The Water saw its Master, and blushed!"

'Blush'-এর ব্যঙ্গ্য নেই, তাই ওটা অনুবাদ করা যায় না।

বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে হলে এখানেও করতে হবে—এ সোপানপ্রণীর কোনটিতেই বাস্তবে





কোন অলঙ্কার ছিল না, প্রভুর চরণপদ্মপাতে ঐ বিশেষ ধাপটি রোমাঙ্কিত-আলিঙ্গনে শিহরিত হয়েছে মাত্র! তিনি যখন পরবর্তী ধাপে পদ্যর্পণ করতেন তখন সেটিও বোধকরি রোমাঙ্কিত-তন্দ্র হয়ে থাকে। অর্থাৎ কবি গোড়াধিকার ভাষায়—“The Step saw its Master, and blushed!”

বৃন্দাবনের বৃন্দাশে বৃন্দনের হাতে আছে চামর—পিছনে এককনের মাথার অশ্রুতপর্শন রক্তমুহুর্ত। বৃন্দাবনের মাথার উপর সন্ধানভট।

এবার বীচের অংশটি দেখি। সোপান-শ্রেণী ও হাতীর গিটে হাওয়ার নক্সা অর্চ-চন্দ্রাকারে একটি হৃতি-চিহ্ন-বেদ্যরূপে এই নীচের অংশটিকে স্বর্গাবতরণ বৃত্তিও থেকে পৃথক করেছে। নীচে দেখছি, একটি রক্ত-সিঁহাসনে বৃন্দাবন আসীন। প্রলিখিতপদ ধর্মচক্র মূগ্ধ। সামনের জমি পুষ্পাকর্ষি। বৃন্দাবনের পিছনে একটি রোজিতপ্রজ্ঞা। প্রভুর বৃন্দাশে দুটি সারিগুণের পরীক্ষা: গন্ধবিশিষ্ট—ভাদের পিছনে ছোট ছোট মেঘশৃঙ্গ—গন্ধবিশিষ্ট দুটি ফেন উড়ে আসছে। বৃন্দাবনের বৃন্দাশে দুই যৌগিত্য। বামে বস্ত্রপাণি, দাঁকুণে পদ্মপাণি। তাঁর হৃদয়ে রক্তশৃঙ্গ ও কামে সিদ্ধবল। এ অংশে পদ্যর্পণের বেশী হৃতি' আছে, তিনটি হস্তী ও একটি অম্ব (চিত্র- ৫৬-তে সম্পূর্ণ মূল চিত্রটি আঁকা হয়নি, ফলে, পাঁচটি অম্ব) সেওনার্ণের “শেখ সায়দাস” (Coss Uthim, মোর উদ্ভূতি, বার ইংরেজি নাম Last Supper) চিত্রটিও এখানে প্রতিসামান্যলক। কেন্দ্রস্থলে বীশুখ্রীষ্ট, তাঁর এক এক দিকে ছয়জন শিষ্য। খ্রীষ্ট ধর্মের গ্রন্থ আলোচনা করে এই ম্বাদশজন শিষ্যকেই নিশ্চিতভাবে সনাক্ত করেছেন বিশারদের বল। বৃন্দাবনের অনুনে চৌদ্দেশজন প্রধান শিষ্যের নাম পাওরা বার, এ চিত্রে বৃন্দাবনের কামে অষ্টারজন শিষ্যকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। তাঁর ভিতর মাত্র দুটিকে সনাক্ত করতে পেরেছেন বিশেষজ্ঞরা। বস্তুতঃ, এ চিত্রের পঞ্চাশাব্দ চিত্রের ভিতর মাত্র সাতজনকে সনাক্ত করতে পেরেছেন অলঙ্কার-বিশারদ জয় গোলাম ইয়াজদানী। বৃন্দাবন, পদ্মপাণি ও বস্ত্রপাণির কথা আগেই বলেছি। কাকি চারজন হচ্ছেন এরা? বৃন্দাবনের দাঁকুণ-পদের সমীপবর্তী ভূতলে উপবিষ্ট মৃত্তকর রাজা হচ্ছেন রথন সন্ন্যাসী বিন্দিলার, তাঁর ঋতি সমীকটে কিসোর রক্তকুমারটি হচ্ছেন তাঁর দ্বয়রাজ রাজাতশরদ। বৃন্দাবনের কামে শিষ্যদের মধ্যে প্রথম সারিতে শিখারি হৃতিটি হচ্ছে জ্ঞানবৃদ্ধ সারিগুণের। তাঁর পিছনেই মৃত্তকর (মৌল্য-ওয়ার) হৃতিটি মহামৌল্যজ্ঞানের। বাল, এছাড়া আর কাউকে চেনা যায় না।

জয় ইয়াজদানীর একটা অনুস্মিতি ছিল, বা জায়ার বা জাপনার নাই। তিনি বিশেষজ্ঞ—তিনি প্রাচ্যপিক গ্রন্থ চেনা করেছিলেন। আপনি-জামি কসপিগুহ, দর্শক—এসেছি জ্ঞানজ্ঞা দেখে মনপ্রাণ ভরে নিয়ে যেতে। আমরা যদি কল্পনার রূপ একটু অনুস্মা করে নিই—এক জবরাজো যদি একটু বেশী জ্ঞানমগ্ন অহঙ্কা করতে পারি ‘জাহে কিবা কার কতি?’ অনুস্ম, আমরা পদ্যর্পণ করে আরও কয়েকটি চিত্রকে সনাক্ত করি। যাতে বিশেষজ্ঞের বল মেহা হৃদী-কারে প্রতিবাদ করতে ছুটে না আসেন, তাই তিহুটো হৃতিও দেখাব অহঙ্কা।

প্রথমতঃ বাল, রাজা বিন্দিলারের কামে মৃত্তকরী বৃশতি হচ্ছেন কৌশলবাক্য প্রসেনজিত। হৃতি? জয় ইয়াজদানী বিন্দিলারকে সনাক্ত করেছেন কোন ‘মৃত্তকর’? চিত্রে এই অঙ্গন M-বৃশতিটিকে সর্বপ্রধান স্থান দেওয়া হয়েছে—বৃন্দাবনের নিকট যে সব মহাজনপদ-বৃশতি অতিশয়ে দাঁকি নিরেছিলেন, বিন্দিলার তাঁদের মধ্যে প্রধান। এই দুটি সহ-সমীকরণের সম্মান করে ইয়াজদানী বলেছেন, M-বিন্দিলার। অনুস্মপাডবে আমরা বলব বিন্দিলারের পাশে এই অঙ্গন Y-বৃশতির অবস্থান প্রাচ্যদের দিক থেকে শিখারি এবং প্রসেনজিতের স্থান প্রথম বৃগের বৌদ্ধ-বৃশতিদের মধ্যে বিন্দিলারের পরেই। অতএব, Y-প্রসেনজিত।

এবার বৃন্দাবনের বামচরণ-প্রান্তের সর্বনিকটতম হৃতিটি। শিল্পী এঁকে সারিগুণের চেয়েও বৃন্দাবনের নিকটতর করে এঁকেছেন। এঁর হৃদে দেখছি ঝুঁকিরেছেন এক বিচিত্র

হাস্যরস, ব্যঙ্গ ইনি তরুণ। তবু কেন সে একে ইয়াজ্ঞানী সনাত্ত করেনি, আমি জানি না। আমার মতান্তর করা অগ্রে বৃন্দাবনের জীবনের একটা ঘটনার কথা বলা :

মহাপাণ্ডিত সারিপুত্র একবার বলেছিলেন : আমার পুত্র বিশ্বাস, এই ধরধামে ভগবন্ত বৃন্দাবনের মত মহাজ্ঞানী ইতিপূর্বে কখনও জন্মগ্রহণ করেননি, আজও নেই, এক ভবিষ্যতেও কখনও অবতীর্ণ হবেন না।

বৃন্দাবন সে কথা শুনতে পেয়ে বলেছিলেন—তোমার বাণী অত্যন্ত প্রতীক্ষণীয়, কিন্তু যে পাণ্ডিত্যগণ সারিপুত্র, তুমি একথা বলার পূর্বে এতাবধি যে সব মহাপুরুষ এই ধরধামে অবতীর্ণ হয়েছেন তাঁদের জীবনী ও বাণী নিশ্চয়ই জেনে নিয়েছ?

সারিপুত্র সন্মুখে বলেন—কাল অনানি—দূর অতীতের সবলের সকল কথা আমি কেমন করে জানব প্রভু?

: তা হটে! অন্ততঃ ভবিষ্যতে এ ধরধামে যত মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করবেন, তাঁদের কথা নিশ্চয়ই তুমি দিব্যদৃষ্টিতে জানতে পেরেছ?

আবও লজ্জা পেয়ে সারিপুত্র বলেন : আরে না! কাল শব্দ অনানি নয়, সে যে অনন্তও। সুদূর ভবিষ্যতের কথা আমি কেমন করে জানব প্রভু?

: তাও তো ঠিক। তাহলে অন্ততঃ আজ এই ধরধামের বিভিন্ন প্রত্যন্তদেশে যত মহাপুরুষ মরসে ঘুরা করে বিচরণ করছেন, তাঁদের সম্বন্ধে তোমার সমস্ত খবরই হয়েছে নিশ্চয়।

মরমে মরে গিয়ে সারিপুত্র বলেন—কাল যেমন অনানি—অনন্ত, পৃথিবীও তেমনি বিপুল্য! এই বিপুল্য পৃথিবীর সকল প্রত্যন্তদেশের সংবাদ আমি কেমন করে জানব প্রভু?

বৃন্দাবন শব্দ কলিলেন : তাও তো হটে! এ তো পুত্র ভাবনার কথা বোঁধ!

তখন বৃন্দাবনের চরণে সাক্ষরগো প্রণিপাত করে সারিপুত্র বকলেন : আমার ভুল আমি বুঝতে পেরেছি প্রভু!

বৃন্দাবন তখন শিখরের বলেছিলেন : জানমার্গে সারিপুত্র সর্বাগ্ৰগণ্য; কিন্তু সে আমাকে এত ভক্তি করে যে, স্বর্ণ-উল্লসিত ভক্তির মেঘে তার জ্ঞানসূর্য কখনও কখনও আচ্ছন্ন হয়ে যায়। জ্ঞান ও ভক্তি দু-নৌকার পা দিয়ে সারিপুত্র অগ্ৰসর হতে বাধ্য পায়। অতঃ তোমার আনন্দকে দেখ, সে শব্দ সেবার মাঝরমই এগিরে চলেছে। জ্ঞান-কর্ম-ভক্তির এলোমেলো হাওয়ার আর নৌকা একটুও মালো না।

অনন্দ ছিলেন সিম্বার্মের পিতৃব্যপুত্র। বোধ করি সবচেয়ে প্রিয় শিষ্য ছিলেন তিনি। মহাপ্রবাহের সময় বৃন্দাবন তারই হাতে দিয়ে গিয়েছিলেন নিজের ভিক্ষাপত্রটি। এই সব কথা যখন ভাবি, তখন বৃন্দাবনের বামচরণবতী বিচিত্র হাস্যরসের সমুদ্রজল ঐ তরুণটিকে সনাত্ত করতে আমার ভোঁ কই বাধে না? বৃন্দাবনের কর্তিন ও কটে প্রাণে এক সারিপুত্রের জ্ঞানগর্ভ প্রভুত্বের সবাই যখন অভিভূত, ও তখন মনে মনে বলছে : জানমার্গের ও নৌকার আমায় কি প্রয়োজন? আমি অঁছি তোমার চরণসেবা করতে—তাই বসেছি তোমার চক্রমূলে। আমার নির্বাণ ঠেকার কে?

কেন একথা ভেবেই ওর মূখে হটে উঠেছে ঐ মোনালিসা-রকম বিচিত্র হাসিটি।

প্রাচীরের বিস্তীর্ণ অংশ জুড়ে সন্তরণ গুহার অঁকি এই সূর্যহই চিত্রি অশ্রুতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্র তো বটেই, গোথ করি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্মৃতিস্মারক।

বৃন্দাবনের বামশার্শ্বে আরে একটিমাত্র হস্তী। তার পিঠে একজন মহিলা, সন্তো মহচরীর দল। নারীশক্তি এ-চিত্র আর নেই। এই মহিলাটি তাহলে কে? আরাগালী\* ঘটনা পরবর্তী কালের, বৃন্দাবনের বিদ্যাভ্রমহাধোতমী ভিক্ষুণী হয়েছিলেন একবারে শেষ পর্যায়ে। আমি জে মনে করছি, এই মহিলাটি হলেন বাল্যীয় বণিকশ্রেষ্ঠ বংশের সহধর্মিণী। সারদাধ হৃদয়

\* যে কালের বৃন্দাবনের মহাপ্রবাহন হই, সেই কালেরই কৃশীন্দর হবার পরে বৈষ্ণবী নারায়ী উপজাতি আরাগালীর সঙ্গে বৃন্দাবনের সাক্ষাৎ হয়।

প্রথম ধর্মগ্রন্থ প্রবর্তনের অন্তিমকালে পরেই কল্যাণদেবের প্রেরণে ধর্মী বখিকপ্রবর যশদেব সন্দ্বীপ ও সম্রাট বৃন্দাবনদেবের কাছে দীক্ষা নিরেছিলেন। যশ-আরাই হচ্ছেন গোতমবৃন্দেবের প্রথম শিষ্য। আমার ধারণা, হাতিপুস্তে এই হাতিগাটি যশদেবের-আরা। একটীমাত্র সংস্কৃত ভাষে। শিল্পী এঁর স্খাণব মনুস্ক পরিচয়েছেন। রাজা ও রানী ছাড়া অস্ত্র-শিল্পী মনুস্ক ব্যবহার করতে চান না সচরাচর।\*

পাঠক যাতে অন্যান্য চারিদিকের সংস্করণে নিজেই সন্নিবেহ হতে পারেন, তাই যুদ্ধের বে-  
 লম্পণের দীক্ষা নিম্নোক্ত, সেইভাবে তার প্রধান ও প্রধান শিক্ষার কয়েকজনের নাম এখানে  
 দিলাম :

ଧ୍ୟାନ-ବୋଧିଜ୍ଞ, ଅବସାରିତ, ଶାମ୍ଭୁ, ସହାନାୟ, ଭୀଷ୍ମ, ବଶୋଦେବ (ମା' ଓ ସାଆ) ବିଷ୍ଣୁ, ନୃସିଂହ, ପୂର୍ବ, ଡେହରା-ବାବାଜୀ, ମହା-ବାବାଜୀ, ପରା-ବାବାଜୀ, ସାତଗୁଡ଼ିଏ, ସହସ୍ରନାମସମାଧାନ, ଚନ୍ଦ୍ର, କବିନିବନ୍ଧ, ନିଶିମ୍ବ, ନୃସିଂହ, ଡେହରା, ଅଭୟାସନ, ସହାୟାସନ, ଡେହରା, ନନ୍ଦ, ରାହୁଳ, ସ୍ବାମୀ ଓ ଆନନ୍ଦ ।

মূল গর্ভ-হৃদয়ের মধ্যদিয়ে ধর্মচক্র প্রবর্তনবত বৃন্দগণের বিরতিগত মনোমুখিত (১৭১২০)। স্বাভাবিকভাবে ধর্মচক্র মূর্তি। প্রতীকগত অর্থঃ পূর্ব-বর্ণিত চিত্রে বা দেখেছি। পদতলে মধ্যদিয়ে প্রতীক দৃষ্টি হৃদয়-শিল্প। মূল গর্ভ-হৃদয়ের প্রবেশপথে বামদিকে অন্তরালের উত্তর প্রান্তের স্তম্ভদ্বয় গুহ্যের সেই স্বর্গোচ্চ জিহ্বা। সেই পেশা-কামল ও বৃন্দগণ (১৭১২৪)।

চলধির দেখতে দেখতে দশককে কানতে দেবোঁ। উপন্যাস পড়তে পড়তে পাঠকের চোখের  
পাতা ভিত্তে উঠতে যোবেঁ। কিন্তু কোন একটি স্থিরচিত্র দেখতে দেখতেও যে দশকের চোখ  
অন্যমনস্ক হয়ে উঠতে পারে, এই চিত্রটি সেখানকার আগে তা জানা ছিল  
না। একক জিত ভেবে নয়, ওর ভিতরেই যে দেখতে পাচ্ছি মনভাঙ্গানী  
বশেষের সময় সমস্ত জীবনটিকে। ওর চোখের ভয়ঙ্কর, ওর দৃষ্টি হতেই যন্ত্রণা যে অনেক কথা  
ও বলছে—নির্বাক জি জো এ নয়।

দেখি, অতি বিস্তারভবন বাস্তবেরে সম্বন্ধে দৃষ্টি কল্প প্রাণী (চিত্র ওএ)। বাস্তবের পরিধানে শীত অর্জুন, তার সম্বন্ধে লিখেন জ্যোতিঃপ্রভ : তার হাতে ভিক্ষাপাত্র। বিশাল করে আঁকলেনও শিল্পী কিন্তু বাস্তবেরকে স্পষ্ট করে আঁকেননি। পঞ্চদশশতাব্দীর উপর তরী দেহা-ব্রহ্মকে সূক্ষ্মপট রেবার চিত্রিত করেননি। যেন মনে হয়, এ কোন প্রত-আশয়ের মাল্যময় নয়—এ যেন এক পশ্চাত অসাড়ি'র সত্তা। তিনি অতি বিশাল, তিনি মহিমময়, কিন্তু তিনি রক্ত ও রেবার কখনো ধরা পড়ে নিরায়। অশ্রুতপক্ষে, গোপা ও জ্বলন্ত অগ্নিতে ছোট হতে পারে, কিন্তু তাহেরে দেখাও প্রভৃতি দেখে আলম্বার, পরিঘেরে প্রভৃতি পরিঘেরে সন্মপট।

কল্যাণবাবার শিষ্যে একটি জ্যেষ্ঠশ্রমিক-কর্মায়ত্ত্বের শিষ্যে রেণুহীন রঙহীন কালো আকর্ষণ। কল্যাণবাবার পরিচয়ের শূন্য কল্যাণবাবার পশ্চাৎগতি কল্যাণ। শিষ্যের কল্যাণেই এ ঐক্যগানিক সত্য-যে সত্যটি রঙ যেখানে ঘন হয়ে আসে সেখানে দেখা যায় শূন্যতা আর সব রঙ হাটকে ভাঙা করে যায়, তাইকেই অভিজ্ঞতা করে কল্যাণ? শিষ্যের কল্যাণেই জ্যেষ্ঠশ্রমিকের

\* “অসহযোগ” আন্দোলন প্রথম সংস্করণ পড়ে ভারতীয় অসহযোগ আন্দোলন উপস্থাপন হিসেবে বিখ্যাত হোয়াসেবের এই কংগ্রেসটি প্রসঙ্গে। অসহযোগ আন্দোলন, কুইন মরান কংগ্রেসের শেষ অধ্যায়ের মধ্যে নিজেই জন্ম। ব্রাহ্মণ, মুসলিম ও বৈষ্ণবিক দলগুলির মধ্যে যখন না করে সহযোগিতার চেষ্টা করে ফল পাওয়া যায়। সেইসঙ্গে বৈষ্ণব শিল্পের বিপ্লবের সময়কালে বৈষ্ণবিক দলগুলি প্রথম অসহযোগের উপর দৃষ্টি করে। সেইসঙ্গে বৈষ্ণব শিল্পের বিপ্লবের সময়কালে বৈষ্ণবিক দলগুলি প্রথম অসহযোগের উপর দৃষ্টি করে। সেইসঙ্গে বৈষ্ণব শিল্পের বিপ্লবের সময়কালে বৈষ্ণবিক দলগুলি প্রথম অসহযোগের উপর দৃষ্টি করে।

শেখ হাসিনার কাছে, গোতমের বিলাস মহাপাতালী এক বসন্তের ভিড়পূর্ণ বয়স অনুভূতিপ্রাপ্ত।  
হিন্দেব বৃষ্টিপাতের অনুভব করতেন। একেবারে শেষ পর্বেই যে কর্মসূচি নির্ধারণের  
আমন্ত্রণ। এ-রই বৃষ্টিপাতের বার্ষিক একের ষষ্ঠীর পূর্বে শাক্যবৈকালিগণের হাতে এ-কেন্দ্র  
কখনো নির্ণয়। রক্তাক্ততার রক্তের ছোঁকেই বোকা বয়। আমি প্রত্যাশিতভাবে তাঁর এ মত শুনে নিঃশব্দ।

জয়সামার খাতিরে আঁকা। বিশালারতন বৃন্দদেবের তুলনার নারী ও শিশু দুটির আকার বা 'মাস' ঘাটীও হয়ে যাচ্ছে বলে ঐ তোরণশারিটি আঁকতে কষ্ট হয়েছেন তিনি, কিন্তু বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে সেজন্য নর শিল্পী ফেল করতে চান বৃন্দদেবের পদ্মদৃশ্যে জীবনের তোরণশার আলা বৃন্দ; আর তুলনার মহামানবের পদ্মদে শেখুই মহাশূন্য!

এই চিত্রটির প্রসঙ্গে এসে প্রাজ-শিল্প-বিশারদ লরেন্স বিনিয়ন বলেছেন \*

মহামানব বৃন্দদেবের সমুদ্রে বিজয়যাত্রার নারী ও শিশুদ্বয়ের চিত্রটি অলঙ্কারী। ঐ চিত্রদ্বয়ের প্রাণ এবং ইন্দ্রিয় সোমাইট প্রকাশিত এমনভাবে শেখু নারী ও শিশুদেই আঁকা হয়েছে—অসমর্থ কল্প কেউই তার সঙ্গে বৃন্দদেবের চিত্রটি কাঁটকনি। ফলে মাতালতের ঐ বিশেষ ভঙ্গিতে হাঁটিয়ে বাকার যিনি মাস উপর তাঁকে পট্টক বৃন্দদেব বলতে বাধ্য হন।



চিত্র—৫৭৪ বৃন্দদেব যোগা ও রাহুল  
(অবলম্ব—XVII/24)।



চিত্র—৫৭৪ যোগা ও রাহুল  
(অবলম্ব—XVII/24)।

কিন্তু আর একটা কথা: তিনিটি চিত্রকে ক্ষুদ্র জালদার শিল্পের একসঙ্গে দেখাতে গেছে, মাতালতের দেহাবলম্ব এত ক্ষুদ্র হয়ে যায় যে, তার শেখু দুটি দেখানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই এখানে মাতালতের কিস্তি বড় করে আবার একে দেখাতে হল (চিত্র—৫৭৪)। এবার চেয়ে দেখুন রাহুলের দিকে, কী অপার বিশ্বাস, কী অশ্রুৎ আবেদন দুটিতে তুলেছেন শিল্পী ওর শিশু-বৃন্দে! দেখুন মলভাঙ্গিনী মনোরমকেও। লক্ষ্য করুন ঐ করাপুলির মূর্তি।

\* Introduction of Lawrence Binyon to "My Pilgrimages to Ajanta & Bagh", London 1925, by Mukul Dey.

জীবিত বলেছেন \* Hands are put in with a pretty manner grace and truth of expression which, to those acquainted with Indian life, is full of suggestiveness. It is precisely this that, to this day, supple wrists, palms, and fingers beseech, explain, deprecate and caress.

যশোধরার দুটি হাতেই করাপটুলি যেন তাঁর হাতে কথা বলেছে। কে বলে এ ছবি নির্বাণ? একটু কান পাড়লেই শুনতে পাবেন, ওর বামহস্ত বলেছে, ঘাঘরে পাগলা, ঐ তোর বাপ! যা ওর কাছে ও তাকে পৃথিবীর রাজা করে দিতে পারে। এই বেলা চেয়ে নে তোর পিতৃবন!

কিন্তু এই তে যশোধরার শেষ কথা নয়! সে যে তার জীবন দিয়ে চিনে নিয়েছে ঐ সবার অবতার! নিষ্ঠুর উদাসীন মানুস্যটিকে! তাই ওর অবচেতন মনে আছে শম্ভু; তাই বা-হাতে ছেলেকে ঠেলে দিয়েও জান হাতে আবার তাকে আগলে রাখছে মনোভাগিনী! তাই ওর ডান হাতের করাপটুলি বলেছে, হাসনে রে, হাসনে! ও বড় নিষ্ঠুর! ও কেড়ে নিয়েছে আমার স্বামীকে—সুযোগ পেলে ও কেড়ে নেবে আমার সন্তানকেও! ও যে আমার অবতার!

বিনিয়ন বলেছেন .

কায়ার শিপ্পলকবধের জীবনে এর চেয়ে রহস্যময় এবং এমন করুণার আশ্রিত অলংকার কোন জৈ লেখা বলে তো মনে করতে পারছি না!

এ-চিত্র প্রসঙ্গে এইটিই শেষ কথা নয় কি ?

এবার আমরা দেখব আর একটি সুন্দরী জাতক-কাহিনী—বিশ্বকল্লর-জাতক। কিন্তু চার্জিত ছাড়া যেমন প্রতিমার স্বরূপ ফোটে না, পদ্মচাপ্ট ছাড়া যেমন ছবি খোলে না, তেমনি বিশ্বকল্লর-জাতকের প্রকৃত মূল্যায়নের জন্য বোধিসত্ত্ব বিশ্বকল্লরের বংশ-পরিচয়টি জানা ছাড়া দরকার। বিশ্বকল্লরের পিতৃমহৎ হচ্ছেন স্কন্দাম্বনা মহারাজ শিবি। মহারাজত্যা মতনিষ্ঠ শিবিরাজার উপাখ্যান আমরা পড়ছি, সে কাহিনী প্রথম গুহ্যর আঁকা আছে, তা-ও দেখে এসেছি আমরা (১০)। জাতকমতে শিবিরাজার কাহিনীটি অন্যরকম। একজন আঁক নিম্নস্তম্ভ ৩৫৬

ভিখারী তাঁর কাছে একটি চক্ষু ভিক্ষা করেছিল, দানশীল শিবিরাজ তাকে প্রার্থনার আদর্শিত নিজের দুটি চক্ষুই দান করেন। মহারাজত-পর্ণিত কাহিনীর মত এখানেও দৈবরাজ শত্রু শিবিরাজকে দুটি চক্ষুই প্রত্যর্পণ করেন। সেই কাহিনী অবলম্বনেও অজন্তা-শিপ্পা এই স্তম্ভশ গুহ্যতে একটি অসংখ্য চিত্র এঁকে রেখে গেছেন। সেই শিবিরাজার পুত্র হচ্ছেন মহামতি সঞ্জর এবং তাঁর পুত্রবধূ হচ্ছেন মহারাজনী পৃথ্বী। স্বব্রজ বিশ্বকল্লর এঁদেরই সন্তান। তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র ছিল পিতৃমহের বাণী :

অর্চি প্রিয় ভাব ধারে যাহা তব অর্চি পদসে

জহাও হাঁহলে দিলে ভূবিককে মন ঘাঘরে হুঁ

বিশ্বকল্লরের জন্মের পূর্বেই রাজমহিবীর করকোষ্ঠী বিচার করে গ্রহচার্য বলেছিলেন, জাওক হইলে ভুবন-বিখ্যাত দানবীর এবং এঁকে রাজেন্দ্রবর্ষের মধ্যে অবস্থ করে রাজা হইবে না ইনি যৌবনেই বনবাণী হইবে।

এই ভবিষ্যদ্বাণী প্রবণ করে মহারাজ সঞ্জর এবং মহারাজনী প্রতিজ্ঞা করলেন, যা অর্থন কিছুতেই ঘটিতে দেখেন না ঠগা।

জন্মমাত্র জাতক মাকে বলেছিল—মা, আমি কিছু দান করছি ছাই, ঘরে কিছু আছে?

শিশুকাল থেকেই বিশ্বকল্লর সর্বোত্তর অনাসক্ত, সব-কিছুকেই সে দান করে দেয়—আহার, কস, অলংকার—সব পায়ে।

\* Guide to Ajanta Frescoes, Dept. of Archaeology, H. E. H. the Nizam's Govt., Hyderabad, 1935.

১০ কালিচন্দ্র সিংহ মহাস্থায় মহারাজত-কল্লর (১০১ম অধ্যায়) ও অলংকার পর্বে (১০২ অধ্যায়) শিবিরাজার কাহিনী প্রবৃত্ত। ইচ্ছান শিবিরাজ পুত্রবধূ ব-ক্লরর জন্য তেঁদের মাপ গ্রহণ করেছিলেন।

১১ শিশুপাল যোগ।

সজ্ঞার আশ পৃথকী লক্ষ্য করেন দানশীলি আলোকের মনের গতি। কথা সেন না তাঁরা। পিতা-মহের দানশীলতা পেটের মাথা সংশ্লিষ্ট হয়েছে।

অটবর্ষ কালকালে কালক মাকে বলে—আমি এমন কিছু দান করতে চাই যা হবে মহাদান! না হলে তুস্ত হবে না আমার অশান্ত জ্বর।

জননী বলেন—কি দান করতে চাও তুমি।

আমার দেহের কোন অংশ। মাসে, চক্ষু, অথবা হৃদয়।

—পিতামহের দানশীলতাকে অতিক্রম করতে চাও তুমি।

কালক বলে—পিতামহের কাছে অল্প একটি চক্ষু প্রার্থনা করেছিলাম, তিনি তাকে দুটি চক্ষুই দান করেছিলেন। তাঁকে অতিক্রম করব কেমন করে মা, আমার হো দুটি বই চক্ষু, নাই।

জাতিজা হলেন জননী, দীর্ঘশ্রুত হলেন মহারাজ। কিন্তু না, কিছুতেই তাঁরা যুবরাজকে বনবাসী হতে সেনেন না। মহারাজ সমস্ত রাজ্য অশেষল্য করে এক অশব্দা সুনন্দীকে নিয়ে এলেন পৃথক করে। বিশ্বাস্তর-জননী সমোঁকিবিহিতা পুত্রকথকে জনানিতকে নিয়ে এসে বলেন—গ্রাহ্যচাৰ্ণ ভবিষ্যৎবাণী করেছেন, তোমার ক্ষমতা যেমনকালেই তোমাতে গাথ করে বনবাসী হবে। সে লগাটীলখন বর্ষ করতে হবে তোমাকে। কেমন, পারবে?

নববধু, সলাকে প্রীতিভাষণ করে জানায়, সে পারবে।

বিশ্বক এর-এর্য্য মাত্রী বিশ্বাসী ছিল না মহাকালক-পত্রী সীললীর মত, কিন্তু তার সংসার-জ্ঞান ছিল প্রখর। সীললীর মত সে রূপে জেলাকার চেণ্টা করেনি, জালতাসা দিয়েও নয়—সে ঠিকই চিনতে পেরেছিল রাজপুত্রকে। সে জানে, কী রোগের কী ঔষধ।

বিবাহ-উৎসবের পূর্ণপূর্ণবর-সমিষ্ট পালক নববিবাহিত সম্প্রতির বাসবদায় মাত্রীকে হাত ধরে পেঁচিয়ে দিবে গেল নমঃসহচরীর বল। সন্দ্বীত, হাস্য-পরিহাস শো, হলে অশেষল্য ধরে, এমপীতক দেখে দিয়ার নিল এরা। মাত্রী তখন বিশ্বাস্তরের পলিত্রস্তে নামিয়ে রাখে একটি সলাক প্রণাম। বাহু-হল ধরে বিশ্বাস্তর এতে হুলে করেন। পশ্চ-কোরকতুল। দুটি হাত জোড় করে মাত্রী বলে—প্রভু, এই প্রাণেশ্বর দিনে একটি ভিক্ষা আছে।

উপায়ে উদ্ধীপ্ত হয়ে ওঠেন বিশ্বাস্তর। দান করতে শাবলে আর কিছু, চান না তিনি। বলেন—হল সূর্য্যরোত, কী দান পেলে সুখী হবে তুমি?

—প্রতিশ্রুতি ঠাক, আমারে ভাণ করে প্ররজনা নিয়ে কোনদিন বনবাসী হবেন না।

বিশ্বাস্তরের ওষ্ঠপ্রান্তের ফুটে ওঠে কণীণ হাসহরখা, বলেন—কঠিন প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিলে তুমি। কিন্তু প্রার্থীকে আমি কখনও বিশ্বাস্তর কবি না। সলাম প্রতিশ্রুতি, শচিষ্ঠম্বত।

ছিল-প্রতিশ্রুতি ম্যার হুলে রাহিতে এসে মাত্রী দেখে, অলিঙ্গের একান্তে প্রভাতের প্রতীক্ষার ভোগে বসে আছেন বিশ্বাস্তর-জননী। পুত্রকথকে দেখতে পেয়ে নিকটে এসে বলেন—মনে আছে?

সলাকে মাত্রী বলে—আছে মা, তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আমাকে ভাণ করে, সলাম লেখন না।

স্বস্তির নিশ্বাস পড়ে সজ্ঞার-কায়াব।

সলামে আবদ্ধ হয়ে পড়েন ক্রমে বিশ্বাস্তর। দুটি-সুন্দরী ইয়েছে তাঁর। দেবদীপ্তর মত বিকাক্ষিত দুটি নিশ্বাস শিশু শরুপকের চন্দ্রকলার মত দিন দিন রাজপ্রাসাদকে উজ্জ্বলতব করে জেলে। মাত্রীর দুটি নামের মণি সেন পুত্র জালী আর কন্যা কৃষ্ণাঙ্গিনী। মহারাজ সজ্ঞার আশ্রিত হন, পৃথকী নিশ্বাস্তর হন—গ্রাহ্যচাৰ্ণের ভবিষ্যৎবাণী ভাবা বর্ষ করতে পেয়েছেন।

এদিকে দানবীর বিশ্বাস্তরের জীবনযাত্রার কোনও পরিবর্তন সেই। জমাগত দু'হাতে দান করে চলেছেন তিনি—তাঁর ভৈতব, তাঁর সম্পদ, রাজপুত্রের কাঙ্ক্ষিত যা কিছু—অলম্বার, পরিধেয়, আহাৰ, তৈজস্পত্র। রাজ্য-জানী হুক্ষেণ বলেন না—অতুল রাজ-সম্পদের কতটুকু কতি-বৃষ্টি হচ্ছে এতে?

প্রমোদের সন্মুখপাশে প্রথম দেখা দিল, যেদিন বুঝলুম একজন প্রাণীকে দান করে কলেন নিজ ভরবাগি। অসম্ভবতঃ হলেন অমাত্যবর্গ, তাহিত হলেন মহামন্ত্রী, ক্ষুদ্র হলেন প্রাধান সেনাপতি। এ কী অন্যায়! ক্ষত্রির রাজপুত্র যদি আত্মবিকার অঙ্গ পশ্চত নির্দোষ্য দান করে বলেন, তবে প্রজাবৃন্দ কোন ভরবার তাঁর হাতে তুলে দেবে শাসনবণ্ড?

মহারাজ সজ্ঞও মর্মান্বিত হয়েছিলেন; কিন্তু পুত্রের দানকার্যে তিনি কখনও বাধা দিতেন না, তাই স্বীকার করে নিলেন বুঝলুম এই অক্ষত্রির আচার।

কিন্তু সেখানেই তো শেষ নয়। এর কিছুদিন পরে কলিঙ্গ দেশে দেখা দিল অনাবৃষ্টি-অনিত দৃষ্টিক। নিরস্ত্র প্রজার ঘল ভিক্ষার্থে এল রাজপ্রাসাদে; কিন্তু তারা রাজদরবারে না গিয়ে এসে দাঁড়াল বুঝলুমের গৃহে। এসে দুর্ভিক্ষ বিঘণিত হয়ে গেলেন বিন্দুসন্তর—ওদের দান করে দিলেন রাজহস্তীটিকে।

এই রাজহস্তীটি ছিল রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ব্যবহৃত ধর্ম করে সে নির্মোহ আকাশে আঘাসঘন বলদ সঞ্চার করতে পারত। উৎকল রাজবংশের রাজহস্তী নিয়ে ক্ষমণে প্রত্যাবর্তন করে; কিন্তু এদিকে সমুদ্রের রাজ্যে ঘনীভূত হয়ে ওঠে প্রচণ্ড অসন্তোষ। রাজ-পুত্রের কোনো অধিকার নেই রাজসম্পদ এভাবে পররাজ্যে বিক্রিয়ে দেবার। অসম্ভবতঃ প্রজাবৃন্দ প্রকাশ্যে অভিবোধ আনল রাজদরবারে—তারা রাজপুত্রের বিচার চায়।

প্ৰতিভাত হলে গেলেন মহারাজ।

মহামন্ত্রী তাঁর কণ্ঠমূলে নিবেদন করেন, প্রজাবৃন্দ কিন্তু হয়ে গেছে—অবিলাম্বে বুঝলুমকে স্থানান্তরে প্রেরণ করুন। নতুন হয়তো ওরা গুপ্তসম্মতক নিবৃত্ত করে করবে।

মহারানী বলেন—কিছুদিনের জন্য ওকে মাতুলালয়ে প্রেরণ করুন মহারাজ।

মহারাজ সজ্ঞের মধ্যে ফুটে ওঠে বিচিত্র হাস্যেরবা। তাঁর সেই অশ্রুজালিক মূর্তি দেখে শিহরিত হলেন রানী। মহারাজ বলেন, মন্ত্রীমহোদয়ের পরামর্শও শুনছি, মহারানীর স্বেচ্ছিতও শুনলাম—কিন্তু তোমরা একটা কথা তুলে গেছ তা হচ্ছে এই যে, আমি যে সিংহাসনে বসে আছি, সেই সিংহাসনেই একদিন উপবেশন করতে সম্মতন রাজনিষ্ঠ মহারাজ শিব।

মন্ত্রী বলেন—সে কথা কেন বলছেন মহারাজ?

দৃষ্টকণ্ঠে সজ্ঞ বলেন—নাগের বিচারে পিতাপুত্রের সম্পর্ক নেই। রাজ-শাসনের কল্যানে রাজসম্পত্তির কতিপয়ন করার একটিমাত্র শাসিত নির্বিষ্ট আছে। তাই নিতে হবে আমাকে। আত্মকণ্ঠে পৃথকী হলেন—কী সেই শাসিত?

সজ্ঞ বলেন—তুমি অজলপুত্রের বাও রানী, এ তুমি সহ্য করতে পারবে না। আমি করির নৃশাঁজ, আমাকে সব সহ্য করতে হয়! যে দুর্ভিক্ষে এতদিন প্রতিরোধ করে এসেছি সবপ্রকারে, সেই পন্ডামেশই নিতে হবে আমাকে।

শিহরিত মন্ত্রী বলেন—মহারাজ?

—হ্যাঁ, তাই—পুত্রকে নির্দোষ্য-বণ্ড দিলে।

সে দৃষ্টকণ্ঠে শুনেন মূর্ছিত হয়ে পড়েন বিন্দুসন্তর-রানী। কিন্তু অপরাধী শব্দে নির্বিচার। দণ্ডদেশে শুনেন তিনি বলেন—রাজদেশে শিরোমণি তুলে আমি একটি দিনের জন্য সময় চাইছি মহারাজ। অপরাধীকাল আমি একবন্ধে কবিয়ে যাব।

উপাত অগ্রু সোপান করে সজ্ঞ বলেন—কেন? একদিন সময় চাইছি কেন?

—নির্বাসনে বাধ্য করার পূর্বে আমার স্বা-কিছু সম্পত্তি আমি প্রজাবর্গকে দান করে নেতে চাই। অতদিন শতদান উপহারে আরোজন করুন, পিতা!

শুনেন অধীভূত হয়ে গেল প্রজাবৃন্দ; কিন্তু রাজদেশে অমোহ। সমস্ত দিন ধরে বুঝলুম তাঁর ব্যক্তিগত সম্পদ মুক্তহস্তে দান করে দিলেন। দিবসান্তে রিক্তহস্তে কিয়ে এলেন রাজ-প্রাসাদে। প্রদান করলেন পিতাকে, জননীর পদপ্রান্তে জানান প্রণীত, রাজপুত্রীর প্রতিটি





—কিন্তু আমাৰে বাৰালক সন্তান দুটি? তোমাৰ দুটি নৱনৈৰ বাঁশ? জালী এক কুৰ্মজিন?

—জাৰাও অনুমতি কৰে জাদেৰ জননীক।

—ওহা যে দুখপোকা শিশু, মাত্ৰী!

অঞ্চল দীপশিখাৰ মত ব্যক্তকৈ উঠে বাঁহৰ মাত্ৰী, শিখৰ সৰ্ব্বতকণ্ঠে বলেন—সত্যনিষ্ঠ যুৱৰাজ, আপনৰ ধৰ্মচিহ্নে আমি কখনও প্ৰতিবন্ধক হইনি। আমাকেও মৰ্যম অনুসরণে আপনি ব্যাধি যেনে না, এই আমাৰ একান্ত নিৰ্বাণ।

—কী জেমাৰ সেই ধৰ্ম, মাত্ৰী?

—স্বামীপুত্ৰৰ সেৱা।

সত্যপ্ৰৱী বিশ্বান্তৰ আৰু বাধা দেননি।

পৰ্বদিন অশ্বচতুৰ্দশ-বোধিত কাকৰখে যুৱৰাজ সন্তীক ও সপুত্ৰকন্যা নিবাস্ত হলেম ৰাজপুত্ৰী খেঁক। অৰ্ণববন্ধুগৃহে মুহূৰ্ত্তক প্ৰবৃত্তি জানতেও পাৰলেন না ম্যাপ্ৰান্তে প্ৰণাম কৰে গেল কায়া। অনুভূত প্ৰজাবন্ধু লাৰি লাৰি ঘাঁহিহে ৰাজপুত্ৰ। এই মুহূৰ্ত্তটিতে ওহা ভুলে গৈছে, পৰ্বদিন এইই পিৰুখে প্ৰকাশ্য ৰাজদৰবাৰে অভিযোগ এনিছিল ওহাই।

নগৰসীমান্তে বাধা পেলে বিশ্বান্তৰ ওহা ৰক্ষা কৰেন। ত্ৰায়জন প্ৰাঞ্জল অগ্ৰসৰ হয়ে এসে হলেন—শতবানৰে সংকল পেতে ওহা দুৰ দেশ খেঁক আসছেন। বিশ্বান্তৰ সৰ্ব্বেন হলেন—আমি আমি যে নিৰ্ম্মম ভাই। কি দিতে পঢ়িৰ কল, তোমাৰে?

প্ৰাণীসেৱা মুখপাত অগ্ৰসৰ হয়ে এসে হলেন—আমাৰে চাৰজনকে আপনৰ ৰুখৰ চাৰটি অশ্ব হান কৰুন।

উৎফুল্ল হতে ওঠেন বিশ্বান্তৰ। ঠিক কথা! এ-কথা ভো মনে ছিল না।

অৱশ্যে পদত্ৰয়ে বাধা। মহাসত্ৰু বিশ্বান্তৰে ৰাজকন্যা মাত্ৰীকে তখন হলেন।

হুঁমি হেলে লও কুৰ্মজিনৰে এখন,

হেটু সেই লক্ষ্যৰ, জালী এক ভাৱ,

সেমেতু আহাৰ আমি লইলম তাৰ ৪ ২১৪ ৪

পুত্ৰকন্যাকে কেতে ভুলে নিয়ে দুৰ্গম পথে কায়া শূন্য হৈ সেই দুজন ভগ্নহৃদেৰ, ৰাজ-বৈজ্ঞেয় প্ৰাক্ৰম্যেৰ মখে অতিথ্যে এতকাল বাঁহা হান কৰে এসেছেন।

অৱশ্যে হিমালয়ৰ পাদদেশে বন্ধ পৰ্বত! এখানেই কন্যাসে কালাতিপাত কৰকেন মহাসত্ৰু। অৱাক্ষিপ্তকৈ মাত্ৰী দেখতে থাকেন সেই ভয়ঙ্কৰ অৱশ্যে। শ্বাপদসংকুল এ গহন অৱশ্যে কেনন কৰে মানুহ কৰে তুলনৈৰ ভাৱ সেই ন্যানেৰ দুটি মণিক? কেনন কৰে বাঁহিয়ে ৰামবনে ধৰ্মনিষ্ঠ স্বামীক? তবু দুৰ্ভাগ্যেৰ কাছে নতিস্বীকাৰ কৰেন না মাত্ৰী। ৰোমিষ্ট নিৰাৱৰ্ত্তে হ্যামবন্ধ আৰু অতল সাহায্য, দুটি শিশু সাহায্যে সেই গভীৰ অৱশ্যে একটি পৰ্বতুতি নিৰ্মাণ কৰেন ৰাজকন্যা মাত্ৰী। বিশ্বান্তৰ উপাসন, নিৰ্ম্মম—আহাৰ ভাৱ হাতে ভুলে নিলেও তিনি আহাৰ কৰতে ভুলে হান হান কৰে বেন বালা। অৱশ্য, এ গহন অৱশ্যে প্ৰাণীৰ ভাৱ নেই, তবু আহাৰ ভো সন্ত্ৰহ কৰে আনতে হৰে। বিশ্বান্তৰ উপাসনা উল্লস, হান কৰেন, শিশু-সন্তান দুটি খেলা কৰে কন-কুৰ্মজিনৰ সঙ্গ, আৰু নিৰ্ভয় পৰিশ্ৰমে ৰাজকন্যা মাত্ৰী উদ্যন্ত আহাৰ সন্ত্ৰহ কৰেন। পাৰ্বত্য স্ৰোতসিন্ধী খেঁক নিৰ্ভয় আসেন পানীৰ জল, ফলহান বন্ধ খেঁক আহৰণ কৰে আনেন কনজ ফল। শিশুসন্তান দুটিৰে প্ৰজাবৰ্ত্তন কৰে মেথেন শ্যাল্যগণ বিশ্বান্তৰ কল জাছেন নিৰাত-নিৰ্ম্মম-দীপশিখাৰ মত, আৰু শিশু-সন্তান দুটি খেলা কৰতে পৰ্বতুতিৰে অনুৰে। মাত্ৰীৰ পৰশৰে খেলা ফেলে হুটে অৰে জালী ও কুৰ্মজিন। সন্তান দিন অৱশ্যেৰ পৰে জননীৰ মাণিত্যা উল্লসিত হয়ে ওঠে ওহা। আৰ কোন কাধা মানে না, আৰ কোন কাধ কৰতে থেৰ না মাত্ৰীকে। মাত্ৰীও সমস্ত দিনেৰ পৰিশ্ৰমে কৰা ভুলে হান—এই অশ্বচতুৰ্দশ-বোধিত মাধ্যম মুহূৰ্ত্তটিই ওহা নিৰাতৰ নিৰ্ভয় পৰিশ্ৰমে ফলপ্ৰসূতি। শিশুসন্তান দুটিকে বন্ধে হেনে সেন, হাত বুলিয়ে সেন ৰামাৰ, গম্ভ হলেন।

তমে গভীৰ হয়ে আসে আৰ্জাক জাতি। নিৰাতৰ প্ৰাণীৰ পদধৰ্মে শূন্যতে পাওহা যায়

তখন। মাতৃ অহাৰ্য্য বণ্টন করেন। স্বামীশূন্যের আহায়েতে অবশিষ্ট কিছু থাকলে বুথে গেল। কিন্তু নির্ধূর কিংবা মন্দভাগিনী রাজকন্ডের বন্যটে এতদুঃ সুখও পেতেননি। একদিন বিকালে বন্যস্তর থেকে আহাৰ্য্য সংগ্রহ করে ফিরে এসে মাতৃ দেখেন—কুটিরের সম্মুখে ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে আছেন বিন্দাস্তর, তার চক্রেতে হরিণ-শিশু দুটি সামীর অভয়ে নিঃশব্দ।

চিন্তাম্বিতা হলেন মাতৃ, কুটিরের চতুষ্পার্শ্ব অন্বেষণ করতে থাকেন; কিন্তু শিশু দুটির কলকণ্ঠ শুনতে পেলেন না কোথাও। প্রথমে মনে হয়েছিল এ দু'কি শিশুসুলভ কোন খেলার হল। জননীর চমকিত করে সেবার উপস্থে ওরা দু'কি কোন পল্লভতালে লুকিয়ে আছে। উৎকণ্ঠিতা মাতৃর মনের কথা শূন্যভাবে কণীয়া করেছেন জাতককার :

দুঃখবানি সর্ব অঙ্গে মাখিয়া ব্যাড়া  
হুঁকিয়া আসিলে সোরে বেঁটি এ সর।  
হাল কেন আসেবে দেখে নাই পাই ?  
অথবা হইতে হবে আনিবার কঠি  
কর হতে বেশি সোরে হুটে আসি বরা  
বিত্ত ভরসে। তবে, আর কোথা যায়।

বুথে পূর্ণ হইয়াছে শতাব্দীর মোর,  
শিশুর শব্দায় মোর হৃৎ কঠি হার  
জাল, কল, খজানীর ন্যাসের ধন,  
নিচেহে না দেখে ফেল আর এতদন ? ১ ৫৫২ ১

হারহার নাম ধরে ডাকার পরেও কখন কেউ সাড়া দিল না, তখন এক অমপাল আশ্চর্য্যে  
কিহিন্তা হলেন মাতৃ। সহসা তার লক্ষ হয় নির্ভিত হরিণ-শিশুর মূর্তিত চক্রেতে অঙ্গ-  
বিন্দু। যা কখনও করেনি তাই করে করেন মাতৃ; অকালে ধ্যানভঙ্গ্য করলেন হৃৎস্রোতের,  
বলেন—ওরা কোথায় ?

শান্ত অকিঞ্চলিত কণ্ঠে বিন্দাস্তর বলেন—ওরা তো নেই।

—নেই! সে কি! কোথায় তারা।

—আজ একজন ব্রাহ্মণ এসেছিল। ডিকার চাইল সে। আমি তাকে বললাম, আমি নিম্ন  
বন্যাসী উপল্লী, কি ফিতে পারি তোমাকে? ব্রাহ্মণ তখন জালী আর কুমারিনকে নির্দেশ  
করে বলেন—ঐ দুটি শিশুকে আপনি মান করে দিন, ভীতবাসরূপে ওদের বাঁচ করলে—

চীৎকার করে ওঠেন মাতৃ—কালত হন হুবাক! আর কখনো না। লতিটুকু আমাকে  
জন্মান করে নিতে দিন।

হ্যাঁ, ডিকারি বলছিলেন মাতৃ, সে নির্ধূর কাহিনীর কণী পাঠ করা যায় না :

জালী এ কুমারিন  
দিলেন ডমাই তিন  
দুঃসুখী উভয়ে  
হোঁ এ অশ্রুত জলে

হাত ধরি বিন্দাস্তর  
সর্বলোভা দেখে যায়  
ব্রাহ্মণের ঘন ঘন  
শিহরিলা সর্বলোভ

কুমারের করিলেন হান  
ছিল তার যে দুটি সন্তান।  
কলিলেন কুমারের তিন  
বন্যস্তর করিলেন ঘোঁরা ১ ৫৫৩ ১

নির্ধূর ব্রাহ্মণ আসিল তখন  
লগ্নে আশ্রয়ে বুজেন জাল  
বলি কল্মাশে বন্ধের মায়া  
এ নাহুৎ হুয়া অবিভূতনে

দুটি শিশু লগ্না করিয়া সেন।  
কলিল ব্রাহ্মণে শিশু দুটি হার।  
শিশু দুটি সেই বাহ জালদায়  
মাখিয়া বেঁধেই জালা কুমারি ১ ৫৫৪ ১

ইশানচন্দ্র মোহ মনাই লিখেছেন :

অজস্র কুমার এ কুমারীর মোহে যে যে মনে আছে কুমার, সেই সেই মনেই চর্য্য ছিড়িয়া গেল  
এ রকম বাহির হইল। প্রহীরে ডাকার ভয়েল কর পাইয়া কুমারি হইয়া বীড়িয়ে কলিল। অজস্র  
এক বিধে শ্যাম সিয়া হুইবার কালে ব্রাহ্মণের পশ্চাদন হইল এক সে কহাৎ খাইয়া পড়িল। অর্ধনি শিশু  
দুটির কোলে হন হইতে সে কলি লগ্নাভঙ্গ্য হুইয়া গেল। অহুয়া কলিতে কলিতে সেই হৃৎস্রোতের  
নিকট উপস্থিত হইল :

ব্রাহ্মণ হস্ত হতে হুঁকিয়া করি  
শিশু দুটি কিরি দিয়া শাহুবেত, হার,  
পিতার নিকটে তার হৃৎস্রোত হার।  
অশ্রুভঙ্গ্য মত কলিতে কলিতে  
পিতার চরণ-তার করিল কল।

প্রসন্ন করিল জালী এতক বন;  
আ নাই আশ্রয়ে এন, তবু বাবা দুটি  
নিচেহে এ ব্রাহ্মণের গায়ে হুইলেন।  
কলি অশ্রুতা কর, বা আসে কি,  
বেঁধি জীত একবার জননের মত।

ক'র শেষে হামাগুয়ে, অতঃপর যান।  
এ মহাবীরের বসিগড়দে রাখব  
যদিরা গরার করে সত্যের ডোহা,  
বাণি লরে যার চোকে গরুকে চেনে,  
তথাপি মহাবীরের ছুঁম টানসীম।

কুল তো নিতান্ত নিশ্চ, হৃদয় সে বড়ো না;  
হৃদয়টী হালি পোড়িত বেহুশ  
শব্দভরে করবে, বাবা, কুলাও চোরনি  
কালিতেছে; হারিয়ে সে না পাইল মাকে।  
তারে শূন্যে থাকিলেও খাও জনমতি। ১৪৭০-১৪৭১।

তাই ভাবছি, ঠিকই বলেছিলেন মাদ্রী : কান্ড হন হুকার! আর বলবেন না, থাকিয়ে, আমাকে অবমান করে নিতে দিন।

হুকার হুটিয়ে পড়েন মহারাজ সন্ন্যাসের আবরণী পুত্রক।

সামান্য দেবার জন্য এগিয়ে আসেন বিশ্বাস্তর। ভূমিশব্য থেকে সন্দর্ভাগিনীক উত্তোলন করবার জন্য বাড়িরে যেন হুটি হাত। মাদ্রী বিদ্রোহস্থের মত উঠে বলেন, বলেন : আমাকে সন্তোষ দেবার কোন চেষ্টা করবেন না হুকার! স্পর্শ করবেন না আমাকে। আমার সামান্য আমি নিজেই হুকার দেব।

মহাসত্ত্ব সবেবে বলেন :  
আজ জোয়ার বড় হুকের  
দিন, মাদ্রী।

বিচিত্র হাসি কুটে ওঠে  
মাদ্রীর বিশালী ওষ্ঠে। বলেন  
—কিন্তু আজই যে আপনার  
বড় সূতের দিন, প্রভু! আজই  
যে আপনার স্বীকৃতির প্রভেদ  
উজাড়িলা, পূর্ণ হয়েছে!

বিস্মিত বিশ্বাস্তর বলেন,  
কী সেই উজাড়িলা, মাদ্রী?

—মহানুভবতার আপনার  
পিতামহকে অতিক্রম করা।  
মহারাজ শিব শূন্যে নিয়ে  
হুটি চকুই দান করেছিলেন।  
অতঃপর তাঁকে হারিয়ে  
নিরেছেন। দানের উপস্থানায়  
ইতিপূর্বেই অল হারিয়েছেন  
আপনি, আজ তদুপরি উপগমন করেছেন আপনার ধর্মপুত্রের হুটি নজনের সূক্ষ্ম।

কাহিনী-চিত্র এর পর এগিয়ে গেছে জালী ও কুলজিনের পাহারার দিকে। এবার সেই কাহিনী-চিত্রের প্রসঙ্গে আসা দাক।

কিন্তু কাহিনী-চিত্রের ক্ষেত্রেও বিশ্বাস্তরের পিতামহের ছিত্রিত কথাই প্রথমে বলে নিতে হয়। এই চিত্রটিতে (১৭:২০) যেখানে পাঁচি রাখকে চকু দান করার পরে শিবরাজের অবস্থা। মহারাজা কসে আছেন একটি চন্দ্রাতপের নীচে। অসীম ব্যতায় তিনি বাম হাতে চোখে ধরেছেন নিজের চোখ; কিন্তু তার উপকরণের ভাগিয়ার রাজোচিত মর্মান্বিত অভাব নেই।

\* শাল্য অধীশ শূন্যে এই জাতক-কাহিনী বর্ণনা করার পর প্রোতুস্বল তাঁতে প্রদ্য করে—জালক, কাহিনীতে আপনি ছিলেন হারিয়েছে বিশ্বাস্তর, জন্য সকলে কে? শূন্যের উত্তরে সেই পয়সান এইভাবে ব্যক্তিগত বিরোধিতা : চোখের সোপায়ে ছিল হুকার, রাজা শূন্যেছেন ছিলেন রাজা সন্ত, অসমার ছিলেন পুত্রটী, জাহুল ছিলেন জালী, অতঃপরিকা উপকরণটি ছিলেন কুলজিন এক হুকার-কননী ছিলেন মাদ্রী।



চিত্র-১৯ঃ শিব-জাতক-মহারাজের চকু উপকরণের পরে হুকার  
(বকসান—XVII/25)।

মহারাজের সমীপে গিয়েছেন রানী, একজন সভাসদ, এবং আরও একজন পুরুষাণী। মন্ত্রী  
হস্তের যন্ত্রটি লক্ষ্য করি। চিত্রটি কাম্বুজের লুপ্তপ্রায়, তবু অঙ্গুষ্ঠাঙ্ক রেখার ভঙ্গীতে দেখেই  
চেনা হার শিল্পীর দর-করা তুলিলে। এই জনবরা চিত্রটি শিল্পী মিস, ভগোমি লাভারের  
অঙ্গুষ্ঠাঙ্ক এখানে সন্নিবিষ্ট করলাম (চিত্র-৫১)।

বিশ্বাস্তর জায়কের পুরু, বাহিরের অঙ্গুলেব বামপার্শ্বে—সেখানে দেখছি (চিত্র-৬০)  
একটি হস্তে মৃচ্ছাতুরা মন্ত্রীর স্বরাজ্য স্মরণ দিচ্ছেন। হৃদয়ে বসেছেন একটি পালশে।  
একটি ভূতা ভূপতির কাছের ধরেছে স্বরাজ্যের দিকে। স্বরাজ্যের হাতে একটি চক, তাতে  
কোন ঐক্য অথবা সূত্র। হস্তমানে হৃদয়কে আলোচনাটি বিকৃত হতে গেছে, কিন্তু মন্ত্রীর  
হৃদয়সৌন্দর্য প্রায় অটুটই আছে। তারপর দেখছি, বিশ্বাস্তব ও মন্ত্রী প্রকল্পাসদ যোগ করে  
কাজে। একজন হস্তধারণী মন্ত্রীর মাথার উপর হস্ত ধরে আছে। শতবান উৎসবে একজন  
ভিক্ষু এসেছে—তার হাতে একটি বালিক বালি। লিঙ্গের পবাকে দেখতে পাচ্ছি মহারাজ  
সজ্ঞ ও রানী পৃথকীকে। পুত্র ও পুত্রকর বিদায়-বাটা দেখছেন তাঁরা।



চিত্র-৬০: বিশ্বাস্তরের বিদায় দৃশ্য (অঙ্গুষ্ঠাঙ্ক-XVII/26)।

বিহারের ভিতরে (১৭।২১ এবং ১৭।২৬-ক) দেখছি শতমানের দৃশ্য। রাজপুত্র একজন  
প্রাথমিক নিক তারার দান করছেন। উপরে কলিঙ্গ বেশ থেকে বুদ্ধি-পণ্ডিত প্রজাদ্বন্দ্ব  
এসেছে স্বরাজ্যের কাছে (১৭।২৬-খ)। তাদের চুল-বাঁধা রীতি উৎকলবংশীয়। নীচে  
দেখছি, নির্বাসন-বাঙলাভের পর স্বরাজ্য রাজা ও রানীর কাছে বিদায় নিতে এসেছেন  
(চিত্র-৬১)। শিল্পী পাশাপাশি দুটি কক্ষে পৃথকভাবে এ বিদায় দৃশ্য দুটি এঁকেছেন।  
বাঁকন দিকে দেখছি মহারাজ সজ্ঞ বসে আছেন কাঠাসনে, তাঁর বাঁকন হস্তটি অঙ্কত নেই  
কিন্তু ভালিতে স্বাভাৱচিত মণিহার বাজনা। তবু, চিত্রের ঠিক বেহাশিময়ার মধ্যেই তাঁর

অন্তর্দর্শনের কথা ব্যাখ্যা করেছেন। চিত্র-৬৬-এ মহারাজ সজয়ের কলার ভাঁপার সঙ্গে এই চিত্রে তাঁর উপবেশনের ভাঁপটি তুলনা করলেই বুঝবেন। চিত্র-৬৬-এ মহারাজের 'সমং কার্যায়োদ্যাবৎ' ভাঁপা ; চিত্র-৬১-এ তিনি কেন স্বচ্ছন্দহস্তে পতনোদ্যম দেখতার রকম



চিত্র-৬১ : স্ববাক পিতা ও রাজার কাছে নিমন্ত্রণাণী (অক্ষতা-XVII/26c)।

করছেন। মহারাজের দৃষ্টি মনে বিগলিত করুণা! সাতজন সভাসদ বেন পদ্মবংশেট হস্তে করে এ আসে।...বার দিকের অংশ দেখছি, জননীর মহালে এসেছেন বিদ্যাস্তর। পূর্ব দৃশ্যের মত এখানেও তিনি নৃত্যনান, স্বস্ত কর। এই অংশের নিম্নভাগে দেখছি তিনজন পুঙ্খলনাকে, তাদের মধ্যে একজন অপহৃৎদের কবরীদশনরত।

বামপ্রান্তের অর্ধ-সত্তম (পিলাস্টারে) রাজকন্, মাত্রীর কাছে বিদার নিতে এসেছেন বিদ্যাস্তর।

এখানে একটি শিল্প-চাতুর্য লক্ষ্যীয়। মাত্রী ও বিদ্যাস্তর একই সভামণ্ডপে আছেন ; কিন্তু ঠিকের অলেখ্যে দুটি গৃহ-প্রাচীরের একই সমভঙ্গে আঁকা নয়। পিলাস্টারের খাঁজে মাত্রী ও প্রাচীরগত্রে কিম্বদন্তির বেন যথোচ্চি অসেছেন। অর্থাৎ দু'জনের মাঝখানে বেন আসন-ব্যবস্থার এক সমকেন (১৭।২৬-খ)। চিত্র-৬২-এ রাজকন্, মাত্রীর এবং চিত্র-৬৬-এ বিদ্যাস্তরের চিত্র দুটি পরিবেশিত হল। লক্ষ্যীয় বিদ্যাস্তরের কলার ভাঁপা পূর্বদৃশ্যে রাজা সজয়ের ভাঁপার মত। মাত্রীর চিত্রটি তো অনবদ্য এবং মাত্রীর পিছনে দিগে যে সেরেটি মুখ বার করেছে তার চিত্রটিও অনিন্দ্যসীম। মাত্রীর সম্মুখে একটি তুলুপুখী ভুল্লার, তার মাথায় পদ্মপাতা জাপা বেঞ্জা। মাত্রী সে সম্মুখের কবরীপাখ ঘননিবাস করতে ভুল্লারে-তার কপের উপর কুণ্ডলচর্চা কুণ্ডলায়িত।

এর পাশে অথবা নীচে সম্ভবতঃ শতাব্দীর একটি দৃশ্য ছিল-সেটি নষ্ট হয়ে গেছে...পরের দৃশ্যে দেখছি, রথারূঢ় রাজকন্, এসেছেন সন্ধ্যাক রাক্ষস দিগে। পিছনের আসনে দুটি শিশু-সমগ্রান।...এর ভেতরে বাজারের মাঝখানে দিগে (১৭।২৬-ঙ)। পাশাপাশি তিনটি সেকান। দৃশ্য-বৈজ্ঞান্য তার পার্শ্বটি রেখে বিদ্যারী স্ববাককে হস্ত করে নমস্কার করছে। পূর্বের সেকানটিতে একজন তৈল-স্ববসারী পাশে তৈল ঢালছে ; ভূতীর বিশপীয়ে বোকনোয়ার দাঁড়িপায়ান কিছ,

পশাট্রা ওজন করছে। সোকাশিন্দ্রি স্মিতল-গৃহের একতলার। উপরে বাতাসের এক অলিঙ্গ  
পূরকাশিনীরের চাঁড়। অথের সম্মুখে জায়গান প্রাচীর; তাবের পোশাক, শিরদ্বাণ ও দেহাকৃতি  
বিভিন্ন। একজন সম্ভবতঃ মল্লোগারী। পরের দুগো দেখছি, রাজপুত্র সপরিবারে ভূতলে  
বসারমান (১৭।২৪-৬)। অর্থাৎ রাজককে তিনি অশ্ব দান করছেন। রাজপুত্রের হস্তে



চিত্র-৩২ঃ মাত্রী, নিম্নাঙ্গের সম্মুখে  
(অঙ্কন—XVII/26a)।



চিত্র-৩৩ঃ নিম্নাঙ্গের মাত্রী অর্থাৎ নিম্নাঙ্গের  
(অঙ্কন—XVII/26a)।

কম-ভল্ল-সম্ভবতঃ, তিল-গোপ্যক। শাস্ত্রসম্মত বান করছেন তিনি। এ বৃশ্চ ও চারজন  
পথিক। তাবের কেউ বৃশ্চ, কেউ আনানিত।

উপরি-লিখিত বৃহৎ প্যান্ডের নীচে বস্ক পর্বতে রাজপুত্রের আচল্যক জীবনের তিনটি  
অবস্থা চিত্র ছিল। বৃহৎপান্ডের চিত্রগুলি প্রায় সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে। অতি অল্পই বাক্যে  
দেখা যায়। প্রথম চিত্রে ছিল, মাত্রী অর্থাৎ কল অহরণ করছেন। মাত্রীকে পশুপাশি করেববার  
আঁকা হয়েছে; অর্থাৎ শিল্পীর যত্নে রাজপুত্র এ কাজটি করে পুড়েছিল-নিষেধক-পশুপাশি  
অন্তর্ভুক্ত। স্মিতার চিত্রে কল্লুক নামে একজন লোকী নিষেধক রাজপুত্র পশুপাশিদের ম্যাক্সিয়েন্ড  
এসেছে কালী ও কল্লুককে ভিক্ষা চাইতে (চিত্র-৩৪)। ভূতীর চিত্রে দেখছি, সেই নিষাঙ্গ  
বৃহৎপান্ডের সম্মুখের দৃশ্য। পূর্ব কুটিরের সম্মুখে ভূমিতলে বসেছেন মাত্রী, আর প্রস্তুতবাসনে  
তার সম্মুখে উপবিষ্ট কল্লুক (চিত্র-৩৫)। এই তিনখানি চিত্র বেনে তিনটি কবিতা; রক্ত ও  
রেবায় রক্তের অমৃতকল্লুক পূর্ব করেছেন শিল্পী। নিম্নাঙ্গ দেবশিশুর অঙ্গকু চাইনিতে, অর্থাৎ  
জননী অমৃতকল্লুক জীবনজন্মের, বিশ্বেশ্বরের অনাসক্তিতে, চিত্রগুলি ছিল অবন্য। রাজপুত্র  
প্রথম চিত্রের সম্মুখে ভূতলে বসে থাকে, কল্লুক মাত্রী শীর্ষ, সম্পূর্ণ নিরাভরণ, বেন

বিবাহের প্রতিজ্ঞা। অপরদিকে, জুজুককে কয়েকটি রেখার টানে শিল্পী করেছেন নির্ভর, সোভী আর কুচরী! পরম অপসোসের কথা, এ চিত্রগুলি আর অমলতার গেলে দেখতে পাবেন না আপনি। এ শতাব্দীর প্রারম্ভে মিস্ জেরোমি ল্যাচার এই চিত্রগুলিকে অসংখ্য অবস্থার সের্বিঙ্গসেন, তার স্টেড বইয়ের\* অনুসরণে বর্তমান লোকের কিছু স্বার্থ প্রকাশ করেছেন মাত্র।

করো-উপেক্ষিত মাতাকে ভ্যাগ করে এর পর চিত্রের মিছিল এগিরে চলছে জুজুক-এর পশাংক অনু-সরণ করে। রয়ে গাটি গভীর হয়ে আসে। শ্বাপদ-ভীত নির্ভর জুজুক স্তম্ভ বৃক্ক আতঙ্কিত হয়ে, অসংখ্য অসংখ্য শিশুদুটিকে কেনে রাখে জনম্বক অরণ্যে, ভূতসেই। প্রাণভরে ভীত দুটি শিশু অরণ্যে জোড়ন করছে। দেব-স্নান ইন্দ্র কৃপাশরণ হয়ে কিম্বদন্তির রূপ ধরে আকর্ষিত হয়েছেন ওদের সম্মুখে। পিতাকে দেখতে পেয়ে আশঙ্কিত হয় শিশু দুটি। নিশিচেষ্টে ওরা জুজুকে পড়ে পিতৃহীন ইতস্তত জোড়ে। নিশ্চয়কালে বৃক্ক ছড় থেকে অসংখ্য করে জুজুক। শিশুদের কাছে শোনে স্নান জোড়ের পিতা এসেছিলেন। ভর হয় সোভী রাখণের—কি জানি যদি পিতৃহীন সে পুত্রকন্যাকে ফিরিয়ে নিতে চায়? অরির বন্ধ পর্বতের এলাকা পাবে হবে জুজুক অন্যর চলে যান। উপহার মূল্য গেলে সে শিশু দুটিকে বিক্রী করে দিতে চায়, কিন্তু এতটুকু শিশুকে কে জীতবাস করতে চাইবে?...পড়ে পড়ে কিরূমে রাখান সেন-সেনসভারে, তার সন্তোষ কিরূমে দুটি হস্তজগা রাখান সন্তান। বিক্রি অবশ্যী, উল্লসিতনী, কিন্তু জুজুক-এর প্রভাশা অনুসারী মূল্য দিতে কেউই সক্ষম হয় না। চিত্র-নাটকের শেষ অঙ্কে দেখছি, এক মহাকন্যার প্রবেশের ভোরাসভারে সন্তানরা তাকে আটকোলে, কলছে—এই সের্বিশম দুটি জোড় ভোমার সন্তান নয়, কেবল একে চুরি করেছ এদের?



চিত্র-১৪৪ জুজুক কর্তৃক সোভী ও কুচরীকে প্রদর্শন  
(অমলতা—XVII/26)।

জুজুক অনেক কাকূতি-মিনতি করছে, কিন্তু সেক্ষণে কণ্ঠস্থ করে না নগহশাল : জুজুককে সে নির্যাস রাখানরবারে। দেখছি, শিশু দুটিকে সভার বাহিরে বেধে নগহশাল রাখণকে হাফির করেছে মহারাজের সম্মুখে। পরন্তু বৃত্তান্ত প্রকাশ করে মহারাজ জুজুককে কলছেন—সত্য করে বল, তুমি চুরি করনি?

\* মিস্ ল্যাচারের লোক লোকি হারিয়েছে কর্তৃক সন্তানদের এবং ইতিহাস সোভাইটি কর্তৃক প্রকাশিত দৃশ্যের প্রাথমিক প্রাথমিক।



ভীত অন্ধকৈ হুইকরে খপা করে :

সন্ধান দিন পূর্বে দাতা একজন  
করেছেন প্রার্থনায় বান, মহারাজ,  
এই দুই শিশু এরা এসে সের দাস। ২ ৭৫৪ ৥

: কে বান করেছে তোমাকে ?

: নাম জানি না, তবে সে লোকটি এই দুটি সন্তানের পিতা।

শুনে সন্তোষ সকলে অট্টহাস্য করে ওঠে! একবারো মড়লে বলে,—এ সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য কাহিনী! পিতা হয়ে সন্তানকে কেউ জীবদাসরূপে বান করতে পারে?

কিন্তু মহারাজের কর্ণকুহরে সে-কথা প্রবেশ করে না। তিনি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে যোছেন। সভ্য করে, পিতা হয়ে কেউ সন্তানকে বান করে না, কিন্তু এ সমাধার পৃথিবীতে কখনও কখনও ব্যতিক্রমই যে নিরাময় শক্তিরূপ! এ বিচিত্র দুনিয়ায় অন্ততঃ একটি মানুষের কথা মহারাজ মর্মে মর্মে জানেন, যার পক্ষে এ অসম্ভবও সম্ভব!



চিত্র—৫৫৪ কিশোরী রাজকৈ মহারাজের কথা জানাচ্ছেন (অধ্যায়—XVII/26)।

অমাত্যবর্গ একবারো বলে—মিথ্যাচারী প্রবঞ্চক ভ্রাতৃগণকে শাসিত দিন মহারাজ! সে-কথার কৰ্মশাত না করে মহারাজ নথবন্দ্যলকে বলেন—সেই শিশু দুটিতে সভ্যতা নিয়ে এসে প্রথমে। তাদের কথা না শুনে আমি তো একে শাসিত দিতে পারি না। রাজ্যদেশে ধূলিমাটির দুটি দেবশিশু প্রবেশ করে, স্বাক্ষরীপিত সভ্যকণ্ঠে। দর্শনমাত্র সিংহাসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে ওঠেন সত্যনিষ্ঠ মহারাজ সন্ন্যাস

গম্য বান্ধবের নাম  
কে ঐ আসিছে মেধা? মেধের বসন  
শব্দ নিবসনোচ্ছ্বাস  
উদ্ভাসেবন বীর  
তান কি তোমার কেহ, ও কার কখন?  
উভয়েই মনেদোলা  
অণু-প্রত্যহণ্য শোনা  
উভয়েই এক হ'ল লাভের প্রকারে,  
একটি মালীর মত  
অপরটি কুল সেন  
এল কি বহুরাজ করে ওঠান পরে? ২ ৫৫০-৫৫১ ৥

অন্তঃসূত্র থেকে ছুটে আসেন মহারানী। এ যে তাঁদেরই হাজারের মালিক। শিশু দুটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে আনন্দাশ্রুতে ভেসে যান মহারাজাধিরাজ সজয় আর মহারানী পূর্বতী (১৭।২৬-৪)।

চিত্রের পর চিত্র এঁকে সর্বশেষে এই জনকর মিলনদৃশ্যে জাতক কাহিনীকে শাস্বত করে রেখে গেছেন অঙ্গলতা-শিল্পী—এই সন্তদশ গৃহ্যার। দেখছি (চিত্র ৬৬), মহারাজ সজয় বসে আছেন সিংহাসনে—তার দক্ষিণহস্তে একটি প্রস্ফুটিত পদ্ম। তার পাশে সিংহাসনে উপাধানের



চিত্র—৬৬। বায়ে পীঠে—একপাশে জুড়ক এর সর্বোচ্চ করেছেন। দক্ষিণে, উপরে—রাজসভার জুড়ক-এর কাছ থেকে সর্বমুখো হাজারের জননী ও কুমারিনকে ভ্রম করছেন (অঙ্গলতা—XVII/265)।

কাছে কুমারিন। ও-পাশে পূর্বতী, তার বায়ে (চিত্র—৬৬-এই কাছের) জননী। রাজ্যেশের হাজার-রক্ষক জুড়ক-এর প্রসারিত অঙ্গলে সর্বকিনস উদ্ভূত করে দিচ্ছে। ন্যায়নিষ্ঠ মহারাজ সর্বমুখো ভ্রম করছেন নিজ পৌত্র-পৌত্রীকে।

পূর্বতী চিত্রে দেখছি, মহারাজের আদেশে শোভাযাত্রা করে নিয়ে আসা হচ্ছে যুবরাজ বিন্দাসতর এবং মাদ্রীক। ইতিমধ্যে নির্বাসনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে তাঁদের। শেষ অবশ্যের শেষ দৃশ্যে যুবরাজের অভিষেক।

জাতকের অধিকাংশ চিত্র-কাহিনীই বিরোধান্তক। মাতৃপোষক-জাতক, চন্দ্রপদ্য-জাতক প্রভৃতি যে কবিতা মিলনান্তক কাহিনী আছে, সে কবিতা ভাই বিশেষভাবে ভালো লাগে। সে

হিসাবে বিশ্বাস্তর-জাতকেও কাহিনী শেষে দর্শক স্মৃতির একটি নিশ্চয়্য ফেলবার সুযোগ পান।

এ নটক যদি কখনও মঞ্চস্থ করেন, তবে প্রয়োজনবোধে কিছু যোগ ও বিয়োগ আপনি করতে পারেন। শুধু একটি বিষয়ে অগত্য-শিল্পীর নির্দেশ অতিক্রম করতে পারবেন না। সে হচ্ছে ঐ নির্ধারিত লোকী স্বরূপ-এর সুসঙ্গতা। ওর ঐ শব্দনি-ভাষা, ছায়ালাপ মাড়ি, ছিন্ন ছিন্ন আর মৃদু স্বরিত্র এ নটকের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাই আমার একান্ত অনুরোধ, এমন কোন অভিনেতাকে ঐ ভূমিকাটি সুশরণের অধিকার দেবেন না—স্বকর্মদ্বারা দর্শনে বার বিরলকেশ মস্তকে সম্রাটের কঠোর মত চুলচুলি খড়্গ হয়ে না ওঠে।

এর পর কয়েকটি স্বকর্মভিত্তির আলোচ্য (১৭/১৫) এবং তারপর মহিষ-জাতকের একটি ক্ষুদ্র কাহিনী (১৭/১৬)। বোধিসত্ত্ব সেবার এক ভীমকালিত মহিষের রূপে অবতীর্ণ। কিন্তু কহবার অবতীর তিনি। যে অরণ্যে তিনি বাস করতেন, সেখানেই থাকত একটি অর্বাচীন কানর। সময়ে-সময়ে সে বোধিসত্ত্ব-মহিষের পিঠে চড়ে কলত—নানানভাবে উত্থাপন করত তাঁকে। দয়ার অবতার মহিষ কোন প্রতিবন্ধ করতে না। এইভাবে অজ্ঞানতার বানরটি এতই অজান্ত হয়েছিল যে, তাঁকে দেখলেই সে ছুটে আসত। একদিন বোধিসত্ত্বের বদলে অন্য একটি অজ্ঞান মহিষ সেই অরণ্যে বিচরণ করছিল। অর্বাচীন বানরটি লক্ষ্য করের পর অবতীর্ণ হইল—সে বানরটি মহিষের পিঠের উপর চড়ে বসে আঁচড়তে থাকে।

কিন্তু মহিষ তৎক্ষণাৎ তাঁকে পিঠ থেকে ফেলে দেয় এবং শিঙে দিয়ে তার উপর ছেঁদ করে ছাড়া করে বানরটিকে। হুটী জিহ্বে এই ক্ষুদ্র কাহিনীটি এতকয়েক অজান্তর শিল্পী। নীচে দেখছি, দয়ার অবতার বোধিসত্ত্ব-মহিষের পিঠের উপর উঠে বসলে কানর, দুহাতে মহিষের দুই চোখ টিপে ধরেছে। আর তার উপরের গুল্মে দেখছি, কন্যার দীর্ঘ পদদলিত করতে যাচ্ছে বানরটিকে। জাগ্রতকার তথা শিল্পীর ক্ষমতা এই দুই ধরনের দৃষ্টান্ত সোচ্চার। অধিকার মস্ত দীক্ষিত এই নির্জন গুল্মাকারী বৌদ্ধ প্রথমবার উপর কোনভাবে অজ্ঞানতার করলে তাঁরা হয়তো প্রতিশোধ নেবেন না—কিন্তু বার নিম্নে চন্দ্র-সুর্ষ উঠছে, বীর অশ্রুধারাধীন এ গুল্ম-বিহারের লক্ষ্যবস্তু লক্ষ্যের-ওর হুঁত চলে অব্যাহত গতিতে—তাঁর বিচারের হাত থেকে উপহার পাবার উপায় নেই।

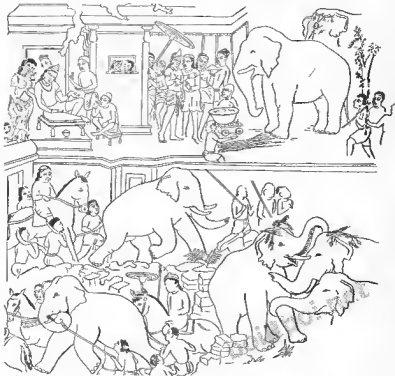
একটা কথা ভেবে দেখতে হবে—এই মহিষ-জাতক কাহিনীতে শ্রম-নির্বাসন। এটি সিংহল-অবদানের ঠিক পরই অর্থাৎ সিংহল-অবদানের বিশালারতন প্রদানের পূর্বে করে কি বৌদ্ধ শিল্পীর মনে হয়েছিল, বৈদী নির্বাচনের এ কাহিনীটি বৌদ্ধ ধর্মের মূলকথা জে কই কত করছে না? হাতীর বদলে হাতী, হাতীর বদলে হাতী—এই কি বুদ্ধদের কথা? বুদ্ধদের জে ভা কলন নি, বলেছেন—যে তোমাকে ভালবাসবে তাকে ভালবাসে—যে তোমার প্রতি শত্রুতা সাধন করবে তাকেও ভালবাসে। তাই কি শিল্পী ঐ সিংহল-অবদান জাতকের পরে এই ক্ষুদ্র চিত্রটি এতক মনের ভাব লেখা করতে চান?

উপর প্রাচীরে পূর্বপ্রান্তেও হুঁত জাতক-কাহিনী। উপরে শ্রম-জাতক (১৭/১৭) এবং নীচে শ্রম-জাতক (১৭/১৮)। শ্রম জাতকের চিত্রমাণি নষ্ট হয়ে গেছে—সে কাহিনী বলে অব্যাহত। শ্রম-জাতকের কাহিনীটি ইতিপূর্বেই বলেছি।

শ্রম-জাতকের নীচের অংশ আছে আরেকটি জাতক-কাহিনী। এটি সম্পূর্ণ অকত অবশ্য্য আছে। এটির নাম মাতৃশোক-জাতক (১৭/১৯)।

বোধিসত্ত্ব সেবার এক শ্রেষ্ঠবর্ণের মহাগজরূপে হিমালয়ে কন্দ্রগ্রহণ করেছেন। তাঁর পিতা ও মাতা উভয়েই অন্ধ। কিশোর শ্রমের মতোই তিনি অন্ধ পিতামাতার জন্য বন-কাশের থেকে আহ্বান সংগ্রহ করে আনেন। পিতামাতার আহ্বারান্তে ক্ষুধাশ্রিত করেন। একদিন বোধিসত্ত্ব গজরাজ দেখতে পেলে, একটি কাঠুরীয়া সেই গহন অরণ্যে পথ হারিয়ে উদ্ভ্রান্ত

হাতো ধনে বনে ছুটে বেড়াচ্ছে। করুণার অবতার ঘোষিত শুই করুণারিয়াকে পিঠে করে  
 বনপ্রান্তে পর্বত পৌঁছে দিয়ে এসেন। করুণারিয়ার বারান্দায় উপস্থিত হয়ে শুনে পেল যে,  
 কাশীরাজ রত্নদত্তের রাজহস্তীটি পূর্বরাতে মারা গেছে। সে রাজ-  
 সকাশে উপনীত হয়ে বলল, অরুণ অভ্যন্তরের অধিবাসী এক মহাকরে  
 গভীর সন্ধ্যা সে দিতে পারে। রাজনির্দেশে সেই কৃতঘ্ন করুণারিয়ার শিকারীদের পক্ষ দেখিয়ে  
 নিয়ে এল সেই গভীর অরুণে। সুকোশলে শিকারীর দল শুকলে আশ্ব পড়ে ফেলে ঘোষিত



চিত্র-১৭১: মহাশয়ক মাতক (অঙ্কন-XVII/10)।

গজরাজকে। করুণার অবতার ঘোষিত কোন কথা দিলেন না। গজরাজকে নিয়ে আসা হল  
 রাজার হাতিশায়ে। কিন্তু অল্প কিছুদিন পরেই হস্তিশালার স্বক্ক এসে কাশীরাজ রত্নদত্তের  
 কাছে দিলেন করে, হুত হস্তী রাজবাটীতে আসার পর থেকে লম্বাঘন করেনি—উপবাসে সে

প্রাণ নিতে উঠাত। কাশীরাজ কৌতূহলী হয়ে শব্দে এলেন হাতিশালে। সত্যই ধরে ধরে অহাৰ্য সাহসে আছে অচ্যুত কণামার গ্রহণ করছে বা সেই অনিন্দ্যকান্দি শ্বেতহস্তী। মহারাজের মনে হল, এর পিছনে নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। তিনি অনুভবের অবশেষ খিঁচিয়ে হস্তীর শৃংখল সেঁকেন করে দিতে—এক বন্ধনযুক্ত হস্তী কোথায় যায়, কি করে তার সম্মান রাখার জন্য দুঃতামারী অশ্বারোহীদের নিযুক্ত করলেন। যুক্তিপ্রতিমার গজরাজ ঘিরে গেলেন নিজের নিযুক্ত অঙ্গরাজসে। সেখানে দ্বিগুণ দেখতে পেলে, তাঁর অশ্ব পিতামাতা শাতবিন উপবাসে মরগোন্দ্ব্যে। গজরাজ তৎক্ষণাৎ শূণ্ডে করে জল নিয়ে এসে তাঁদের গজকুন্ডে নিশ্চিন করলেন—আহাৰ্য-দানীরে তাঁদের শূন্য করে জোড়লেন।

সবোপ পেরে কাশীরাজ শব্দে এলেন মাতৃভর বোধিসত্ত্বের কাছে। বোধিসত্ত্বের সঙ্গে তাঁর বন্দ্য হন। মাতৃগোবক বোধিসত্ত্বের কাছে আভিষেকের অনেক অনুশাসন শুনলেন রাজা।

এই কাহিনী অকল্পনে যে চিত্র-কাহিনী (চিত্র- ৬৭) এখানে আঁকা হয়েছে, তা সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় রয়েছে অক্ষত। চিত্রে দেখছি, শৃংখলাবদ্ধ গজরাজকে নিয়ে যাত্রা হচ্ছে কাশীরাজের কাছে। দেখছি, রাজার হাতিশালে প্রজাবন্দ উপবাসী গজরাজকে; তাঁর চতুর্দিকে ইকুন্দ, কদলীকাণ্ড, চাক-নাথানো ট্রান্স-জাতীয় গজকে আনা হয়েছে নানান আহাৰ্য, অন্য গজরাজ উপবাসী। সম্মুখে বিশ্বব্রাহ্মী হাতিশালার রক্ষক। পরবর্তী প্যানেলে দেখছি, কাশীরাজের দরবারে হাতিশালার রক্ষক হস্তকে তার অশুভ অভিজ্ঞতার কথা কানী করছে। রাজা প্রথমতঃ সিংহাসনে উপবিষ্ট। দেখছি, হাতটুকু শৃংখলমুক্ত করে দেওয়া হয়েছে, হৃৎশম্মাসে গজরাজ দুটো চলেছেন অরক্ত-অভিমুখে। গজরাজের এই দুঃসংগত গমনভঙ্গিটি অশূর্ণ; তাঁর পিছনেই অশ্বপুটে দুজন রাজানুচর; তারা একটি নগর-ভোগ্য অভিজ্ঞ করছে। বন্ধন-যুক্ত হস্তীর সম্মুখেও দুজন অজমারী পরায়িত অনুভব। শেষ দুঃসংগত দেখছি মাতৃপুত্রের মিলন-দৃশ্য। এই স্বভাবচিত্রটির মাধ্যমে কানী করা অসম্ভব। মানুষ নয়, কোন জানোয়ারের চিত্রে এ-জাতীয় ভাবগুরুতা অন্য কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। গজরাজ দাঁড়িয়ে আছেন, অক্লেশে দুটি চক্ষু বুজে এসেছে তাঁর। শূণ্ডে করে জল নিয়ে তিনি আবেগপূর্ণ ঢলছেন অশ্ব পিতার গজকুন্ডে। তাঁর সম্মুখে অশ্ব পিতা শূণ্ড উন্মোচিত করে আশ্রয় করছেন পুত্রের দেহ-সৌগন্দ্য। রাজা তাঁর শূণ্ডে হুলিয়ে দিচ্ছেন পুত্রের অশ্ব। শিল্পী অশ্ব পিতামাতার চেপে আরকেননি—কিন্তু অশ্ব মানুষ যেভাবে হৃৎশিখীনতার পরিপূর্ণ হিসাবে প্রিয়জনের গারে হাত হুলিয়ে স্নেহ-জলবাস্য জ্ঞাপন করে, একেই শিল্পী সেই কৌশল প্রয়োগ করে ঐর পিতামাতার মনোভাব স্নানভাবে হৃৎশিখিয়ে তুলেছেন।

শ্যাম-জাতকে যে-কথা বলেছি, এখানও তাই বলতে ইচ্ছা হচ্ছে। এখানে কৃত্রিম কার্টুরিয়াকে কমা করেছিলেন বোধিসত্ত্ব—ঐকনির্দেশে হস্ত ইয়োঁছিলেন তিনি। সিংহল-অন্যানে রতক্ষরী বৈরা নিশীতলের চিত্রিত আঁকার পর শিল্পী যেন অনুভবত রূপে হয়েই এই সব অহিংসা, কমা-মহানুভবতার ভাঙক কাহিনীদুটি বিরে ভাঙতে তুলেছেন এ গৃহ-বিহারের পার্বত্য প্যানেলদুটি।

সম্পদশ গৃহের আর একটি ভাঙক-কাহিনী দেখেই এ পর্বের শেষ করার আশ্রয়। এ কাহিনীটি—হংস-ভাঙক। শ্বিতীর গৃহেতেই এ কাহিনীটি আমরা আলোচনা করছি। কিন্তু সে গৃহের-অঁকা ছবিটি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার তা আমরা সন্দেহজন করিনি। এবার এই সম্পদশ গৃহের সামনের বাগানের বাগানপথে এ চিত্রটিকে অনেকটা ভালো অবস্থায় পেয়েছি, আর তাই সেটি এখানে সরাসরক করে দিলাম (চিত্র-৬৮)।

চিত্রে গজরাজকে দেখছি, রাজ-শিকারী গৃহেতে দুটি শূর্ণহংস ধরে আনছে। তার মাথার উপর অত্যন্ত পলায়নপর হংসকাক। স্বাধিকো রাজহংস। কাশীরাজ হংসে আছেন সিংহাসনে, ঠিক তাঁর পিছনেই রানী কেমারেশী। তাঁর মাথার রাজহংস। কেমার পাশেই একজন চমর-হাটিনী। রাজার সম্মুখে একজন অমাত্য এক আশেপাশে আরও কয়েকজন নরনারী। রাজ-

সম্পত্তির সম্বন্ধে দুটি আসনে দুটি লোকহইবে। যেখিনিত্ত্ব একা তাঁর প্রধান সেনাপতি। রাজা ও রানীর হাতের মস্ত্রাদুলি লক্ষণীয়। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, নৃত্যশিল্পে যেমন বিভিন্ন মস্ত্রের বিভিন্ন ব্যঞ্জন আছে, অলঙ্কার চিত্রের বিভিন্ন চরিত্রেও তেমনই শব্দমাত্র হাতের মস্ত্রের নানাজাতের মনের ভাব ব্যক্ত করে। তার ভাষা বৃদ্ধিতে হলে প্রীতিমত্ত কবনব্যাপ্ত করিতে হবে। অলঙ্কারের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ললিত প্রিয়ঙ্ক বসোছিলেন, “অলঙ্কার শিল্পী প্রীতি শিল্পের আদর্শের কোন ধার ধারেন না, তাই শরীর-সংক্রান্ত মাসাজ্যোগের নিম্নত্ব রূপায়ণে তাঁকে কখনও মনোনিবেশিত হইতে হইত। মাসাজ্যোগে বাস্তব দৃশ্য বা বস্তুকে তিনি যে ভাবে প্রত্যক্ষ করতেন,



চিত্র—৬৮ হইল-কারক (অলঙ্কার—XVII/11)।

অলঙ্কারভাষিতে তাই রূপায়িত করতেন। চীনা চীনা মননমূলকে আরও দীর্ঘায়িত করার প্রচেষ্টা যেন সব শিল্পীরই একটা সাধারণ ব্যতিক্রম; যদিও ফেন্সি-ইংরেজি বর্ষকের চোখে প্রাজ্ঞাশঙ্কর মামুদয়ের ঐ অসম-পরিষ্কার হয়ে বসার বিচিত্র ভঙ্গিটাকেই যথেষ্ট করি আরও বাড়ানুটি বলে মনে হবে। হাতের মস্ত্রের অভিজ্ঞাত্যের ব্যঙ্গনা বিবর্ত হইতে গঠিত। তারতীয় ধর্মবিশ্বাসের সম্বন্ধে যার প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে, তার কাছেই ঐ অসম-পরিষ্কার বস্তু সোচ্চার। সন্ধ্যাপে বলিতে পারি, ব্যঙ্গনাময় মনোবল, হাতের ডাল, ও করালমূল আকণ্ঠে ঐক্যবোধ মনের ভাব ব্যক্ত করে—কখনও প্রার্থনার, কখনও বাসনাসে, কখনও আশঙ্কায়, কখনও শাস্তির, কখনও বা সোহাগে আনোতে।

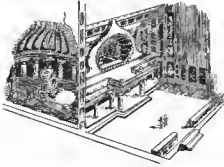
অঙ্গসজ্জার বিভিন্ন চিত্র থেকে কয়েকটি হাত-পায়ের মূদ্রা এখানে সংযোজিত করেছি  
চিত্র—৬৯-এ।



চিত্র—৬৯। অঙ্গসজ্জার হাত-পায়ের মূদ্রা (বিভিন্ন চিত্র থেকে সংকলিত)।

অন্তঃস্থ-প্রতিষ্ঠা বিহার

উনিবিংশত শতাব্দীর প্রাথমিক দশকটি ছিল এখানে সম্মিলিত করা গেল। চিত্র—৭০-এ সম্মিলিত  
অংশ (কানন) এবং কিছুটা ভিতরের অংশ দেখা যাচ্ছে। এ-কন্যা কলনর পূর্বভাগের স্থানিকতা  
অংশ অপসারিত করে নিতে হয়েছে। শূন্যকক্ষ-পথে রবিবারি মেননভাষে ভিতরে প্রবেশ  
করে, তাও দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে। ভিতরের হাল-কামরার বামদিকস্থ শতশতাব্দীকৃত ভবন  
সমান্তরালে কলনর কেটে ফেলা হয়েছে। তাতে দুটি সুবিধা হয়েছে। প্রথমতঃ, পিছনদিকে  
উনিবিংশত শতাব্দীর  
অবস্থিত শতাব্দীকৃত ভবন স্পষ্ট দেখতে পাই; দ্বিতীয়তঃ, শতশতাব্দী  
বিভিন্ন উচ্চতার কীর্তি হওয়ার সম্ভবতঃ গঠন-বৈচিত্র্য সম্বন্ধে সহজে  
ধারণা করা যাবে। অর্থাৎ, পেন্ অংশ চৌকোয়; পেন্ অংশ গোলাকৃতি, কোথায়  
আটকোয় তা দেখা যাচ্ছে। শতশতাব্দীকৃত শব্দে করে যে বীম বা কীড় (আর্কিট্রেড)  
আছে, সেটিকেও দেখা যাচ্ছে। আর সেই বীমের উপর অবস্থিত শারি শারি খিলান-জাকারের  
বীম কিভাবে ছাদের ভার বহনের জ্ঞান করছে, তাও অনুমান করা যায়। আগেই বলেছি,



চিত্র—৭০ঃ উনিবিংশত শতাব্দীর কানন ও অংশভবন।

শতশতাব্দী ছায়ে ছায়া বহন করছে না। বলে, শতশতাব্দীর উপর ঐ আর্কিট্রেড এক ভর উপর  
অবস্থিত ঐ খিলানগুলির কেউই ছাদের ভার বহন করছে না। কালের কঠোরতা বা হৃদয় গ্রাসের  
অনুক্রমে প্রস্তুত-শিল্পী প্রথামাফিক এগুলি দেখাই করে গেছেন-মঠে ১ মিঃ পার্শ্বি ব্লাউন  
বলেছেন, 'ওদের হাত ছেনি-হাতুড়িতে নিম্নত আকলেও কদের মনে গড়ে গেছে সেই আদিম  
করাড-কাটালির যুগের স্থিতি।' আমার কিন্তু মনে হয়নি যে, সেইটাই একমাত্র কারণ।  
অধুনিক স্থাপত্যবিদ্যা বলে যে, কোন স্থাপত্য-কর্মের (engineering structure) ভারবহনের  
যত্নেপূর্ণ তাকসা করলেই স্থপতিত্বের কর্তব্য শেষ হয় না—তাঁকে এমন ব্যবস্থা করতে  
হবে যাতে গৃহবাসীর মনে হয় যে, সেটি ভেঙে পড়বে না। গৃহবাসীর মানসিক শান্তির জন্য  
অনেক স্থপতিবিন্ অধুনিক বাতীর কল্পনামিতার ব্যাকশার দ্বিষ্টে বীমের (জরবাহী নয়)  
আজাস দেখান। আমার মনে হয়, অনন্তর স্থাপত্য-শিল্পী এই কারণেও ঐ শতশত ও বীমগুলি  
দেখাই করেছিলেন।



সে বাই হোক, আশা করি, স্থানে ও এলিভেশনের বললে অথবা নিছক ফটোগ্রাফের পরিবর্তে এই কাল্পনিক চিত্রটির মাধ্যমে ঐ পুণ্য-অলিভের স্মৃতিস্তম্ভ ভাল চোখে থাকে।

প্রবেশ-পথের আর্থিক সম্বন্ধ-চিত্র দেখা যাচ্ছে চিত্র-৭১-এ। আশ্বিনা অঁকা হয়েছে ডাম্বর্বেশ্বর মূর্তিটি ভাল করে বোঝার উদ্দেশ্যে। স্মৃতিস্তম্ভের একটু ইঙ্গিত রয়েছে উপরের দিকে। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে, চিত্র-৭০-এর কোন অংশটি চিত্র-৭১-এ বড় করে দেখানো হয়েছে।

উল্লিখিত টেম্পলের সম্মুখে যে প্রশস্ত চক্র, সেখানে সম্ভবতঃ পূর্বে আর একটি প্রবেশ-ভোরণ ছিল। বর্তমানে যেটি প্রবেশ-ভোরণ জগত সম্মুখে আছে একটি ছোট বারান্দা, ইংরেজীতে বাকে বলে 'পোরটিকো'। তার দু'পাশে দু'টি শতম্ভ। পোরটিকোর পরে একটি অলিন্দ, তার



চিত্র-৭১ঃ উদয়গিরি টেম্পলের প্রবেশ-পথ।

বাহিরের দিকে এক-সারি শতম্ভ, ভিতরের দিকে পর্বত-পাশে খোদাই-করা দু'খণ্ড ও বোধিসত্ত্বের মূর্তি। মাঝখানে প্রবেশ-পথের ঠিক উপরে অবস্থিত মূর্তি স্মৃতিস্তম্ভ। প্রবেশ-পথ দিয়ে এখান পুণ্য-টেম্পলের ভিতরে আসা গেল। দেখছি, দু'পাশে দুই-সারি শতম্ভ, সর্বসমেত পনেরটি। মাঝখানে, প্রবেশ-পথের বিপরীত প্রান্তে-শতম্ভ। শতম্ভশীর্ষে শূন্য, বোধিসত্ত্ব, নাগ ও গন্ধার্বের মূর্তি খোদাই করা। এ টেম্পলও কিছু কিছু চিত্র এক সময়ে ছিল, বর্তমানে কিছুই দেখা যায় না।

এবার প্রবেশ-পথের সম্মুখ-দৃশ্যটিই যাকে বলে গৃহ-ঠেতের 'ফাসাদ', তবে বর্ণনা করি। সুখ-গন্যকের হৃৎপথে দুটি গম্বব-মূর্তি। লগন করলে দেখা যাবে, মূর্তি দুটি ভিন্নসময় বা 'সিমেণ্ট' রক্ষা করছে বটে, কিন্তু একটি অপরটির ঠিক বিপরীত ভঙ্গি (opposite image) নয়। বেকেন সমগ্র শিল্পী শ্রীভাস্করের খ্যাতিতে অল্প-প্রভাবের সংস্থাপন একই রকম করতেন, এ-মূর্তি জনাকিকে হেলে থাকলে ও-মূর্তি ঝাঁকি হেলে থাকত; কিন্তু অলমতার জাত-শিল্পী তা করেননি। আরও লক্ষণীয়, ঘাঁটকের মূর্তিটি নারীমূর্তি, অথচ ডানদিকের মূর্তিটি (মোট চিত্র-৭১-এ দেখা যাচ্ছে) পুরুষের। এই গম্বব-মূর্তিসমূহের উপরে ও নীচে জাঁক সমান্তরাল মূর্তি কড়ি (fringe)। সেখানে ছোট ছোট সুখ-গন্যক-অনুরূপে অলমকরণ; তার নীচে, দক্ষিণদিকে (চিত্র-৭১) দেখছি একটি শত্ৰুপের ভিতর বন্দ্যমান বৃদ্ধমূর্তি। ঠেত-অভ্যন্তরস্থ মূল শত্ৰুপের সঙ্গে এর সাদৃশ্য হবে বেশী। বৈল্যদৃশ্যও বড় কম নয়। ভিতরের শত্ৰুপে বৃদ্ধমূর্তি সম্পূর্ণ প্রতিসন্দ-মূলক (চিত্র-৮৭), অথচ এখানে তাঁর দক্ষিণহস্তে বরাদনের ভাঁগ, বাহুসহ বৃকের কাছে। হার্ম'কার পরিবর্তন-গতও ঐক্যবোধ আছে। এই শত্ৰু-বৃদ্ধের হৃৎপথে দুটি অলমকরণ অর্ধ-স্তম্ভ বা পিলাস্টার। অর্ধ-স্তম্ভের ওপর্যন্তে কুলুপিহস্তে দেখছি, বৃদ্ধসেবকে ডিঙা দিচ্ছেন বগবতী ও সাহুল। সম্ভবত গৃহের প্রান্তে চিত্র গোপা-সাহুল ও বৃদ্ধসেবের (চিত্র-৫৭) সঙ্গে এই ডাক্ষ্যমূর্তি তুলনীয়।

কতৃৎ সময় ফাসাদটি বৃদ্ধ, বোবিস্ত, নাথ, গম্বব, কিম্বদ মূর্তিতে আঘাতের মতো। হুল-শতা-পাতার বাহারই বা কত! সমস্ত কারুকার্যই পথের-কটে কল-হেনি-হাতুড়ির চতুর্ন, রঙ-তুলির নয়। বৃদ্ধাবিশেষে দেখতে দেখতে প্রাণের আশ্রয়ই মাঝ নত হয়ে আসে। শেষ গুড়বৃগের প্রান্ত ডাক্ষ্যবের অন্যতম নিদর্শন এই ফাসাদটি।

বিশ্রান্ত বিহারটির সম্মুখেও দুটি স্তম্ভ ও দুটি অর্ধ-স্তম্ভ। অলমকের সঙ্গে কাঠের কড়-বস্তুর অনুরূপ। এই গৃহের বাহ্যেটি গড়-গৃহের আছে। মূল গড়-গৃহের আছে বিশ্রান্ত বিহার বৃদ্ধমূর্তি। ধর্মচক্রমূর্তি, চরণতলে হরিণ-শিল্প। গড়-গৃহের দক্ষিণে একটি খোকাইকর মূর্তি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। স্নান ও স্নানীর মূর্তি। স্নানীর হাতে চতুস্তোণ একটি পাশা, স্নানীর উপর ডান হেঁচকার দাস্ত করতে উপাধি। তাঁর হুল-বিশার কারুকার্য লক্ষ্য করার মত।

একাংশে বিহারের সম্মুখ অলিন্দটি ভেঙে পড়েছে। তবু যে দুটি স্তম্ভ এখনও দাঁড়িয়ে আছে, তাতে অতি সুন্দর নকশা-কাঠ কারুকার্যের সঙ্গে দেখতে পাওয়া যায়। উপরের একাংশে বিহার 'ব্রহ্ম' নাপরাজা ও স্নানীর মূর্তি খোকাই করা। হুল-কাঠটি প্রায় বস্কির। সর্বসমেত দ্ব্যধারি স্তম্ভ, সোড়ালির অলমকরণ শ্রিতীয় বিহারের অনুরূপ। এই গৃহটিও ঐশ্বর্যের বড় শতাব্দীতে খেলিত। গৃহের ভিতর চোখটি গড়-গৃহের আছে, কেন্দ্রীয় গড়-মূর্তির বৃদ্ধমূর্তি-পদ্মাসন, ধর্মচক্রমূর্তি।

দ্ব্যধারি বিহারটি বড় শতাব্দীর, সম্মুখবর্তী অলিন্দটি ভেঙে পড়েছে। হৃৎপথে দুটি অর্ধ-সমাপ্ত গড়-গৃহ। কেন্দ্রীয় গড়-গৃহের প্রলম্বিতপন উপস্থিত বৃদ্ধমূর্তি। এই গৃহের দক্ষিণ প্রান্তের পুনরায় একটি বৃদ্ধমূর্তি-পদ্মাসন, ধর্মচক্রমূর্তি। উপরে একসারি মল্লবী-বৃদ্ধ। এই গৃহের কিছু কিছু প্রাচীর-ভিতের নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। কতমানে তার পঠোশর করা অলমকরণ।

প্রোবিশ্রান্ত বিহারটিও সমসাময়িক। অলিন্দে কারুকার্যময় চারটি পূর্ণকার এবং দুটি অর্ধকার স্তম্ভ। সেগুলির স্তম্ভমূল চতুস্তোণ, মধ্য অংশ দেয়াল-কাঠ উপরে আমলক ও এলাকাপল। আকারে এটি একাংশে বিহারের প্রায় সমান। এখানেও গৃহের অভ্যন্তরে দ্ব্যধারি স্তম্ভ। বিহারটি অসমাপ্ত। মূল গড়-মূর্তির কোন মূর্তি নেই। সম্ভবত, অসমাপ্ত অবস্থায় এটি পরিভার হতোছিল, মূর্তিটিকে ম্পারিত করার পূর্বে।

আগনি যদি জ্বালায়, উত্তপ্ত, অগ্ন্যপক বা এই জাতীয় কিছু হন, তাহলে চতুর্বিংশতি বিহারটিকে আগনি এড়িয়ে সেতে পারেন। কিন্তুও, এ অসমাপ্ত বিহারে বর্ণনীর কিছুই নেই।

কিন্তু বাস্তবিক্য অথবা স্বপ্নভিত্তিক দিকে যদি আগনার ঘোঁক থাকে, চতুর্বিংশতি বিহার তবে কার চতুর্বিংশতি বিহারটি আগনার গড়ে অবশ্য চমকিত। কারণ, এটিকে ভালভাবে নিরীক্ষণ করলে আগনি বুঝতে পারবন, কিভাবে বৌদ্ধ প্রথমের দল এই সারি সারি গৃহায়নিন্দনটিকে স্থাপনিত করেছিলেন। এই বিহারটি অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় পরিত্যক্ত; কিন্তু শেষ হলে এটি হত অজন্মতার বর্নবহু বিহার—২০ মিঃ x ২০ মিঃ।

কেনন করে এই গৃহায়নিন্দনটিকে প্রথমত খনন করা হত, তা যেকোনোর চেষ্টা করা হয়েছে চিত্র—৭২-এ। সামান্য বাড়ীতে কাল শব্দে হয় বিনয়াদ থেকে, শেষ হয় ছায়ে। কিন্তু কৃত্রিম গৃহায়ন কাল শব্দে হয় উপর্যগকে এবং প্রথমত শেষ হয় নীচে এসে। ইট-কাঠ-পাথরের বাড়ী প্রথমত গড়ে ওঠে; সে হিসাবে কৃত্রিম গৃহায়ন কাল গড়ে 'বাসে'। প্রথমেই খনন করা হয় স্তম্ভ-গুড়ির শব্দবোধ, কৃত্রিম খাম ও সিলিং। চিত্র—৭২-তে সেক্ষেত্রাল এলিভেশনে দেখছি ১-১-১ রেখার খনন করা হয়েছে। কিন্তুও, এই অবস্থাতেই কাজটি পরিত্যক্ত হয়। দেখা



প্লান

ক. খ. গ. রেখার কানি দেখান

চিত্র—৭২। গৃহায়নিন্দন কিভাবে খনন করা হয়েছিল।

যাচ্ছে, কিভাবে সিলিংকে খোলাইয়ের নকশা করা হচ্ছে। প্রথমত উপরের অংশে, স্তম্ভশব্দীর্ণ, সিলিংকে ব্যবহারী নকশার অলঙ্করণ খোলাই করা হয়ে গেলে, তখন গৃহায়ন গভীরতা বাড়ানো হত। অর্থাৎ, কাজটি পরিত্যক্ত না হলে, পরে ২-২-২ রেখার খনন করা হত। এইভাবে প্রথম উপর থেকে নীচের দিকে খনন করতে করতে প্রথম ০-০-০ রেখার একদিন গৃহায়নের মেঝের সমতলে কাল শেষ করা হত।

একদা চিত্র—৭২-এ অঙ্কিত প্রাথমিক দেখা যাক। যে অবস্থায় গৃহায়নটি পরিত্যক্ত হয়েছে, তার প্ল্যান মোটা কালিতে আঁকা হয়েছে, ১-১-১ রেখার। শেষ হলে গৃহায়নটির প্ল্যান হত ০-০-০ রেখার। এখানে লক্ষণীয়, অসমাপ্ত অবস্থায় সব লম্বাটে কতকগুলি প্রাচীর খোলাই করতে বাড়ী গড়ে গেছে। প্রথম অবস্থায় এগুলি ইচ্ছা করেই খনন করা হত না। শেষ পর্যন্ত এই প্রাচীরগুলি ছেড়ে ফেলা হত। চতুর্বিংশতি গৃহায়ন অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় এখন পরিত্যক্ত হয়, তখনও এই প্রাচীর-প্রাচীরগুলি ছেড়ে ফেলা হয়নি। প্রথম অবস্থায় এই প্রাচীরগুলি ছেড়ে বাড়ার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। বিভিন্ন স্থানীয়ভাবে খনন শিল্পীর দল কাল করতে, তখন একজন কারিগরের ছোট-বড়াকির আঘাতে ছিটকে-বাগরা পাথরের টুকরোয় যাতে পার্শ্ববর্তী শিল্পী আহত না হন, তাই এ ব্যবস্থা।

পূর্বাবস্থায় বিহারটিকে এখন বাড়ার স্পষ্টতা নেই। এটি কর্কসের। সম্মুখ-ভাগে তিনটি পরস্পরবর্তী বিহার প্রবেশদ্বার ছিল। এটিও অসমাপ্ত অবস্থায় পরিত্যক্ত।

কর্তৃবিংশতি গৃহায়নটি খ্রীষ্টোত্তর সপ্তম শতাব্দীতে অজন্মতার নির্মিত শেষ চেষ্টা। কাসাদের সম্মুখে বিস্তারিত চিত্র। সম্মুখস্থ অলিঙ্গ ও শোভিতকোণটি ছেড়ে দেছে। ভিত বা দ্বিধা

প্রক্ষেপে এক-সারি বাহন-মূর্তি খোদাই করা। কসাপের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন মূর্তির বাহনমূর্তি খোদিত। ঠেঙা-গরাকের দু'পাশে দু'টি উপবিকিৎ যক্ষমূর্তি। তাদের নড়ানোঁতে বিদ্যে বাহনমূর্তি দু'টি বাহনমূর্তি—বজ্রবাহন। তাদের দুই প্রান্তে পুনরায় দু'টি বৃহদাকবল বাহনমূর্তি—প্রতি ৬ মি. দীর্ঘ। ঠেঙা-অঙ্গাশতের সব-সমেত আটগুটি স্তম্ভ আছে। প্রবেশ-পথে দু'টি অক্ষকরম-বাহন আটবেলা স্তম্ভ। স্তম্ভশীর্ষের প্রান্তে দু'মুদ্র দু'টি নারীমূর্তি। অন্যান্য স্তম্ভপ্রাঙ্গণে একই জাতের, মহাভাগ গোলাকৃতি, নকশা-কাঠে ও পল-ভাসো। শীর্ষদেশে আমলক, অর্ধ-পদ্ম এবং সর্ষপারি দু-দুহা জায়গে। স্তম্ভের উপরে কাকুটিতে (যাকে পাণ্ডাজা ভদ্রার স্থান triforium) বাহনমূর্তি ও নানান জাতের নকশা।

প্রবেশ-পথের বিপরীত দিকে অবস্থিত হ'ল শতশতের কৰ্মী। পরবর্তী পরিচ্ছেদে করা হবে। (ডি—৬৭)। ঠাকুর কাম প্রার্থীর বাহুসংঘের মহাপরিনির্বাহের হুদান্ হুশাসী পৰ্বতগুহে ঘোষিত। স্থিতীর গৃহায় যে জনসংস্কারিত চিত্র দেখে এসেছি, এখানে সেটি বান্ধিলিখে ঘোষিত। জলদ্বার বিশেষতঃ জন্মকনির্বাহন বাহুসংঘে তই নিকপগর্ভে হ'ল করে শারিত। তাঁর নিকপগর্ভে নাকার একই। হাতার ভায়ে উপায়নির্ভর যে অলপ কবে গেছে। নুই প্রান্তে দৃষ্টি শালবাক। উপরে এক-সারি ফেব্রার হুইত। তাঁরা আলপ কায়দে, বাসবত কল্যাণে, মহামানবকে সন্মানের স্বর্গে আহ্বান জানাতে বেন নেমে এসেছেন অকালপথে।

বাহুসংঘের সম্মুখে বর্ষকের দিকে পিছন কিয়ে ভূমিখ্যায় বসে  
আছেন এক-সারি ভক্ত। তাঁরা বেনার আল্পত, রোগদুগ্ধান,  
শোকাহত। যে পালককে তিনি শয়ন করছেন তার কাছে নির্বাণিত-শিখা ধীপ-সমন্বিত একটি  
ধীপাধার এবং কিছু হুদা হুদা। মহামানবের পক্ষপ্রান্তে ভিক্ত আল্প। বাহুসংঘের কাছ  
থেকে শেখদান নিতে হচ্ছে তাঁকে—এই ভিক্তপাত ও বশি। নিকপগর্ভের কায়দে ভিক্ত  
আল্প মাথা বেঁধেছেন, বিরাগিণী হুদাহিত হুইত তাঁর।

অত্যন্ত বড় নিম্ন অক্সিজেন-বিশালী এই মহান বায়োটটিক স্থাপিত করেছেন। বায়ুবেশের  
পাতের নব থেকে বায়ুধারিত পর্বত সমুদ্র ও সূর্য। কিন্তু এ ডাক্তারের মূল আবেশন  
সাংগিক মহানতত্ত্ব।

শ্রী-হিয়ান তাঁর সময়-স্বাক্ষরিত গৌড়মন্দিরের মহানিৰ্বাণ প্রস্তাৱ বলেছেন :

সুশীমলাকে উদ্বোধন করেই মালাচ্যুতের প্রবন্ধটি শ্রবণে শ্রিতবানতী (মঞ্চ ?) স্নেহীতরে উচ্চর শিখ  
 প্রবন্ধ করে এই প্রবন্ধকার মহাপ্রতিদর্শনীয় ব্যক্তি করেন।

এখানে দেখছি দুটি শালবৃক্ষ, দেখছি তিনি উত্তর দিকে ঘূষ করেই শূরে আছেন ঠটে।

এই ক্ষেত্রে আরও একটি প্রাচীন-জাতির লক্ষণ। যার বর্ষক বৃষ্টিপাতের তদনুযায়ী প্রজন্ম ও মালের পরাকার। একই বিদ্যা-বস্তু নিয়ে একটি ফ্রেসকো (ফলকচিত্র ১১০) আমরা প্রথম পৃথাক দেখে এসেছি। এখানে সেই বৃষ্টি ঝড়-হুল্লুর পরিকল্পনা যেনি-হাতীকৃতে উৎকীর্ণ। তপস্যারত বৃষ্টিপাতকে সঙ্গে আছেন কেশবদেব, ভূমিপূজারী, বৈদ্যবৃক্ষভর। তার নীচে মায়ের তিন কন্যা-ভ্রমর, রতী ও রূপাটিকে প্রসোদিত করছে। তাদের

আরও দুজন সহচরী। মার দক্ষিণে বঙ্গোছলান। মহাসমারসীকে পরদিনে ভারতীয় খেতে ছিল ফেলতে, তাগের মধ্যে দুজন আবার হাটখুশেই বৃষ্ণ করছে। শিল্পী হরতো গুনের মধ্যে গিরিমঞ্চলাবাহনকে পুনরায় দেখতে চেরেছেন। কারণ, আবার মারকে দেখা যাচ্ছে একই বৃষ্ণে, দক্ষিণাধিক-বৃষ্ণদেবের পদতলে-সরাভূত মার।

এই গুহা-ঠেজের ভাস্কর্য প্রসঙ্গে ফার্গুসন বনছেন\*—বর্তুস্বরের বৃন্দারতন মন্দিরের ভাস্কর্যের সঙ্গে এই বড়বিশাতি গুহা-ঠেজে অবস্থিত ভাস্কর্য-নিদর্শনের সাদৃশ্য এত বেশী যে, বেশ নিশ্চিতভাবে সোচ্চা হাত, পশ্চিম-ভারতের শিল্পীরাই সেখানে গিরে করে করেছিলেন।

এই গুহার পর আরও চারটি গুহার অশিষ্টের প্রমাণ পাওয়া গেছে। সপ্তাবিশাতি বিহারটিও সত্যবিশাতি  
অসমাপ্ত। অষ্টাবিশাতি গুহার বর্তমানে যাওয়া যায় না। এটিও  
উল্লিখিত বিহার  
অসমাপ্ত অবস্থার পরিভাষা হয়েছিল। ইহাও শেখ হলে এটিও একটি  
ঠেজের হুপ নিত। ঊনবিংশাতি বিহারটিও দুর্ভাগ্য। সেটি আমার দেখা হয়নি।

দ্বিংশাতি গুহা-মন্দিরের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার একটি কারণ আছে। অজস্রের কিয়দ বড় প্রাচীরিক গ্রন্থ আছে, ভাঙে এই গুহাটির উল্লেখ নেই। ফার্গুসন, হার্জেন্স, গ্রিফিথ, হারিহরাম ও-বিকরে নীলব, পার্সি রটিন-মাহেব তাঁর গ্রন্থের পর্বাংশে অজস্রগুহার যে কাল-নির্দেশক সূচী দিয়েছেন, সেখানেও এ গুহাটির নামোচ্চারণ নেই। তার কারণ এই যে, এই গুহাটি আবিস্কৃত হয়েছে মাত্র বছর বেশক আগে এবং নিজস্ব ঘটনাচারে।

১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে একদিন প্রবল বর্ষা সেতু বিহারের সম্মুখস্থ পথটিতে একটি ধুলে নম্বর আশঙ্কা দেখা দেয়। এই পার্শ্বা পথটিকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে অজস্র পুরাতত্ত্ববিজ্ঞান একটি ধুলে-রোধী প্রাচীর (retaining wall) সেঁচে দেবার কার্যক্রম করেন। এল ইট-বালি-সিমেন্ট। এই প্রাচীরের বনিয়াদ খুঁড়তে গিরে হঠাৎ অতর্কিতে বোঁরো পড়ল একটা ফাঁপা অংশ। কুলির সর্কার গিরে ধরে পড়ল পুরাতত্ত্ব-বিজ্ঞানের কর্মচারীকে—রেট ব্যাক্সের দিতে হবে, না হলে ওষের পড়ন্তের গোঁবাচ্ছে না।

ধমক ওঠেন কর্মচারী—এই ধূলিন আছে ভূঁরি রেট মেনে গিরে সহি গিরে, আল রেটে গোঁবাচ্ছে না কললে শুনব কেন?

হাত দুটি কললে কুলি-সর্কার বলে—তখন কি জানতাম হুঁজুর, ভিতরে অতবড় কোকর? অতখানি ভরাট করতে হবে।

আঁধার ওঠেন কর্মচারী—কি কললে? কোকর? কোথায়?

অজস্রালে হুটে গেলেন তিনি—খবর পেলে বড়কর্তার কাছে। হেড-অফিস থেকে হুটে এলেন সবাই। রইল পড়ে কুলি-সর্কারের সেওয়াল গাখির কাজ! শব্দ হারে খেল খনন-কার্য! একে একে বের হয়ে পড়ল একটি গুহা একটি স্তম্ভ এবং সর্বশেষে আবিস্কৃত হল একটি অপরূপ হীনবানী গুহা! এখানে একটি শিলালিপি পাওয়া গেছে, আরও বার পাঠোচ্চারণ করা হয়নি।  
দ্বিংশাতি বিহার  
একটি অসমাপ্ত এককালে ছিল বলে অনুমান করা যায়। এটি বিহারে না  
ঠেজ? স্তম্ভের অশিষ্ট হল এটি ঠেজ? কিন্তু চতুস্তম্ভ পরিবর্তন ও প্রস্তুত শব্দ ইঙ্গিত  
করে এটি বিহার। সম্মুখ-ভাগে একটি স্তম্ভের গায়ে নবম ঠেজের অশিষ্ট করেকটি অক্ষর  
শোনাই করা।

\* "One of the most interesting results obtained from studying of the sculptures in this cave is the almost absolute certainty that the Great Temple of Boro-Buddor in Java was designed by artists from the West of India ... The style of execution of the figure sculptures in the two temples resemble each other so nearly that we might almost fancy that they were carved by the same individual." —Cave Temples of India—by Fergusson & Burgess, London, 1880,

সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, এই গুহার প্রবেশ-পথটি ৪৮০ মিঃ মিঃ লম্বা ইট দিয়ে বন্ধ করা ছিল। কবে এটি বন্ধ করা হয়েছিল? কেন? নিঃসন্দেহে এটি হানিবানী বংশের। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর, অর্থাৎ অলসতার প্রাচীনতম গুহাদলের অন্তর্ভুক্ত। পরবর্তীকালে এর ঠিক উপরেই খোঁড়শ বিহারটি খনন করা হয়েছিল বলেই কি মহাবানী বংশের এল প্রবেশ-পথটি ইট দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছিলেন? কিন্তু তাহলে সমস্ত যোকগটাই বা বন্ধ করেননি কেন? ভিতরে ফাঁপা অংশ রূপে শব্দ প্রবেশ-পথটাই বা বন্ধ করলেন কেন?

ইতিহাস এ প্রশ্নের আতঙ্ক জবাব দেননি।

### অজস্র স্থাপত্যের বিবর্তন

কোন একটি মহান্ শিল্পকর্মকে উপলব্ধি করতে হলে তার প্রাকৃত পরিপ্রেক্ষিতটা জানা থাকে দরকার। বেশ-কালের কোন্ অবস্থার জিহ্বা শিল্পকল্যুতি নির্মিত হয়েছিল, কী তার পশ্চাৎপট এবং কী তার পরিবেশ তা জানা না থাকলে, শিল্পকর্মটির স্বরূপ হ্রস্বপনয় করা যায় না। অজস্র-গুহার স্থলারনের জন্য তাই গুহা-শিল্পের ভ্রম-বিবর্তনের একটি আশোচনা এ গ্রন্থে অপরিসর্য হয়ে পড়ে।

আগেই বলেছি, অজস্রের স্থাপত্য এক বিশেষ জাতের স্থাপত্য, যাকে “গুহা-স্থাপত্য” (Cave Architecture) বলা যেতে পারে। প্রাকৃতিক গুহার প্রাচীর খোদাই করে, অথবা প্রেক্ষ পাথর কেটে কৃত্রিম গুহা বানিয়ে তাকে স্তম্ভ, স্তম্ভক, শিলান ইত্যাদি সুশাসিত করাই এ স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য। বস্তুতঃ, সম্রাট অশোকের আমলে এ-জাতীয় গুহা খনন প্রথম শুরু হয়। প্রায় সমসাময়িক বর্তমান বিহার প্রদেশে এই ধরনের আটটি গুহা খনন করা হয়েছিল।



সেকেন্দার এলিজেন্ডার

সেকেন্দার স্যান

সেক

চিত্র—৭০ঃ প্রাচীনতম ভারতীয় কৃত্রিম গুহা, অশোক নির্মিত।

সেগুলি—কর্ণকৌপর, লোমশকর্ষা, বিশ্ব কোপজি, গোপিকা, বহুজিকা, মদলিকা ও সীতামারি। এদের মধ্যে প্রাচীনতম হচ্ছে সুবামা। চিত্র—৭০-তে এই আদিমতম গুহা-শিল্পের স্বরূপটি বোঝাবার চেষ্টা করছি। লক্ষ্য করে দেখুন, গুহার ভিতরে গর্ভগুহের দ্বারটি কেমন ছায়া (cave) বার করে খোদাই করা হয়েছে। খড়ের বা টিমের চালাখরে আমরা যে ধরনের ছায়া বা ‘ঈছ’ বার করি, ঠিক তেমন তেমন দেখতে ওঠে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ঘাটকোয়ার আমরা ছায়া বানাই কেন? কাজে ছায়া থেকে বৃষ্টির জলটা বেতরাল বেগে না নামে, সেইজন্যই তো? কিন্তু এক্ষেত্রে সেওলাল তো পাথরের গা। তাহান্, গর্ভগুহাটি তো আবার গুহার ভিতর। মলে, বৃষ্টির জলের তো কোন প্রশ্নই এখানে উঠছে না। তাহলে?

তার কারণ এই যে, যে সব আদিম কারিগর এই প্রথম গুহা-শিল্পের খনন করেছিল, তারা তখনও খড়ের চাল আর আটের সেওয়ারলের কথা ভুলতে পারেনি। তাদের হাত কাল্পনিক পথের উপর, কিন্তু চিন্তাধারার তারা তখনও ব্রহ্মে করেই বুঝে। ফলে, গুহার ভিতর পাথরের সেওয়ারলে তারা ছায়া বানিয়ে যাচ্ছে আবহমানকালের অক্ষাংশে।

প্রথম বুকের এই আটটি গুহা-শিল্পের মধ্যে একমাত্র লোমশকর্ষা প্রদেশ-পথেই আছে কিম্বা কাহুকাহ—অন্যান্যগুলি একেবারে অলঙ্কার-বৈচিত্র্য। কিন্তু কাহুকাহ না থাকলে কি হলে, গুহা-শিল্পগুলির অজস্রভাষা ঠিক অশোকস্তম্ভের মত অবিশ্বাস্য রকমে মন্থ।

প্রথম বুকের এই আটটি কৃত্রিম গুহাকে গুরুত্ব দিতে হচ্ছে বস্তুতঃ তিনটি কারণে। প্রথমতঃ, এগুলি আদিমতম কৃত্রিম গুহা; অর্থাৎ, পরবর্তী বুকের অনবদ্য গুহা-স্থাপত্য ও গুহা-ভাস্কর্যের—ভাস্ক, দ্যাসিক, অজস্র, এলোরা, এলিকান্টা প্রকৃতির অবি-জনক। দ্বিতীয়তঃ, কঠি ও খড়ের বৃগ থেকে পাথরের বুসে ভারতীয় স্থাপত্য-শিল্পের এখানেই প্রথম পদক্ষেপ। তৃতীয়তঃ, সম্রাট অশোকের ব্যক্তিগত চরিত্রের একটা দিক এরা উন্মোচিত করে দিচ্ছে—সম্রাটের

আদেশে ও অর্ধা নির্মিত এ গৃহ্য-শিল্পক্রেত্রে অলঙ্কার দ্বিপদ্যের ঠিকান (বৌদ্ধ নহ) সম্ভবতঃই সম্ভব। হিন্দু-শিল্পের অংশেই বলা করা হইত। বৌদ্ধ ধর্মের ধারক প্রিয়দর্শী অশোকের উদাহরণে নাকী এরা।

ন্যায়ালঙ্কার পর্বতে গোপিকা-গৃহ্যটি অলঙ্কার সম্ভবতঃই অশোকের আদেশে নির্মিত নহ। অশোক-পৌত্র সম্ভবতঃ হিন্দুধর্মের অংশে সেটি নির্মিত। অশোকের সেটি অশোককৃত বড়—১০-৫ মি. লম্বা, প্রস্থে কিছুটা সেই ৫-৮ মি.।

এর পরই দেখতে পাচ্ছি, নাসিককে কেন্দ্র করে পশ্চিমদিকে পর্বতমালায় একমুখ বৌদ্ধ প্রদম পাছাড়ের বৃক্কে গৃহ্য-শিল্পের বনন শুরু করেছেন একাধিক স্থানে। সেগুলির আকার, আয়তন, রচনামূল্য প্রায় একই রকমের। এগুলি সবই উপাসনা-গৃহ বা ঠেতা।

বস্তুতঃ, এখন থেকে আমরা গৃহ্য-শিল্পের স্বাক্ষরের পরিবর্তে গৃহ্য-ঠেতা ও গৃহ্য-বিহার শব্দ দুটি ব্যবহার করব। কারণ, এই সময় থেকে গৃহ্য-শিল্পের বননের কাজ ঐ দুটি নির্দিষ্ট ধারায় বইতে শুরু করে। সমস্ত উপাসনার জন্য ঘোষিত হত ঠেতা এবং বৌদ্ধ প্রদমদের আবাস হিসাবে তৈরি করা হত বিহার। বিহারের কথা পরে বলছি। প্রথমে গৃহ্য-ঠেতার কথা বলি।

নাসিককে কেন্দ্র করে তিন-চারশ' বছরের ভিতর যে ঠেতাগুলি নির্মিত হইত, সেগুলিকে কামান্দ্রমিকভাবে দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের মধ্যে—জাণা, কনভেন, শিলালকোয়া এবং অলঙ্কার দশম গৃহ্য। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকে—গৃহ্য-ঠেতা

বেদনা, অলঙ্কার নবম গৃহ্য, নাসিক ও কাশ্মীর। এছাড়াও, আরও শতাব্দীতে বছরের ভিতর তৈরি হইত। জাম্বুদ্বীপে দুটি এবং কাশ্মীরে একটি ঠেতা। এদের মধ্যে আকারে বৃহত্তম হচ্ছে কাশ্মীর এবং বৃহত্তম হচ্ছে নাসিকের পাণ্ডুলিপি ঠেতা। ঠেতাগুলির আকারে বিশেষ পার্থক্য নেই। সবগুলিই অলঙ্কার দশম ঠেতার (চিহ্ন—৫০) মত। লম্বাটে একটি হলু-কামরা, ডাঙে দুদিকে দুই সারি স্তম্ভ এবং স্তম্ভদ্বারা পাহাড়ের গা অর্ধ-গোলাকৃতি করে বেবাই-করা। সেই পিছনদিকের গোলাকৃতি অংশের কেন্দ্রবিন্দুতে বসানো হত স্তম্ভটিকে। বসানো হত বলাই অর্ধ চক্রাকারে সজ্জা হত না। বাক্য স্তম্ভটিকে বাইরে থেকে এনে বসানো হত। আদর্শেই, গেঁথে তোলাও হত। পাহাড় বনন করবার সময়ে ঐ অংশটা বাদ দিয়ে বনান করা হইত এবং পরে সেই অংশটিকে ঘোঁষা-হাওয়া দিয়ে খোঁসাই করে স্তম্ভের আকার দেওয়া হইত। ঠিক এইভাবেই এসেছে স্তম্ভগুলি।

এই দশটি উপহারের মধ্যে একমাত্র অলঙ্কার দশম গৃহ্যর শেখপ্রান্তটি চৌকো, অন্যান্য সবগুলি গৃহ্যর শেখপ্রান্ত অর্ধ-গোলাকৃতি। এই অর্ধ-গোলাকৃতির আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। প্রথমতঃ, গৃহ্যর ছাদে কাঠের কড়ি-বন্ধন আরও পাখর ঘোঁষাই করা হইত। ছাদের ভারবহনের কাজে এলাতীর বীম-বন্ধন কোনও প্রয়োজন ছিল না, ও শব্দ অলঙ্কার। এছাড়া, শিল্পীরা ঘোঁষা কড়ি পূর্ব-পূর্বের অভ্যাসটিকে স্বাভাবিক ভাগ করতে পারেননি। চিত্র—৫৪ থেকে চিত্র—৫৯-এ আমরা গৃহ্য-ঠেতার পূর্ব-পূর্ব দিকভাবে নির্মিত হইত হইত হইত দেখবার প্রমাণ পেরাই। চিত্র—৫৪-এ সৌন্দর্য্যবোধের ছাদের বড় কিছুটা দিকের আমরা ভিতরে কাঠের কাঠটা দেখবার সুযোগ করে দিই। সব কাঠি গৃহ্য-ঠেতাই ঐ জাতীয় কঠিন বীম-বন্ধন বা কঠোর-পারিশ ঘোঁষাই করা আছে। চিত্র—৫০-এ উপাংশে গৃহ্য-ঠেতার অভ্যন্তরীণ এই প্রমাণ চিত্র। এছাড়া, চিত্র—৫৫ থেকে চিত্র—৫৯-এ সব কাঠি গৃহ্য-ঠেতার প্রবেশ-পথই বক্র বা পার্শ্বের প্রান্তদেশ দেখতে পড়ায় বাতাই। দ্বিতীয়তঃ, অনেকগুলো স্তম্ভগুলি ভিন্ন থেকে ঠিক পাছাভাবে ওঠেন। কাঠের খুঁটি যেমন কাঁক করে ঠেস দেওয়া হয় (পার্শ্বচাপ বা side thrust-এর প্রতিবিধান করতে), সেইভাবে বান করে বসানো। লোমশকর্মের প্রবেশপথে (চিত্র—৫৫) এটা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।



তৃতীরাত্র, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রবেশ-পথের উপরে একটি গম্বাক তৈরি করা হত, যাকে বলে “সূর্য-গম্বাক”।

গৃহ-ঐক্যের কথা এই পর্যন্ত। এবার বলতে হয় গৃহ-বিহারের কথা। ঐক্যের মত বৌদ্ধ প্রমাণসহ আবাস-স্থলে এই বিহারগুলিরও একটা সর্বাধিসম্মত রূপ আছে। অমলতার চিত্রশিল্প, অশ্মম, ম্যান্দশ ও প্রয়োদশ বিহার হচ্ছে প্রাচীনতম। এগুলি খ্রীষ্টপূর্ব কালের এবং হীনযান গৃহ-বিহার

বৌদ্ধ যুগের। এগুলিতে কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমতঃ, অভ্যন্তরীণ অংশে একটি ছোট ছোট সূর্য-গম্বাক, এতে কোন স্তম্ভ নেই; তৃতীরাত্র, কেন্দ্রস্থ হলের সন্দেশ করেকটি ছোট ছোট সূর্য-গম্বাক বা গম্বাক আছে। এই গম্বাকগুলির উপরে সূর্য-গম্বাকের অনুকরণে করেকটি জানালার প্রতীক। এগুলি কিল্লু সত্যিকারের গম্বাক নয়—অলো-হাওয়া যাওয়ার পথ নয়, এ শুধু অলঙ্করণ। চতুর্থতঃ, এই প্রাচীনতম বিহারে কোন স্তম্ভ নেই (বুদ্ধমূর্তি থাকার জো প্রশ্নই ওঠে না, যেহেতু, এগুলি হীনযান যুগের)। পঞ্চমতঃ, বিহারের ভিতর পাথরের খোদাই-করা শায়নের উপস্থিতি অবশ্যই বোঝা আছে।



চিত্র—৭৪ (১) : চৌতাল ভূমি।  
চিত্র—৭৫ (২) : সোমবতী।  
চিত্র—৭৬ (৩) : ভালা চৌতাল।

চিত্র—৭৭ (৪) : কালো চৌতাল।  
চিত্র—৭৮ (৫) : অমলতা ১১তম।  
চিত্র—৭৯ (৬) : অমলতা, লিখিমতী।

এই পটভূমি বৈশিষ্ট্য থেকে আমরা হীনযানী বৌদ্ধ প্রমাণের জীবনযাত্রার কথা কিছুটা আন্দাজ করতে পারি। প্রথমতঃ, তাঁরা চৌতাল-গৃহকেই বৌদ্ধ প্রাসাদে নিতেন—তাই আদিম গৃহ-ঐক্যের প্রবেশ-পথে নানারকম অলঙ্করণের প্রচেষ্টা করা সত্ত্বেও নিজস্বের আবাস-স্থল বিহার-গুলির প্রবেশ-পথে কোনরকম অলঙ্করণ করেননি। দ্বিতীয়তঃ, হীনযানী প্রমাণের দল মূর্তিপূজা অথবা প্রতীক পূজার চেয়ে ‘শীল’ ও ‘বিনয়’-এর উপরেই বেশি জোর দিতেন। তাই বিহারে স্তম্ভের কোন আশ্রয় নেই। তৃতীয়তঃ, অনুমান করতে পারি, সাধারণ প্রমাণের হলের হল-কামরার নৈশ বিশ্রাম করতেন এবং অংশেকৃত উচ্চ-প্রেশীর অর্ধ-তৈলা ঐ ছোট ছোট সূর্য-গম্বাকগুলিতে দল করতেন। চতুর্থতঃ, হীনযানী যুগের প্রস্তুত-শয্যা পরবর্তী যুগের বিহারে দেখতে না পাওয়ার কারণ হিসাবে অনুমান করছি, পরবর্তী যুগে কাঠের তৈরী চৌকি ব্যবহার করা হত।

মহাযান যুগেই অমলতার অধিকাংশ বিহার নির্মিত। কালানুক্রমিকভাবে আমরা তাদের ছত্রটি ভাগে ভাগ করতে পারি :

প্রথম পর্ব : ৪০০—৪৮০ জীতীশ—গৃহ্য নং ৪, ৭, ১৫, ১৬ ও ১৭

দ্বিতীয় পর্ব : ৫০০—৫৫০ জীতীশ—গৃহ্য নং ১৮, (১৯) ও ২০

তৃতীয় পর্ব : ৫৫০—৬০০ জীতীশ—গৃহ্য নং ২১, ২২ ও ২৩

চতুর্থ পর্ব : ৬০০—৬৪২ জীতীশ—গৃহ্য নং ১—৫, ১৪, ২৪, ২৫, (২৬), ২৭, ২৮, (২৯)

বন্যদীর ভিতর তাঁরা বিবর্তিত অর্থাৎ গৃহ্য নং ১৯, ২৬ ও ২৯ অবশ্য বিহার নয়, চৈতঃ। সমগ্র-কাল বোকাবার জন্য এগুলি উল্লেখ করেছি।

এগুলি গৃহ্য ও রাক্ষসের শাসনকালে নির্মিত। বেশ বোকা বাহ, আদিম পরিকল্পনাকারের স্থান-নির্বাচন এতই স্নাতকশিক্ষিত হয়েছিল যে, ধীরে ধীরে অল্পত্রেতেই অধিকসংখ্যক প্রমাণ এসে বসবাস করতে শুরু করেন। ফলে, অমলতার দশর চৈতঃের সময়সময়ে অর্থাৎ পূর্ববর্তী কালে অন্তর বৈশব গৃহ্য-চৈতঃ নির্মিত হয়েছিল—যথা জালা, কালো, নালিক প্রভৃতি—সেগুলিতে সঙ্গসঙ্গের প্রয়োজন ততটা অনুভূত হয়নি, মতটা হয়েছিল অমলতার। তাই ঋগ্বেদে একটির পর একটি বিহার অমলতার বানানতে হয়েছে নবীন আশুতকদের স্থান দিতে। আবার বন্য দেখা গেল, নবীন আশুতকদের আর পূর্ববর্তর উপাসন-চৈতঃ স্থান হচ্ছে না, তখন নতুন চৈতঃ তৈরি করতে হয়েছে। এভাবেই অধিক শিক্ষণীয় দশর-চৈতঃ-স্নাতক অমলতা গৃহ্যকে বৃন্দা-প্রসারিত করে মহিমময়রূপে রচনা সম্পূর্ণ পাহাড়টাকেই জালিলেনবৎ করেছে।

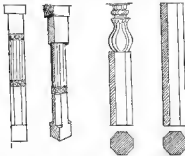
হীনমান যৌব সমাশীরা ছিলেন কলুজ জন্মগণী। তাঁরা ধ্যান করতেন, তপস্য করতেন, চারিত্রিক শীলতার দিকে ছিল তাঁদের প্রবণ দৃষ্টি। যেনে কারি, প্রাতে ও সন্ধ্যায় তাঁরা সমবেত হুতেন চৈতঃপুত্রায়। সমবেতকর্তে প্রার্থনা করতেন এবং তারপর নিজ নিজ বিহার্যবাসে ফিরে এসে ধ্যান করতেন। কিন্তু মহাযানী ভিক্ষুরা রচনা করে পড়লেন তাঁরা-বর্ণের পবিত্র। তাঁরা ধর্মচরণের সময় বৃন্দমূর্তির পূজা করতে ইচ্ছুক। তাই ধীরে ধীরে দিনের মধ্যে অনেকবার তাঁদের যেতে হত চৈতঃ—স্বতঃপক্ষে পূজা, নৈবেদ্য, অর্ঘ্য গান করতে। ফলে, সমস্ত বিহার্যেই চৈতঃ লেগে থাকত ভীড়। এই অনুভবের হাত থেকে নিকৃতি পাবার জন্যই যেনে কারি বিহার্যেও স্বতঃ তৈরি করার প্রয়োজন হয়ে পড়ল। কিন্তু বিহার্যেই যদি পূজার ব্যবস্থা করা অনুমোদনযোগ্য হয়, তাহলে স্বতঃ কেন, একবারে বৃন্দমূর্তির মূর্তি তৈরি করলেই হয়। তাতে তো আর বাধা নেই এখন। তাই দেখছি, মহাযানী যুগে বিহার্যের দুততম প্রান্তে একটি গর্ভমূর্তির তৈরি করে তাতে বৃন্দমূর্তি খোদাই করা হয়েছে। মূর্তিপূজা অনুমোদনযোগ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যৌব স্নাতকস্বায়ার নানান দেব-বিহার্য অনুপ্রবেশও ছিল। তৈরি হল অমলতার মূর্তি, হারিতীর মূর্তি—যেগুলো চিত্রিত হল পর, রক্ষা প্রকৃতির আসল।

শুরু তাই নয়, কোন কোন স্থানে চৈতঃস্বতঃের গারেও বৃন্দমূর্তি খোদাই করা হয়েছিল—যেমন দেখতে পাই কার্যেতে। কিন্তু এর কন্ডাল বিহার্যেও অনুপ্রবেশিত হলো না। অর্থাৎ, মহাযান যুগে চৈতঃ স্বতঃের গারে বৃন্দমূর্তি খোদাই করা হল কটে, কিন্তু বিহার্যে বৃন্দমূর্তির বদলে স্বতঃ তৈরি হল না। প্রসঙ্গতঃ বলি, এই নিয়মের একটিবার ব্যতিক্রম যেখান থেকে পাই নালিকের তিন নং গৃহ্য। এটিকে ক্যা হর গোতমীপুত্র বিহার্য। এটি একেবারে হীনমান যুগের, কিন্তু এই বিহার্যে একটি স্বতঃ খোদাই করা হয়েছিল। এই ব্যতিক্রমটির পিছনে একটি বিশেষ কারণও ছিল। ঐ গোতমীপুত্র বিহার্যে বাস করতেন ভিক্ষুগণ। মহিন্যদের পক্ষে ধারে ধারে বাসস্থান ত্যাগ করে চৈতঃ মাওজা অনুপ্রবেশনক হতে পারে মনে করেই প্রধান অর্থাৎ গোতমীপুত্র বিহার্যে একটি স্বতঃ নির্মাণের বিশেষ অনুমতি দিয়েছিলেন।

চিত্র—৭৫ থেকে চিত্র—৭৯-এ আমরা লক্ষ্য করেছি, গৃহ্য-চৈতঃের প্রবেশ-পথে কি ভাবে রক্ষা অলঙ্করণের ব্যবস্থা এসেছে। অমলতার বিভিন্ন যুগে খোদাই-করা স্বতঃগুহ্যকে লক্ষ্য

করলেও আমরা দেখব, প্রথম যুগের সরল অনাক্ষর শতাব্দে কোনভাবে রক্ষণ দান অসম্ভব  
কিছুই হয়নি। মনে রাখা প্রকার যে, অঙ্কনের কোন শতাব্দেই জারগাই  
নয়। ছাদের অথবা কোনও বীমের ওজন তার বহন করছে না। শতাব্দী  
ভেঙে ফেললেও ছাদ ভেঙে পড়বে না। অঙ্কন প্রাচীনতম শতাব্দে দেখতে পাচ্ছি নবম ও

দশম গুহায়। এগুলি আট-কোণা এবং জমি থেকে অংশ বাকি হয়ে উঠেছে (চিত্র-৮০)।  
পরবর্তী যুগের একটি শতাব্দে চিত্র স্তম্ভ গুহা থেকে সম্মিলিত হয়েছে চিত্র-৮১-তে।  
এখানে দেখছি, আট-কোণ-বিশিষ্ট নিম্নাংশের উপর সূন্যের একটি 'স্ট-পল' এবং তার উপর  
একটি 'আমলক' বসানো আছে। আমলকটি যেন পল-হাতা একটি আমলকী ফল। অঙ্কন  
একাত্তর অঙ্কন এনেছে শতাব্দীর প্রথমভাগে। বোড়স গুহাতে দু'তিন রকমের  
শতাব্দে দেখতে পাচ্ছি, স্তম্ভ গুহাতেও তাই। অষ্টম আট-কোণা শতাব্দেও আছে, আবার  
নান্দু জাতের অঙ্কনসম্মিলিত শতাব্দেও আছে। চিত্র-৮২-তে বোড়স বিহারের একটি



চিত্র-৮০ : অঙ্কন প্রাচীনতম  
স্তম্ভ (নবম ও দশম চিত্র)।

চিত্র-৮১ : স্তম্ভ গুহার প্রথম-  
পরের শতাব্দে (শিখরীয়া গুহা)।

চিত্র-৮২ : বোড়স বিহারের  
অঙ্কনসম্মিলিত শতাব্দে (দু'তিন গুহা)।

বিশেষ জাতের শতাব্দীর সেক্সানাল প্ল্যান, এলিভেশন ও সেক্ট সহযোগিতা করা গেল। তাতে  
পরিষ্কার চারটি অংশ দেখতে পাচ্ছি। (i) স্তম্ভ নিচে চতুর্ভুজ পাদপাতি। (ii) তার উপরে  
আট-কোণা শিখরীয়া অংশ, সেখানে অমরাবতীর অঙ্কনকে অঙ্কন-নকশা। (iii) তার উপরে  
বোল-কোণা-বিশিষ্ট শতাব্দীর মধ্যদেশ যার উপরে আবার ঐ অমরাবতী-নকশা। (iv) স্তম্ভ  
উপরে চতুর্ভুজ এডামাক্স, অঙ্কন-বিশিষ্ট।

স্তম্ভ বিহারটিও প্রায় ঐ একই সময়ে নির্মিত। সেখানকার একটি বিশেষ শতাব্দীর চিত্র  
এখানে দেওয়া গেল। এটিকে আমরা উপরি-বিশিষ্ট শতাব্দীর পরিচয় বসিয়ে পাঠ  
(চিত্র-৮৩)। এখানে দেখছি, পূর্বকার উদাহরণের চারটি অংশকে ব্যক্তিগত সর্বসম্মত ছাট  
ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। (i) স্তম্ভ নিচে চতুর্ভুজ পাদপাতি এবং মোটেই অঙ্কন-বিশিষ্ট  
নয়। (ii) তার উপরের অংশে কিছুটা চতুর্ভুজ এবং কিছুটা আট-কোণা। তাতে আবার  
রাজসের মূলের নকশা। (iii) মধ্যদেশের বোল-কোণা-বিশিষ্ট অংশের মাঝামাঝি আছে  
একটি ব্যাবৃদ্ধ ধরনের নকশা। এতে লম্বাটে মধ্যদেশের এককোণী দূর হয়েছে। (iv) তার  
উপরে আবার একটি আট-কোণা অংশ। (v) শীর্ষদেশের এডামাক্স, সেখানে ক্ষুদ্রকার  
কামদম্বী। (vi) সর্বোচ্চ চারকোণীও নুতন ধরনের।

সম্ভবপ গুহার নানান আভের স্তম্ভ আছে। তার ভিতর একটিমাত্র এখনো অলোড়িত হল। পরবর্তী উদাহরণটি (চিত্র-৬৬) গ্রাথ করা হয়েছে উনিবিংশতি চৈতোর প্রবেশ-পথ থেকে। চিত্র-৭০-এ এই সম্পূর্ণ ফালাটিকে দেখানো হয়েছে। সেখানে প্রবেশ-পথের দু'দিকে এই স্তম্ভ দুটিকে দু'র থেকে দেখা যাচ্ছে। এবার দেখছি, বৈচিত্র্য-সমন্বিত অলঙ্কার-শিল্পী আর চতুশ্চল প্রস্তরপাথের পানপাঠি তৈরি করতে রাজী নন। পানপাঠিটি এবার আটকোনা



চিত্র-৬৬। সম্ভবপ  
বিহারের অলঙ্কার  
স্তম্ভের দৃশ্য।

চিত্র-৬৭। উনিবিংশতি  
চৈতোর ফালায় অলঙ্কারিত  
স্তম্ভ (চতুর্থ দৃশ্য)।

চিত্র-৭০। প্রথম  
বিহারের অলঙ্কার  
অলঙ্কারিত (দশম দৃশ্য)।

এবং তাতে তিন-সারি ধাপ দেওয়া হয়েছে। বিশেষ লক্ষণীয়, উপরেট দিকে ঘট-পাশের আধাখানামাত্র খোদাই করা হয়েছে। আমলকটিকেও আবার আমদানি করা হয়েছে। শেষ উদাহরণটি প্রথম গুহা-মণিরের সম্মুখস্থ বাজালি থেকে নেওয়া (চিত্র-৬৫)।

স্তম্ভের বিধির আলোচনা ঐ পর্যন্ত। এবার আমরা স্তম্ভের বিধির আলোচনা করব। অলঙ্কার স্তম্ভ আছে চারটি। সেগুলি আছে এখনকার চারটি চৈতোর প্রস্তরভেদে; নবম, দশম, উনিবিংশতিতম ও সত্তাবিংশতিতম চৈত্রে। নবম ও দশম চৈতোর স্তম্ভ

স্বল্প  
হীনযানী-রূপের, অলঙ্কারবর্জিত। নাসিক, ভাজা, কার্ণে প্রভৃতি চৈতোর সাপে অঙ্গের সাদৃশ্য প্রকট। দশম গুহার স্তম্ভের একটি ভাটি-কাল সেক্সান চিত্র-৩০-এ আমরা দেখছি। এখানে চিত্র ৬৬-তে কার্ণে-চৈতোর একটি নক্সা সংযোজিত হল, তুলনা করলেই জোঝা যাবে, দুটির সৌন্দর্য্য স্বতন্ত্র।

উনিবিংশতিতম চৈতোর স্তম্ভটি অনেক পরে তৈরী-মহাদান যুগে। এখানে দেখছি (চিত্র-৬৭), সেই আদিম সরল স্তম্ভ আর নেই। নানান রকম অলঙ্কারের ভরে ভরে তার সর্বাঙ্গ। পানপাঠি নানারকম পল-ভোলা নক্সা খোদাই করা হয়েছে। অলঙ্কারে দুটি ঘোট স্তম্ভও খোদাই করা হয়েছে। মাঝখানে দশভায়মান কীর্ণকর্তৃক অষ্টটি সোলাকৃতি, তার সম্মুখভাগে অলঙ্কারে বিশেষ আভের খিলনের নিচে ফেন ঝাঁকটি কুলপিণ্ড-ভাঙে আছে একটি হৃদয়মূর্তি। কার্ণে স্তম্ভে অপেক্ষ উপর কবেলিঙ-বরা যে অংশটা আছে, তাকে বলে হর্মিক ; বর্তমান উদাহরণেও সেই কর্বেলিঙ-বরা হর্মিকার আদিম রূপটি আছে অবিকৃত। তাই উপর রচিত হয়েছে তিনটি ঘট, যাকে বলে হ্রাবালী। আরও লক্ষণীয়, হ্রাবালীর উপরে আছে একটি অংশ, ক্ষত্রভ্রমণ একটি অলঙ্কার, যা নাসিক ইতিপূর্বে কোথাও দেখিনি।

সত্তাবিংশতিতম চৈত্রে স্তম্ভটির সাপে (চিত্র-৬৮) পূর্বোক্ত স্তম্ভের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। সৌন্দর্য্যও কম নয়। এবার দেখছি, পানপাঠি বা মেথির অর্ধেকিক উচ্চত্ব অনেকটা কম।

পূর্বোক্ত মত্ৰুপ জমি থেকে খাড়া হয়ে উপরে-ওঠা রেখার প্রাকল্য ছিল। এভাবে দেখছি, জমির সমান্তরাল সরলরেখার সংখ্যাও কম নয়। তার কারণ, ঊনবিংশতম শতাব্দীর পটনটি এমন, যেন উচ্চতাব দিকেই আমাদের নজরটা টানে। তাই অধিকাংশ রেখাই মাটি থেকে খাড়াভাবে উপরের দিকে উঠেছে (চিত্র-৮৭)। অপরদিকে, ঊনবিংশতম শতাব্দীর আকার এমন, যেন সেটি উচ্চতা ও প্রস্থের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিনয়ন করতে চায়; তাই দেখানে জমি থেকে খাড়া ও জমির সমান্তরাল রেখাদুলি ভারসাম্য বক্ষা করে রচিত। তাই বৃক্ষমূর্তির উপর এবার আর খিলান নেই, জমির সমান্তরাল লিন্টেল খোদাই করা হয়েছে।



চিত্র-৮৬ ৫ কার্ণাটদেশের মত্ৰুপ। চিত্র-৮৭ ৪ ঊনবিংশতম শতাব্দীর চিত্র-৮৮ ৩ ঊনবিংশতম শতাব্দীর মত্ৰুপ।

এই লিন্টেলের উপর ক্ষুদ্রাকৃতি তিনটি অজস্র-খিলান-সেই দিব্যিকর প্রতীক। অতীতও অনেকটা চম্পা। কিন্তু হর্মিকার সেই শক্তি-যার-করা কবেলিত, সেই নিচের খরকের চেয়ে উপরের খরকের বেশি কয়েক ধাকার প্রাচীন কার্যদাটা আছে অব্যাহত। সেই অসিম কালার অব্যবহা। এখানে বৃক্ষমূর্তিটি দেখছি ধর্মচক্রহস্তে।

লক্ষ্য করে দেখেন, ঊনবিংশতম শতাব্দীর সামগ্রিক রূপটা হচ্ছে মোজার মত (তিনকাল)। তলার দিকে মোটা, উপর দিকে চম্পা সূত্রলো। পালশীতের তুলনার মত্ৰুপের সামগ্রিক উচ্চতাটা বেশি। তাই অজস্রতার ডাম্বর এখানে বৃক্ষদেবের লক্ষ্যমান মূর্তি খোদাই করেছেন। তাই তাঁর দুই হাত থেকে হালার আকারে দুটি কলত্রখণ্ড নিচের দিকে ঝুলে পড়েছে। দেখেন, বৃক্ষমূর্তিটি মত্ৰুপের সামগ্রিক আকৃতির সঙ্গে যেন এক সুরের সঙ্গী।

এবার দেখেন ঊনবিংশতম শতাব্দীর মত্ৰুপটিকে (চিত্র-৮৮)। এখানে বৃক্ষদেব উপলব্ধ। ফলে, মূর্তির শ্রম ও উচ্চতা মত্ৰুপের সামগ্রিক রূপের সঙ্গে আরও এক সুরে বাঁধা হয়েছে; কারণ, মত্ৰুপটি প্রস্থের তুলনার সূত্রলো নয়। বৃক্ষমূর্তির তিনটি ডাগ-তলার পাপড়ির পক্ষ, হাতখানে তথাকথিত মেঘাঙ্কুর, উপরে গোলাকৃতি কোয়ালপ্রজা বা ছটা। সমগ্র মত্ৰুপটিরও তলার পল-গোলা পাপড়ি বা মেঘিকা, হাতখানে লিন্টেল পর্যন্ত মেঘাংশ এবং উপরে গোলাকৃতি অঙ-যেন দুটি ক্ষেত্রেই লিপ্সী বলতে চাইছেন-হে ভীষ্মদাসী, অনুযায়ন কর, মত্ৰুপ ও বৃক্ষদেব জড়িত।

পরিচ্ছেদ শেষ করার পূর্বে আর একটি নিবেদন আছে :

অজন্মতা পরিবর্তন করেছিলাম এগারো বছর আগে—১৯৬৬ সালে। তারপর গত দশ বছর ধরে ও-বিষয়ে প্রত্যক্ষভাবে গিয়ে শব্দে বড়িখাটি করেছি। অতি সম্প্রতি একটি বিষয়ে আমার খটকা লেগেছে। সেটা হচ্ছে চৈতন্যগুলির বিচ্ছিন্নতা বা dissociation। অজন্মতার চারটি চৈতন্য, তার মধ্যে প্রাণীনতম চৈতন্য হচ্ছে লগন গুহা। সেটি কঠিন হিসাবে ধরে নিয়ে দেখছি বাকি তিনটি চৈতন্যের মধ্যে একটা অক্ষত সম্পর্ক আছে। সেই বিভিন্ন সম্পর্কটা হচ্ছে এই : নবম, উল্লিখিত এক বড়িখাশিত চৈতন্যের longitudinal bisector অর্থাৎ দৈর্ঘ্যের দিকের মধ্য-রেখা তিনটিকে যদি বর্ধিত করা যায়, তাহলে সেই তিনটি সরল-রেখা অজন্মতার অ্যানে নামের নদীর ও-পারে ভিট-পয়েন্টে পরস্পরকে ছেঁবে করে। অজন্মতার একাধিক সব-নির্মিত অ্যানে এটি পরখ করে দেখেছি। এ-প্রশ্নের চিত্র—১-এ সেই তথ্যটা একে দেখাবার চেষ্টা করেছি। এই আবিষ্কারটি করে যদি 'ইউরেকা-ইউরেকা' বলে আমি লাফিয়ে উঠিনি, তবে এটাকে নিজস্ব কাণ্ডালায় ঘটনা বলে বাড়ল করতেও মন সরেনি। কেন এই তথ্যটাকে এত গুরুত্ব দিচ্ছি সে-কথা বুঝিয়ে বলি—গণিত-জ্যোতিষ ও সম্প্রতিবিষয়ে যার অধিকার আছে এমন কোন বিদ্যায় পাঠক যদি এ-নির্দেশ গবেষণা করেন তবেই আমার প্রচেষ্টা সাফল্যের।

প্রথমতঃ, ধরে নিই এটা কাণ্ডালায় ঘটনা নয়। অর্থাৎ প্রথম উপনিবেশ স্থাপনের পর কোনও জ্যোতির্বিজ্ঞানী অর্থাৎ সূর্যকল্পিতভাবে পরবর্তী তিনটি চৈতন্যকে ঐ-ভাবে ধনন করিয়েছিলেন। কিন্তু কেন? আমরা জানি, প্রতিটি চৈতন্যের সম্মুখদিকে একটি করে সূর্য-গম্বাক আছে, যার ভিতর দিয়ে সূর্যমোক্ষ এসে চৈতন্যের অভ্যন্তরভাগকে আলোকিত করে। চিত্র—৭০-এ লক্ষ্য করে দেখুন কী-ভাবে সেটা হয়। ঐ চিত্র দেখে একথা বুঝতে অসুবিধা হবে না যে, সূর্য প্রতিদিন যখন পূর্ব থেকে পশ্চিমে সরে যান, তখন ঐ সূর্য-গম্বাকের আলোক রৈখিক পশ্চিম থেকে পূর্বে সরে যায়। আমরা আরও বুঝতে পারছি যে, সূর্যের দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ন হয় বলে ঐ আলোকরশ্মি মৈনিক যে রেখাটা রচনা করছে সেটি ছয় মাস ধরে ভ্রমণ স্তম্ভের দিকে এগিয়ে যায়। তারপর ছয় মাস ধরে রেখাটা ভ্রমণ শিথিয়ে আসে। আমরা আরও বুঝতে পারি যে, চৈতন্যের ঈর্ষা এবং থেকে-থেকে সূর্য-গম্বাকের উজ্জ্বল এমনভাবে নির্দিষ্ট করা যায় যাতে কলসের কোন একটি বিশেষ দিনে সূর্য-গম্বাক আলোকিত করবে। সূর্য-গম্বাক ঐ-ভাবে কলসের কোন দিন স্তম্ভ-তিনটিকে উল্লসিত করে কি না তার কোন ইঙ্গিত বা হাদিস আমি পুরাতত্ত্ব বিভাগের কোন গবেষণা-গ্রন্থে খুঁজে পাইনি।

যদি ধরে নিই কলসের কোন বিশেষ দিনটি দিনে সূর্য-গম্বাক ঐ-ভাবে তিনটি চৈতন্যের তিনটি স্তম্ভকে আলোকিত করে, তা এককালে করত—তাহলে আমার পূর্বোক্ত আবিষ্কার থেকে একথা স্পষ্ট বোকা যায় যে তিনটি চৈতন্যই রবি-রশ্মি সূর্য-গম্বাকসমূহে প্রবেশের পূর্বে চিত্র—১-এ 'ক'-চিহ্নিত 'ভিট-পয়েন্ট' বিন্দুতে অবস্থিত একটি কল্পিত-রেখাতে ছেঁবে করে আসে—সেই কল্পিত-রেখাটি হচ্ছে পৃথিবীর কলস থেকে 'ক'-কিন্দুতে অবস্থিত খ-মধ্য (axial) পৃষ্ঠের কল্পিত একটি উল্লসিত (vertical) রেখা।

যাপ্যরূপে কি দাঁড়ালে? আমরা ধরে নিয়েছি তিনটি বিভিন্ন দিনে সূর্য-গম্বাক সূর্য-গম্বাক পথে প্রবেশ করে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন স্তম্ভসমূহকে লক্ষিত করে পড়বে। কিন্তু হিসাবে দেখছি, ঐ তিনটি স্তম্ভ-সমূহের সূর্য-গম্বাককে ছেঁবে করতে হচ্ছে 'ক'-কিন্দুতে অবস্থিত উল্লসিত-রেখাটি। তার মানে তিনটি বিভিন্ন দিনে নয় কোন একটি বিশেষ ভিত্তিতে বিভিন্ন সময়ে হয়তো তিনটি স্তম্ভ উল্লসিত হয়, যা হ'ত।

স্বীকার করছি, এ আবিষ্কার থেকে কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারছি না। বিবেচনাইট খাড়ে করে পুরো অজন্মতার নিয়ে যাপ্যকায় নিয়ে কোন সিদ্ধান্তে আসার না আছে সুযোগ, না সময়, না সামর্থ্য। কিন্তু এই সূত্র ধরে কোন গবেষক যদি প্রমাণ করতে পারেন যে, তিনটি বিভিন্ন দিনে নয়, একই দিনে ঐ ঘটনা ঘটত এবং সেই দিনটি ছিল গুহা নির্মাণকালের

কোন একটি বৃক্ষপার্শ্ব দ্বারা তাহলে আবাকও হইয়া না। আমার এ-সাতার চিন্তা যে নিতান্ত আকাশ-কুসুম নয়, সে বিষয়ে একটি কথা বলেই এ প্রস্তাভে কলস দেব :

গির্জাতে অবস্থিত বৃহত্তম পিরামিডে গবেষণা লক্ষ্য করেছিলেন, একটি ছিটপথে ক্যালকো-নিকেল-স্ট্রোমের একটি বিশেষ ভারকর রশ্মি পিরামিডে প্রবেশ করে রাজার ভ্রমণে পড়ে। পড়ে নর, পড়ত। অরন-গলন-জনিত কারণে (precession of the equinox) ব-বিদ্যুৎ-রেখার অবস্থান ইতিমধ্যে কালে গেছে বলে এখন আর তা পড়ে না। অরন-গলন-জনিত কারণে ব-বিদ্যুৎ-রেখার সঙ্গে জালিতবৃত্তের ছেদ-বিন্দু ছাঙ্কিশ হাকার বছরে তিনশ' ঘাট ডিগ্রি ঘোরে—সেই সূত্র থেকে বিশেষজ্ঞরা সিদ্ধান্ত অবস্থিত ঐ পিরামিডের নির্মাণকাল নিতুলভাবে নির্ণয় করেছিলেন। সূত্রস্বয় আমার ঐ অশ্বমেধ আবিষ্কারটিকে নিতান্ত কাকপ্রাঙ্গীর বলে উড়িয়ে দেবার আগে কিয়ৎ গবেষণা করে দেখার অবকাশ হয় তো আছে।

### অজ্ঞানতা-চিত্রের বিশ্লেষণ

ব্রহ্মসভা-চিত্রের মর্মোদ্ঘাটনে আমাদের হৃদয়ে নিতে হবে এই চিত্র-বিশ্লেষণ বৈশিষ্ট্যটুকু—তার ব্যাকরণ, বিন্যাস, রচনামণ্ডলী। না হলে এই বিশ্লেষণিত শিল্পসমগ্রীর পূর্ণ রসান্বয়ন সম্ভবপর নয়। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই বলতে হবে চিত্র-বিশ্লেষণ বহুলক্ষের কথা।

সংসারান-প্রণীত কামসুত্রের টীকার যশোধর প্রসঙ্গায়মে একটি শ্লোক সংকলন করে বলে-  
ছিলেন চিত্রের ছয়টি অঙ্গ।

রূপভেদঃ প্রমাণানি ভাব্যাকার্যোচ্চনম্

সাদৃশ্যং বর্ণিকাভঙ্গ্য ইতি চিত্রং বহুলক্ষম্ ॥

অর্থাৎ অবলীলনাম্ব তার 'ভাব্যভাব্যে বহুলক্ষ' নিবন্ধে এ-বিষয়ে সর্বাংশে আলোচনা করেছেন। তার মূল বক্তব্যটুকু আলোচনা করে নিলে বুঝতে কিছু সুবিধা হবে।

অর্থাৎ বলাহে, আলোচকের ছয়টি অঙ্গ। কী তারা? না—রূপভেদ, প্রমাণ, ভাব, সাদৃশ্য-  
যোজন্য, সাদৃশ্য আর বর্ণিকাভঙ্গ্য। এই শব্দগুলির অর্থ কি?

রূপভেদ—অর্থাৎ, পরিদৃশ্যমান জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান। এই প্রসঙ্গের জগৎ থেকে শিল্পী  
একটি বা কয়েকটি বিশেষকৈ বেছে নিয়ে তার আলোচকের বিষয়-বস্তু নির্বাচন করছেন। সেই

বিষয়ের ব্যাপ্তি বা বস্তুত্ব যে ব্যাপ্তিক রূপে সে সম্বন্ধে চিত্রকরের সম্বন্ধ জ্ঞান  
হওয়া উচিত। অর্থাৎ, শিল্প-নিবন্ধনটি যেহে দৃশ্যক যেন বুঝতে পারে চিত্রের

বিষয়-বস্তুটা কী। চিত্রটি নয় অথবা নারীর, জগৎ অথবা অধিক বয়সী, কোন কোনের, কোন  
প্রেরণার মনুষ্য ইত্যাদি। হরিণ অথবা জগৎ অল্পবয়স্কতা দেখে বলে যদি সাধারণ দৃশ্য-  
সম্পন্ন দৃশ্যকরিত্ব তুল করে কমে, তবে বুঝতে হবে শিল্পীর রূপভেদ সম্বন্ধে ব্যক্তি পর্যায়ে নয়।

প্রসঙ্গান্তে, এ শব্দটির অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী পিকাসো-র সম্বন্ধে প্রচলিত একটি গল্পের  
কথা মনে পড়ছে। জগৎবিখ্যাত শিল্পীর কাছে প্রতিদিন অসংখ্য চিত্রপট আসে—যে ডাক-  
পিয়ন তার চিত্রগুলি সেটোর-বারে রোজ রেখে রাখে, তার জারি কোত্বেল ছিল শিল্পীকে  
স্বত্বকে দেখায়। বোয়ারির ব্যাপ্তি খ্যাপ, রেজেন্সী চিত্রি এসেও শিল্পীর একান্ত-সীচিব সেগুলি  
সই করে নেয়। শিল্পীর দর্শন আর মেলে না। শেষ পর্যন্ত ডাক-পিয়ন গারোয়ানজীর  
পর্যাপন হয়। পরগণালা শেকবেশ পরগণাবশ হয়ে একদিন সুযোগমত গুকে বললে, আজ  
একান্ত-সীচিব মশাই জড়ী নেই। তুমি সোফা ভিতরে স্টুডিওতে চলে যাও।

ডাক-পিয়ন বললে, ভিতরে আর কে আছেন?

: আর কেউ নেই। শিল্পী আর তার দশ বছরের মেলেটি আছে।

সাহসে ভর করে ডাক-পিয়ন ঢুকে পড়ে খরে। দেখে, খরের চারিদিকের দেওয়ালে শব্দ  
হাঁব আর হাঁব। শিল্পী আর তার বালক-পুত্র কমে আছেন সেই জটিল-সম্ভারের মাধ্যমে।  
সহস্র অভিব্যক্তি করে শিল্পীকে প্রেরিত্বী খামটি এগিয়ে গিয়ে ডাক-পিয়ন। বলম ব্যর করে  
শিল্পী সই করছেন, ডাক-পিয়নের মনে হল এই অবকাশে কিছু কলমে ভাল হয়—তাইলে  
কম্বুদের কাছে বলতে পারবে স্বরাজ পিকাসো-র সঙ্গে সে বন্ধুত্বলাপ করেছে। তাই অনেক  
দৃশ্য খরচ করে ডাক-পিয়ন বললে, ছোটকটাও দেখছি আর বাবার মত হাঁব আঁকার চেষ্টা  
করছে। ভাল, ভাল।

পিকাসো একটু অস্বস্তি হয়ে বলেন—এ কথা মনে করছ কেন?

একগালে হেসে ডাক-পিয়ন বললে—এ ছোটের ছবিখানি নিশ্চয় আপনার পুত্রের আঁকা।  
চমৎকার হয়েছে।



শিকারসো জ্ঞানল সেনানি। মৃদু হেসেছিলেন শব্দ।

কারণ, চিত্রটি পুস্তকের নাম—শিল্পের আঁকা। শিল্পবিষয়ত্ব একটি শিল্পকর্ম, ছোড়া নয়—  
faux; যা হেড অফ এ ফান্ট—একটি গ্রীক কাল্পনিক জীব।

গল্পটি উল্লেখ করছেন এদনা যে, এ নিয়ে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করা যেতে পারে। ডাক-  
শিল্পনও একজন সাধারণ ব্যক্তিবল্লভ ধর্মক। সে বোকার খাবি রোমক অধিসেনতা faux-কে  
ছোড়া বলে কুল করে, তবে কি আমের যের নেব শিল্পী শিকারসো-র ‘অপভ্রম’ সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট  
জ্ঞান নেই? এ প্রশ্নের জবাব আমি যেন না। কারণ, স্বয়ং শিকারসো-ই তার জবাব দিয়ে  
গেছেন এবং তার সে স্বীকারোক্তিতে সারা বিশ্বের চিত্র-সমালোচকের নতুন করে ভাষতে  
শব্দ করেছেন।

সে যাইহোক, রূপভেদের আনুভূমিক হিসাবে এসে পড়ে প্রমাণ, অর্থাৎ নানাবিধ মাপ-  
জোখ। বানর ও নরের পার্থক্য শব্দ একটি সুখীর্ণ অপেক্ষাক্ষেত্রের অস্তিত্ব-ন্যস্তির উপরেই  
নির্ভরশীল নয়। হাত-পা-মুখ-চোখের ঠোঁট-প্রস্থের আপেক্ষিক মাপের বহুবিধ পার্থক্যই  
প্রমাণ দেয় এ চিত্রটি নরের, ওটি বানরের। আমাদের প্রাচীন শিল্প-সাধকরা শিল্পমূর্তিকে  
পাঠটি প্রেরণীত বিভক্ত করেছেন; বধা—নর, জ্বর, আসুর, বাল্য এবং কুমার। এই পাঠ প্রেরণীর  
মূর্তি গঠনের জন্য বিভিন্ন প্রকার তাল ও মান নির্দেশ করা হয়েছে। যেমন নরমূর্তি—  
দশতাল; জরমূর্তি—স্বাদশতাল; আসুরমূর্তি—ষোড়শতাল; বাল্যমূর্তি—পঞ্চতাল; কুমার-  
মূর্তি—ষট্টিতাল। শিল্পীর নিম্নমূর্তির এক-চতুর্থাংশকে বলে এক আঙ্গুল; এই

প্রমাণ  
তরুণ শ্রাবশ অপূর্ণালিতে বা তিন মূর্তিতে হয় এক তাল। শিল্পচার্যেরা বলছেন,  
রাম, নৃসিংহ, ইন্দ্র, অর্জুন প্রভৃতির মূর্তি হবে নরমূর্তি অর্থাৎ দশতাল। চণ্ডী, ভৈরব, বরাহ  
প্রভৃতি হবে শ্রাবশতালের জরমূর্তি। হিতলতাপশব্দে রাবণ, কুশলতপ, মহিষাসুর প্রভৃতি  
হবে যোড়শতালের আসুরমূর্তি। বাল্যমূর্তি হবে ষট্ঠক, গোপাল প্রভৃতি এবং কুমারমূর্তি  
হবে বান্দু, কুন্দলখা ইত্যাদি। শব্দে তাই নয়, চোখের বিভিন্ন অংশের মাপ কেবল মূর্তিতে  
কত হবে তাও বলা আছে—নরের ও নারীর পৃথকভাবে। প্রশ্ন হতে পারে, এত বিধাবিধির  
মধ্যে মূর্তি গড়তে গেলে বৈচিত্র্য আসবে কোথা থেকে? সবই তো একঘেরে হয়ে যাবে। না,  
তা যাবে না। বৈচিত্র্যের জন্য ঈশ্বর এই নৃনিয়ার চারশ কোটি মানুষ্যের কাটকে চার-হাত  
নুই-বাধা করেননি। মানুষ্যের অঙ্গবোনের একটি প্রাথমিক পারস্পর্য সত্ত্বেও প্রত্যেকটি মানুষ  
বিশেষ। তেমনই শিল্পসম্বন্ধে এই সব মাপজোখ মেলে চলা সত্ত্বেও প্রাচীন ভারতীয় শিল্পীরা  
বৈচিত্র্যের স্বাধ আনতে পেরেছেন তাঁদের শিল্পকর্মে। সে যাই হোক, এই মাপজোখ, এই  
প্রাথমিক হিসাবকেই মাপের কণ্ডে চেয়েছেন চিত্রের শিল্পীর জ্ঞান বা ‘প্রমাণ’।

চিত্রের বহিঃস্থের রূপ দিতে এলা রূপভেদ ও প্রমাণ—এর পরের অঙ্গটি হচ্ছে ‘ভাব’।  
সেটি বহিঃস্থের নয়, অন্তঃস্থের জিনিস। ভাবের কিছুটা আমরা বুঝতে পারি ভুল্লভূতিতে।

কিছুটা অনুমান করতে হবে ক্ষমতা দিয়ে। ও যেহেতু গালে হাত দিয়ে বসেছে—

ভাব  
ও ভাবছে; এ যেহেতু তরবারির মূর্তি ধরেছে, এ তরবারি—এদলী হচ্ছে প্রকৃষ্ট  
তপশী; এর ভাব বুঝতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু ঐ যে বৈচিত্র্যের মৌলবীনিবন্ধ মূর্তি  
ও রক্তবনভা—ঐ প্রোথিত-ভাব্যকার অসংখ্য কবরীশিল্পের কুলবানার মান নেই, এগুলি  
অনুমান করতে হলে আর একটু অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজন। কিন্তু ভাবের সত্য তো ওখানেই  
শেব নয়—অবশ্যের একটু কল্পনে, জ্ঞানের সামান্যতম কুজনে, হাতের দৃশ্যব একটি মন্তব্য শিল্পী  
অনেক কিছু অনেক সময় কালতে চলে—সেগুলি দেখবার চোখ চাই। কিন্তু এহ বাহ্য!  
শিল্পচার্য অবনীন্দ্রনাথ বলছেন :

চিত্র করবার সময় সেখান থেকেই কতখানি এটাও ভেবে থাকতে হইবে, সেখানই না কতখানি ভাষ্যও ছিয়ার  
করিতে হইবে: কি বিদ্যা ভাবের প্রাক্কর্যকে বুঝাইবে? প্রাক্কর্য বাহ্য ভাষ্যকে বুঝিয়া দেখাইলে তো সে  
অসি প্রাক্কর্য হয় না। হাতের উপরে ভাষ্যের প্রাক্কর্য করিয়া ভাষ্যকে তো লক্ষ্যাই পাঠি নী—সে সে ওচল  
পাইলেই বুঝে পলায়। কয়েকটি সৌন্দর্য্য, ছায়া দেখাইতে হইলে আত্মা ভেবে ভাষ্যের লক্ষ্যে কেটে

এক পক্ষের আড়াল করিয়া ধরিয়া—যেমন গাছটি কিসা আমার হাতখানি ধরিয়া দেখাই খাই ছাড়া, তেমনি চিত্তও হস্তনা নিই আমার ঘোঁ প্রজ্ঞার তাহার আর কোনো ক্ষুদ্র ভাষার মধ্যে কিন্তু একটি আড়াল বিদ্য।

কৃষ্টিগত লক্ষ্যবান্য নির্বাহ্য, আর আশ্বাস্য গাছের আড়াল ভাষা বিদ্যায় : কৃষ্টিগত সোণা অলপটি কৃষ্টির কাণী যা কৃষ্টির ভাবের প্রকাশের দিকটা আশ্বাসের দেখাই, আর গাছের আড়ালে ঢাকা কৃষ্টির প্রকাশ অপরূপ ইঙ্গিতে জানাইতে সক্ষম কৃষ্টির ভিতরের ভাব কৃষ্টিবোধের রস মণি। সেদিকটার আরো তল্লাস করিয়া লইতে পারি নানা দিকটিতে লব্ধ।

বস্তুতঃ, এই ভাবের জালেই শিল্পীর সত্তা দর্শকের আত্মীয়তা। সবটুকু যদি শিল্পী বলে দেন, তাহলে জবাবজবাব সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়—কিন্তু এই যে কিছুটা ঢাকা, কিছুটা আড়াল-করা, ভাবের রূপে শিল্পী একটু অজস্র, একটু ইঙ্গিত দিয়ে দেখে যান এবং এই যে সেই আড়াল-ইঙ্গিতের পর ধরে দর্শক ভাবরাসের জোরে চলে যান এতেই চিত্র-দর্শনের প্রকৃত আনন্দ। প্রকৃতিও একজন উজ্জ্বলের শিল্পী, তাই তার অনেক রহস্য আরও মূর্চ্ছের এবং ততটাই তার মাথার উপাধান। আর তাই মাটির ধূয়ার আবেগ ফুলিয়া আপন গোপন ঘর দেখায় বসুন্ধরা। সবটা যদি বলে দেখাত, তাহলে রহস্যের রোমাঞ্চ শিহরণ থেকে বঞ্চিত হতুম আমরা।

জায়েব পরে বলতে হবে লাক্ষ্যবোধের কথা।

লাক্য শব্দটির সঙ্গে লব্ধ শব্দটির ধ্বনি-সাদৃশ্য থেকে আমার মনে একটা কথা জাগে। কোন একটি ভরকারি স্রাবের সময় অলু, পটল, মাছ ইত্যাদি নির্বাচন করাকে যদি বলি ‘মুপ্তভোগ’, বিভিন্ন উপাদানের পরিমাণ স্থির করাকে যদি বলি ‘প্রমাণ’, তাহলে সেই ভরকারিতে লব্ধ যোগ করাকে বলব লাক্ষ্যবোধন। অলু ও পরিমাণ অনুযায়ী লব্ধ বস্তুক্ষ না যোগ করা হলে ততক্ষ সেটি বিন্যাস ও অসুন্দর। কিন্তু আমার এই স্থূল উপমা লাক্ষ্যবোধের মর্মকথা বহুটা উদ্ঘাটিত হল, তার চেয়ে অনেক মৃদু করে, অনেক হুমকিহীন করে এই লাক্ষ্যবোধনায় প্রকৃত স্বচ্ছপরি উদ্ঘাটন করেছেন শ্রীরাধা গোম্মাশীশার তাঁর একটি শ্লোকে :

মুস্তাধনোদ্বজ্জরায়ান্তরলক্ষিমবন্দিতা।

প্রতিভাতি বনলোদু তল্লাক্যামিহোচ্যতে॥

নিজের একটি মুস্তার আকার তার আরও অনেকগুলো শব্দ না, আর বর্ণের কথাও বোঝানো যায় : কিন্তু তার সর্বাঙ্গে যে লোলে তরলিত আভা, সেটির বর্ণনা যেওনা হবে কেমন করে? চিত্রের মুস্তারি মুপ্তভোগ সম্মিলে সহজেই ধারণ করেন, তার মাপজোখ বা প্রমাণও অনায়াস-লজা—কিন্তু এ লোলে তরলিত আভাটি যদি তিনি স্থাপিত করতে পারেন, তবেই তাঁর মুস্তা অলু সার্থক—সেটিই হচ্ছে লাক্ষ্যবোধন।

কিন্তু লব্ধ না হলেও যেমন চলবে না, লব্ধের অধিকতাও তেমনি সুন্দর, আহাৎটিতে বিন্যাস করে দিতে পারে। তাই পরিমিত-বোধ লাক্ষ্যবোধের মূলকথা।

তুলি-বলনের জাদুকর অবশীশনাথ অতি অল্প কথার লাক্ষ্যবোধের এই মর্মকথা ছাড়া সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

হৃদয়ে যেমন পরিচিত সে প্রমাণ, হৃদয়স্বত্ব এবং স্বাধীন মনেছা একটি স্রাবের ঘণ্টা আনিয়া, কেমন লাক্ষ্য পরিমিত সে আরো কার্যকে বা চলটিতে অন্তর্ভুক্ত ও উজ্জ্বল তুলি হইতে নিষ্কৃত করিয়া। কালের উজ্জ্বল তুলি ছাড়া চলিয়া চলিয়া উজ্জ্বল কালের মধ্যে উজ্জ্বল বিশাল কালিহা এতটা অসংকল-রূপে প্রকাশের স্বীকা হইতে বিচলিত করিয়া : লাক্ষ্য কালিহা তাহাকে শান্ত করিতেছে নিজের মধুর কোমল ললনটি ধীরে ধীরে আহার সর্বাঙ্গে বহুইয়া। কালের জালের হৃদে বহন লব্ধতলা প্রত্যেককণকে বুঝিয়া। মধুর হাতা সর্বাঙ্গের হৃদে হাত পা নাড়িয়া, হাত মূখ খিচাইয়া উল্লসিত ভাবিতে লজ্জিত হইতেছে তখনই আমারে লাক্ষ্য তাহার কাছে আনিয়া বলিতেছে—‘লক্ষ্যবোধ’। লালন হইতে সে!

প্রমাণের লক্ষণ যে কঠোরতাইহু আছে, লাক্ষ্যের লক্ষণ সৌন্দর্য নাই : লব্ধ সেও লব্ধ, সুনির্দিষ্ট একটি বস্তুমান কথা। সে প্রমাণের মতো যোরে বাধ ধরিয়া কালের খাড় বাকিয়া রেখে না। কিন্তু যোরে লব্ধ হলে লাক্ষ্য হতে বাকিয়া যায় ও তারে ততো পা ছোঁদিয়া ধরে। প্রমাণ চেনা মাটির, হেতু মরিচা সত্যে ছেলেকে সোজা করিতেছে : আর লাক্ষ্য চেনা মা, নানা হলে সৌন্দর্যে ভুলাইয়া বসুন্ধার হইতে নিষ্কৃত করিতেছেন।

লাবণ্যমোদনার পর গগন অপের আলোচনা করতে হয়। সেই 'সাদৃশ্য'।

সাদৃশ্য কি? না, সদৃশ্য ছাড়া ইতি সাদৃশ্য। কাকে বা সাহিত্যে আমরা উপমার সাহায্য নিয়ে থাকি। কখন? কখন কোন বস্তু বা ব্যক্তির কোন গুণ প্রকাশ করতে গিয়ে বিশেষত্বের লক্ষণে আর এক বাঁও মেলে না, তখন আমরা উপমার স্মারক হই। তেমনকে দেখবার জন্য আমরা মন কতখানি ব্যাকুল হয়েছি বোঝাতে আমাদের কলতে হচ্ছে 'দাঁকাবারে আঁখি-পাখী ধার'। মেনেকে পেয়ে মা সব ভুলেছেন, খর-সোনার-আখীর-পরিচয় সব ছাড়তে তিনি প্রস্তুত; তাই বলছেন, 'খনকে নিয়ে কনকে বাব সেখানে বাব কি?' লাবণ্যে নিজেকেই প্রবেশ দিয়েছেন 'বিললে বসিয়া চাঁদের মূখ নিরখি'। এখানে আর বিশেষণে কুলাল না, আঁখিকে 'পাখী' করে প্রেমিকের, পুত্রকে 'চাঁদ' করে মায়ের মনের আকুলতা মিলে।

কান্ড ও সাহিত্যেও যেমন, চিত্রেও তেমন অনেক কথা না বলে উপমা বা সদৃশ্যের সাহায্যে অল্প রেখায় অল্প রঙে মনের ছবি প্রকাশ করা যায়। জেকেই বলি 'সাদৃশ্য'।

কাকে বা সাহিত্যে উপমা-রূপের কোষের শেষ তা আমরা জানি। তাই রসকল্যাণীতে কোন ব্যাখ্যা ঘটে না। অকীর্ষের চাঁদের সঙ্গে বাহিনীর মূখ্যভেদে কুলনার মূখ্য চাঁদের দাঁশ, সৌকর্য্য' আর লাকণ্যীকুকেই আমরা বৃদ্ধে নিই—অকৃত স্ব আকৃতিগত সদৃশ্য আমরা বুঝি না; ঠিক তেমনি চিত্রে কোভেও সদৃশ্যের সীমারেখাটি বুঝে নিতে হবে—কী শিল্পীর কী দর্শকের গড়ে।

সেই সীমারেখাটি কী? না, রূপে রূপে মিলের চেয়ে কিছু বাক্য ভাবে ভাবে মিল। প্রাচীন চিত্রকর জিউরিসের চিত্রকর্মে দেখে পাখী ভেবেছিল সত্যিকারের আগুত। কাশ্মীরেও সঙ্গে মিলের এই মিলকে কিছু সাদৃশ্য বলছি না; চিত্রে উপমান যেমন চাঁদ হতে পারে না। ঐ সদৃশ্যের চেয়ে দুটি লেখা বলি আমার মনে হয় বাক্যের মত সে দুটি চক্রে, তবেই বাক্য স্বরূপ-নানার ঐ চিত্রটি সাদৃশ্যের নিরূপে উল্লেখ।

'সাদৃশ্য' প্রসঙ্গের আলোচনাবলে 'শিল্পচর্চা' বলেছেন :

চিত্রে তেমন শতসত্তর ভেদ, স্বকৃতিস্বকৃৎ কলাকার মানসভিত্তিক মূখ্য ভিন্ন ভিন্ন কীর্তির অনেকই স্বকৃৎ সাদৃশ্য নিজেই। কলকেই বলিতে হইতবে যে ভাবের অনুরূপ বাহ্যে যে তাহা উক্ত সাদৃশ্য আর কেবলমাত্র ব্যাক্তি বা রূপের অনুরূপ বাহ্যে যে তাহা অর্থ সাদৃশ্য।

মহাজনক জাতকে প্রমোদভবনের দুটি মূখ্যের (চিত্র-৬ ও ৭) পরিকল্পনার সাদৃশ্য যে একটি প্রধান গুণ, একথা অনস্বীকার্য। কিন্তু শিল্পী দুটি মূখ্যশটেই দুই এক করে আঁকেননি। কলুনিতির ও পদ্মচাঁপটে সাদৃশ্য সেই—কিন্তু পাচপার্বতীর জীবন অনুগমে অপরূপ সাদৃশ্য। শিল্পী যেন গোষ্ঠেই এঁকেছেন কলকল। যেন এ নাটকের বিভিন্ন

মহাজনক জাতক  
চিত্র আলোচনা

চরিত্রগুলিকে প্রত্যেক করে এঁকেছেন। মহাজনক ও সীলারীর অকৃত্যে গত সৌন্দর্য্য অনস্বীকার্য, কিন্তু আগেই বলেছি, জীবন ব্যয়নার-ভ্রমের আলোচনা দুটিতে বৈপরীত্যই প্রকট। অন্যান্য চরিত্রগুলি—কলু ও কুলনার করে দেখেন। প্রথম চিত্রে সীলারীর ক্ষণের ঠিক উপরেই যে চামরশিল্পী-মোহিত আছে, তাকে দেখলেই মনে হয় সে যেন উপাসী, আনন্দান, সে যেন প্রমোদভবন থেকেও ওলায়ে কি ভাবে। এবার পিতৃবী চিত্রিত সর্বদীপনের রেখাটিকে চোখে—এ একই চরিত্র নয় কি? একটি চামর-অঙ্গুলি গালে দিয়ে সে যেন আনন্দে কি ভাবে। জীবকল্পকৃতের এ মোহিতের জনহাতে ছিল এক গোছা ফল—পদ্মচাঁপটেই যেন তা হস্তধৃত হবে। পিতৃবীর একটি মেয়ে আছে এ নাটকে, যে চার মঙ্গলক যেন সীলারীর আকর্ষণে লব্ধমুগ্ধ তা হন। প্রথম চিত্রে দুটি শতমের মাঝখানে দেখছি, সে যেন হাত তুলে মহাজনককে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে, পিতৃবীর চিত্রে চামরহস্ত এ মেয়েটিকে দেখছি সীলারীর ঠিক উপরেই। সে যেন আনন্দিতা, সে যেন উপভোগ করছে মহাজনকের এ সিংহাসন; একবার তার মূখই ফুটে উঠছে তৃপ্তির অভাস।

আরও একটি কথা। দ্বিতীয় চিত্রে (চিত্র-৭) সীলনকে দু'বার আঁকা হয়েছে। রাজার সম্মুখে সীলনী, রাজার কাছেও সীলনী। এ পাশের চরিত্রে কিন্তু প্রমোদকেই নয় ; সে তার শব্দমাতার কাছে অন্যর মতকরে উপবেশ নিচ্ছে। চলচ্চিত্রের ভাষায় যাকে আমরা 'স্ফার-ইম্পোস' বলি, এই খণ্ড-দৃশ্যটি বেন ভেমলি মূল চিত্রে আরোপিত। সীলিত ও অঙ্গনতার এ ছাত্তরী শিল্পজাতুর্বেই বহু নিদর্শন আছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এই দুটি নারী-মূর্তির পরিষেব বস্তু ও অঙ্গনতার একই রকমের—কিন্তু সেটি মাদৃশ্যের সম্বন্ধ নয় ;— এই দুটি নারীমূর্তি' যে একই ব্যক্তির অথবা যার তাদের মতবোধগরি, তাদের চাহনির, তাদের অঙ্গভঙ্গির ভাবকল্পের সৌসাদৃশ্যে। ফলে জাবের অনুপ্রাণনে চরিত্রগুলি একই ছন্দে মূলছে, একই সময়ের মাধুর্য বহনছে। আধুনিক চলচ্চিত্র নির্মাণের সময় একজন বারিকলীস ব্যক্তিকে বিশেষভাবে নির্দেশ করা হয় পূর্বাপর দৃশ্যে পারস্পরিক সমতাবিধানের কাজে (continuity)। অঙ্গনতার শিল্পীর তুলিতে কোনও মতে সে সামঞ্জস্যবিশিষ্টের এ অল্পভূত ব্যবস্থা করা হত ? পারস্পর্য শব্দমাত্র বসন-ভূষণ-নির্ভর নয়, অথবা ভাবগভীর পূর্বাপর ঘনিষ্টবন্ধ। এ যে কতবার কৃত্রিম অথবা নিজে বোঝানো যায় না। গোধ করি, এ কোনে কৃত্রিমই নয়, এ কোনে শিল্পজাতুর্মই নয়—এ হল ও'সের ধ্যানের ধন। হৃৎকলের পর্বতের অলৌকিক শিল্পজাত্য' বলাইলেন :

হৃৎকলের পর্বতের ভিতর বহিরে বা বহিরে ভিতরে পাসিয়েও চন্দ্র, বৈভব হৃৎকলের সর্বত্র ভবন হৃৎকলের আসল ভেগভেগই বহিরে পায় না, হৃৎকলের এই আসল ভেগ বা হৃৎকলের মর্ম কেন্দ্র জানন্যম্বর প্যরাই বহিরে পায়।

জাই বলছিলাম, এ অঙ্গনতা-শিল্পীর কোন প্রত্যেক-কোণালের কৃত্রিম নয়—এ ও'সের ধ্যানের ধন, সহজাত জ্ঞানচক্রের দৃষ্টি।



চিত্র-১৯ঃ সাদৃশ্য—লিখে-কটি।



চিত্র-২০ঃ সাদৃশ্য—ভেগেব কণ্ঠ।



চিত্র-২১ঃ সাদৃশ্য—ভবন কলম।



চিত্র-২২ঃ সাদৃশ্য—প্রশংসায়।

স্বতন্ত্রশব্দেই আঁকা একটি অনবদ্য চিত্রের সমালোচনাকালে শিল্পপরীক্ষক ডাঃ গেলারাম ইয়াসদানী বলেছেন, এই অনবদ্য চিত্রটির একটিমাত্র খণ্ড হচ্ছে কালকুমারীর জনপদায়ের পাড়া। চিত্রটি 'প্রসাধনরতা কামকল্যা' (চিত্র-৫০)। বস্তুতঃ, পাশ্চাত্য কলারসিকের শিল্পবিচারে

একথা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অম্বাচ শিল্পাচার্য অবশীশ্রুনাথ এ চকণবৃন্দার চিত্রই এঁকেছেন তাঁর ‘জলভাণ্ডাল্পে মূর্তি’ পুস্তিকার সাদৃশ্যপরিচয়ের উৎকৃষ্ট উদাহরণ দেখাতে। কারণ আমরা মনিনন্দন, কন্দুগ্রীষ, গোমুখ-কান্ত ইত্যাদি শব্দের ব্যবহারে যে ছবি কল্প করি ভারতীয় শিল্পী তাঁদের তুলির টানে কিরূপে সেই ভাব ব্যক্ত করেন তা বুঝিয়ে দিতে শিল্পাচার্য অনেকগুলি চিত্র এঁকে দেখিয়েছেন। শিল্পাচার্যের অনুকরণে আমি এখানে চারটি মাত্র উদাহরণ পরিবেশিত করলাম। লিহ-কটি, গোমুখ-কান্ত, চকণকমল ও পদপরাব। শেষে উদাহরণ মূর্তি নিয়ে শিল্পাচার্য বলেছেন :

কমলের মূর্তি ও পদপরে মূর্তি কর ও পদরে আকৃতি ও প্রকৃতিগত সৌন্দর্য্যে কলকাতা চিত্রকালে ও ভারতীয় মূর্তিগোষ্ঠীর যেমন স্পষ্ট পরিচয় দেওয়া যায় তেমনি পাই এমন আর কোনো দেশের কোনো মূর্তিগোষ্ঠে নয়।

অম্বাচ মহা হস্তে এই যে, শিল্পাচার্য যেভাবে পদপরাবের প্রকৃতি উদাহরণ বলে সংকলন করেছেন, তাই ইয়াজ্ঞবানী সেইখানেই লক্ষ্য করেছেন আঙ্গিক বিকৃতি বা ‘এল্যাটমিক্যাল ডিস্টোর্স’।

প্রসঙ্গতঃ বিশেষর বরষের একটি ঘটনার কথা বলে পড়ছে। কোন একটি সে-কালীন আধুনিক কবিরা আঁকার বাবাকে পড়ে শোনাচ্ছিলেন। যত্নের মনে পড়ে, কবি মূর্তীনি মস্তক কবিতা। কথা-প্রসঙ্গে আধুনিক কবির অন্তর্নিহিত ও দুর্বোধ্য শব্দ প্রয়োগের বিচার উঠল। আমি কলকাতায়, ম্যাক্স রবীন্দ্রনাথও অনেক ক্ষেত্রে অহেতুক দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করেছেন। উদাহরণস্বরূপ আমি সেই বিশেষ বরষের ঐশ্বর্য্যে দাখিল করেছিলাম এই পুস্তিকটি ‘হে পূর্বন, হরেক্ষণ করিছা তব রশ্মিআল’ ; বলেছিলেন এখনে ‘পূর্বন’ শব্দের প্রয়োগ শব্দ পঠকের কাছে পাণ্ডিত্য জাহির করা—যাতে তাকে বিশ্বাস হল যে ‘হে’ নিতে হয় পূর্বন শব্দের অর্থ ‘হু’। মনে আছে, যাবা তখনই তাঁর হইয়ের অলমারি থেকে ইশোপনিসম্ব গ্রন্থটি বার করে আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, আমার ব্যঙ্গ প্রান্ত। বলেছিলেন, কবিতাটি রচনা করার সময় কবির মনে ‘হে’ ছা পূর্বপদ্যব্দ সত্য ধর্ম্মের দৃষ্টে মস্তটি অনুপ্রাণিত হইছিল এবং সেইজন্যই এই পূর্বন শব্দের প্রয়োগ।

এই আপাত-অপ্রাসঙ্গিক ঘটনাটি উল্লেখ করলাম একথা বোঝাতে যে, আমাদের মূল্য-জ্ঞানের পৃষ্ঠা নিয়ে আমরা যখন কোন ব্যং শিল্পকর্মের বিচার করতে বসি, তখন প্রায়ই ভুল করি, আর ভুল সে করি যা বুঝি না বতকশ না সে জুড়ে কেউ বুঝিয়ে দেয়। বিশেষর বরষে আমি যে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করেছিলাম প্রায় সেই মাত্রার প্রমাণক উত্তিই কি করেননি পণ্ডিত-প্রকর ডাঃ ইয়াজ্ঞবানী, যখন বলেছেন এই পদ্যবলে ‘এল্যাটমিক্যাল’ ভুল হয়ে গেছে?

অকল্যাণিতেশ্বর পঞ্চপানির অনেক চিত্রটিতে (চিত্র-৮) লক্ষ্য করে দেখা যাক ওর দক্ষিণ কর্ণাঙ্গটির পরিকল্পনা। চিত্র-১০-তে দেখছি মূর্তিটি, অনুভব করছি ঐশ্বর্য্য মূর্তি পাকাত



চিত্র-১০।



চিত্র-১০।



চিত্র-১০।



চিত্র-১০।

হলে অম্বা-সংস্থান হওয়া উচিত চিত্র-১০-এর অনুসরণ, কিন্তু তাহলে তো রত্ন-হাসে সম্মিলিত মূর্তি চিত্র-১০-এর মতো হবে। চিত্রের বরমূর্তিটির বহিঃরূপ-রোমা এত শোভন করলেন কোন প্রেরণায়? সেরা অনুমান করব চিত্র-১০-এর দিকে চোখ ফেলেলে, বুঝ-পঞ্চপানির

করমুষ্টি কনুভুস্ত্র একটি শৃঙ্গকোষের বাদুশা ধ্যানের-দৃষ্টিতে দেখে আঁকা। 'গ্যানার্টাম' নাম, শিল্পীর মূল প্রাণ ছিল ভাবের জোহা।

অনুভূতভাবের প্রত্যক্ষবাদীর কটোর্যাকিক দৃষ্টি অনুযায়ী অবলোকিতেশ্বরীর দুটি বাহু ও হাতে যেন বাস্তবতার কাতর জটিলে। মানবদেহের অস্থি-সংস্থান অনুযায়ী দুটি হাতের বহিরঃপথেযা মেঝেরে আঁকার কথা সেভাবে এখানে আঁকা হয়নি। এখানেও বলব, শিল্পী



চিত্র ১৭ : মানব-কঙ্কাল (অবলোকিতেশ্বরীর হস্ত-হস্ত)।

সংস্কৃত কাণের বর্ণনায়িত্ব ভুলতে পারেননি। অজানাস্থিত বাহুর উপমান হচ্ছে করিমুস্ত্র এবং শৃঙ্গ। চিত্র-১৭-তে এইটাই যোগ্যতার চেষ্টা করা হয়েছে।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শিল্পী এভাবে প্রায় প্রতিটি চিত্রে একটা কোমলতা বা পেলবতার ভাব এনেছেন, যে সাক্ষীলতা। প্রথম ভারতীয় চিত্র-শিল্পের সঙ্গে এমনভাবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হয়ে গেছে যে, ভারতীয় দর্শকের চোখে তা অপ্রাকৃত বা অস্বাভাবিক বলে আঁখী মনে হয় না—স্বাভাবিক মৌলিকের সেরতক রূপেই অনুভূত হয়। এই দৃষ্টান্তগুলিকেই অবনীন্দ্রনাথ এবং পরে নন্দলাল প্রাধান্য দেওয়ার বর্তমান শতাব্দীতে অশ্রুত বহু ভারতীয় শিল্পীর তুলিতেও ঐ স্পন্দবহা মূর্ত হয়েছে।

আরও অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'অঙ্গপ্রত্যঙ্গ' মূর্তি প্রকল্পে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত ও মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন।

মুড়-অঙ্গের শেষ অঙ্গটি হচ্ছে বর্ণিকাভঙ্গ এবং এটিই শিল্পীর শেষ সাধনা। সেটি হচ্ছে তুলির উপর, রঙের উপর শিল্পীর বহল। মহাদেশের পর্বতকে কখনো, বর্ণজ্ঞান বা ন্যাসিত

বর্ণিকাভঙ্গ কিং তস্যা জগদুজ্জ্বলং? যদি বর্ণজ্ঞান না জন্মায়, যদি ঐ বর্ণিকাভঙ্গটি বর্ণিকাভঙ্গ

আরও বর্ণনা না হয়, তবে মূর্তিগোষ্ঠের আর পটভূমির সাধনা বৃথা যাবে। অঙ্গ ও পটভূমি কোন লয়ত হবে না। তুলি ও পট স্পর্শমাত্র না করেও শব্দে বুদ্ধি দিয়ে, মী-শরিত দিয়ে মূর্তিগোষ্ঠের প্রথম পটভূমির সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করা চলতে পারে। কিন্তু বর্ণিকাভঙ্গ? সেখানে তোমাকে তুলিহাতে আসরে নামতে হবে। শিল্পাচার্য বলছেন :

প্রাচীরে ছায়াটি বাহা তিলকত দিলিত হইলে, নিচের পাতের ঘেঁষটি বাহা একমূল একিক একিক হইলে, লতাতরু আসেবা শুম্ব হামিকো বাহা একই কাঁপিলে, সব নৃপ্ত হইয়া বাহা-হুসির আভার সেন্দীবা বাহিরা সেন্দেবে হস্তের কি ভিত্তিকারিতায়, স্পর্শের কত লব্ধিহা হুসিকা লব্ধা। তুলিটি হিক কতইত্ব চিত্রাধি, তাহার আভার কটো রঙ তুলিয়া লইব ও কুলিয়ার কেলি এবং সেই রঙ সৈমত 'ভল্ল তুলিটি হিক কতইত্ব চিত্রাধি জন্ম কতখানি এ চিত্রাধি কামেব উপর হুসিয়ার নিব-ইহারই সত্যত্ব প্রমাণ করে হইয়াছে মূর্তিগোষ্ঠের বর্ণিকাভঙ্গ নামে শেষ শিল্পা বা চিত্র শিল্প।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আধারা তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করতে পারি। প্রথমত, সমাপিকা বা একক-চিত্র ; দ্বিতীয়ত, কাহিনী-চিত্র এবং তৃতীয়ত, নকশা। সমাপিকা-চিত্র আমি সেগুলিকেই

বলতে চেরেছি বৈদ্যুলি স্বরসংস্কৃত—যারা একটি বিশেষ মুহূর্তকে

দিন ভেগীর চিত্র শাস্রত করে করে রেখেছে। মেরন-সপ্তদশ গুহার বুদ্ধদেব-গোপা-হামুল, অথবা প্রথম গুহার মাঝ ও বুদ্ধদেব, কিংবা সোড়শ গুহার প্রসন্নমতি নারায়ণের আদোখ, এগুলির বহুত্ব একটি স্বত-মুহূর্তে সীমিত। দ্বিতীয়ত, কাহিনী-চিত্রগুলি। সেগুলি

অধিকাংশই জাতক অবলম্বনে রচিত, অথবা স্মরণ বৃদ্ধদের জীবনের নানান ঘটনার অনুসারী। এই চিত্রগুলি একক-চিত্রে স্বল্পসংখ্যক নয়, ভাঙে সময়ের বিস্তার আছে,— পর্বতশীর্ষে চিত্র দর্শককে এগিয়ে নেওয়ার কালে এবং যেন রাস-ব্রহ্মের অসত্য প্রতিবেশী। এই জাতের চিত্রগুলিকে নিষ্কর করতে হলে সম্পূর্ণ কাহিনী-চিত্রটির সামগ্রিক ফলশ্রুতিতেও ভৌল করতে হবে। ভূতায়ত্ত, নকশা। এ সংক্ষেপে একটা পর্যন্ত আমরা কোন আলোচনাই করিনি; কিন্তু রবীন্দ্র প্রতিভার ধ্যানের যে স্থানে, অন্ধতার মহিমার এই নকশাগুলিরও সেই মর্মমা। ঘনবস্তু গাঁড়-কবিতা, অপরূপ উপন্যাস-ছোটগল্প-নাটক অথবা অসংখ্যক জনসম্মুখ প্রবন্ধ সত্ত্বেও রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রকৃত স্থানায়ন যেন সম্পূর্ণ হয় না রবীন্দ্র-সামগ্রিক বাদ দিয়ে, তেমনি অন্ধলোকী একক-চিত্র, অসংখ্যক কাহিনী-চিত্র, ভাস্কর্য, স্মৃতিস্তম্ভ সত্ত্বেও অন্ধতার কথা শেষ হবে না এই অপরূপ নকশাগুলির কথা আলোচনা না করা পর্যন্ত।

এক একে আলোচনা করা যাক।

চিত্র-সম্মুখের সম্মুখ গৃহ-অংশিক্রমিত, বিশেষতঃ প্রথম, দ্বিতীয়, ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ গৃহের প্রবেশ করলে প্রথম কয়েক নির্দিষ্ট দর্শক রীতিমত নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়েন। চারিদিকের মেওয়াল যেন হাঁকত মোড়। কোথাও একটু ফাঁক নেই, যেন ভীত করে আছে তারা। কোথাও কোন দর্শনীয় চিত্র আছে, কী ভাবের বস্তু, কোথায় আর শব্দ ও শেষ যেন যোকাই যায় না। তারপর আবার চোখ একটু সরে এলে, মন একটু স্থলত আত্মস্থ হলে, একে একে দেখা যায় যে, চিত্রগুলি মোটেই এলোমেলোভাবে সাজানো নয়—ভাবের একটি ধারা আছে। অসংখ্য জনসম্মুখ, অট্টালিকা, শোভাবাড়া, রাজসভা, পশু-পাখী, গাছ-পালায় ভিতর থেকে এক-একটি দৃশ্য ফুটে বের হয়। যোগ্য ব্যক্তি, এক-একটি অংশে এক-একটি কাহিনী-চিত্র শব্দ ও শেষ হয়েছে। এই কাহিনী-চিত্রগুলি দেখতে দেখতে দর্শক যাতে রাস্তা না হয়ে পড়েন, তাই যাকে যাকে একক-চিত্রে অথবা নকশা দিয়ে দুটি কাহিনীর মাকলাবে বিরাম বা মেন চিহ্ন দেওয়া হয়েছে। যেন দুটি একাক্ষ নাটিকা অঁচনের পর পরিত্যক্তে কিছুটা কাহিনী সূত্রের আলাপ।

সমাপিকা বা একক চিত্রের রীতি, ব্যাকরণ ও ক্রিয়াসের (কম্পোজিশন) সঙ্গে কাহিনী-চিত্রগুলির অন্ধ-পদ্ধতির বহুদিক প্রভেদ আছে। একক-চিত্রগুলি অধিকাংশই প্রতিসাম্যমূলক। অর্থাৎ, কেন্দ্রস্থলের কোন একটি বস্তু বা ব্যক্তিতে দৃশ্যের সমগ্রিক গুরুত্ব আরোপ করেন এবং তার দু'পাশে উপরে ও নিচে ফিগার বা বস্তু-নিচয় এমনভাবে সাজাতে থাকেন, যাতে ভারসাম্য রক্ষিত হয়, যাতে দর্শকের দৃষ্টি কেন্দ্রভিত্তিক হয়। পুরুত্বের বলে জিল ফেললে যেমন সেই কেন্দ্র-বিন্দু চতুর্দিকে

সমতা রক্ষা করে তরঙ্গ-কম্পনা বৃত্তাকারে ছড়িয়ে পড়ে, কোন কোন চিত্রে সেইভাবে ফিগার-গুলি চারপাশে সাজানো। যেমন দৃশ্য ও মার (চিত্র-১১), যেমন সারথীদ্বয়ের পরীক্ষা (চিত্র-৫৬) অথবা স্বর্গে বৃদ্ধদের (২।২৭)। এ তিনটি উপাধরণই এবং এ ব্যতীত-চিত্রের প্রায় সবটাই কেন্দ্রীয় চরিত্রটি সামনে-ফেরা। স্বর্গে বৃদ্ধদের চিত্রে তেও দ্বিতীয় কাহিনী রায়ের কানের পুরুত্বের মত একেবারে সামনে-ফেরা। এতে সবটাই কেন্দ্রীয় চরিত্রটি প্রতিসাম্য রক্ষা করে। দৃশ্যের তখন দু'পাশে, উপরে ও নিচে, অন্যান্য ফিগারগুলি সাজতে গুরুত্ব। দু'পাশে যে সম-সংখ্যক ফিগার থাকবে এমন কোন বর্ণনা-নিয়ম আর নেই। সংখ্যার ঘাটতি রক্তের গাঢ়তা দিয়ে, উল্লেখ্য দিয়ে পূরণের দ্বারা কেন্দ্র-বিন্দুকে এই নিয়মের কাঙ্ক্ষিত করে আবার নতুন পদ্ধতি বেছে নিলেছেন কোমর ও বা। যেমন ধরা যাক, বৃদ্ধদের-সংখ্যা-বাহুল্যে চিত্রটি (চিত্র-৫৭)। এটিও প্রতিসাম্যমূলক চিত্র। কিন্তু কেন্দ্রবিন্দু কি? কেন্দ্রবিন্দু এক্ষেত্রে শব্দ। বৃদ্ধদের বাম-কন্ঠের উপর দিয়ে চীনা একটি কল্পিত উদ্ভাসিত রেখার দু'পাশে চিত্রটি প্রতিসাম্য রক্ষা করেছে। বিশালারতন বৃদ্ধদের দেহের তুলনার গোপ্য ও রাহুল অত্যন্ত নগ্ন। দৃশ্যের এভাবে ছোট-বড় করে আঁকতে ব্যস্ত হয়েছেন বৃদ্ধদের চিত্রে মহত্ত্ব ও বিরুদ্ধের আরোপ করতে। তাই প্রতিসাম্যের আঁতরে দৃশ্যের দৃশ্যে একটি বিশাল

ভোরগ-শ্যার এঁকে ভারসাম্য রক্ষা করেছেন। ঘোর রক্তের প্রলেপ দিয়েছেন গোপা ও রাইলকে অকস্মেৎ। শ্যাস ও রঙ নিয়ে বহি ভৌল করেন, দেখবেন এই কল্পিত সরলরেখার দু'দিকের পারাই সমান ওজনের।

এবার কাহিনী-চিত্রগুলির বিন্যাস বা কম্পোজিশনের প্রসঙ্গো আসা থাকে। এখানে একটি গ্রুপ শরাসেন্দুর্ঘ্য নয়—তার কাজ হচ্ছে দর্শককে বিশেষ একটি ঘটনার কথা জানিয়ে দেওয়া।  
কাহিনী-চিত্রের  
বোঝান  
এক পরবর্তী ঘটনার দিকে অগ্রে টিকানত চালিত করে দেওয়া। শূন্যে তাই  
নয়, কেবলমাত্র যে এই শব্দচিত্রের ঘটনাটি শেষ হল অগ্রে দর্শককে বুঝিয়ে  
দেওয়া। ফলে, এখানে বর্তিচিহ্ন—কথা, সোমিকোলন, ছেদ ও অগ্ন্যয়ের  
বিন্যাস বা পাণ্ডুরেলন-মাক'গুলি দর্শকের জ্ঞান থাকে রাই। কথা-সাহিত্যে আমরা পরিচেন  
টেনে, অগ্ন্যয়ের মাধ্যমে সংখ্যা লিখে কাহিনীটিকে কালানুক্রমিকভাবে জাগ করে থাকি। নাটকে  
পটভঙ্গির ব্যবস্থা থাকে, চিত্রচিত্রে ফেড-আউট, ফেড-ইন করে অথবা ডিসলু-জ-কার্ট-ওয়েইপের  
মাধ্যমে দর্শককে দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে আনা হয়। অবলম্ব্যের শিল্পীকেও ডেজনি কতকগুলি  
বর্তিচিহ্নের আবিষ্কার করতে হয়েছে। চিত্র থেকে চিত্রান্তরে যাবার মাধ্যমের ফলে কোথাও  
বসিয়েছেন ভোরগ-শ্যার, কোথাও বৃক্ষ, কোথাও বা অট্টালিকার একটি অঙ্গিন। বেশ অনুভব  
করা যায়, একটি বর্তিচিহ্ন পার হয়ে এসে। বিশালন্তর জাতক-কাহিনীতে (১৭।২৫) অথবা  
চম্পলা জাতকে (চিত্র—১৪, ১৫) এই বর্তিচিহ্নগুলি প্রায়শই লক্ষ্য। পূর্ণ-অবস্থান জাতকে  
জাণিসের নৌকা তক্ষা ও দুই জাইয়ের প্রাকৃতী আগমনের মাধ্যমে সমস্তর ব্যবধান বোঝাতে  
দিল্পী দুটি সমান্তরাল লেখা টানতে বাধ্য হয়েছেন (চিত্র—২২)। এছাড়া, প্রথম দৃশ্য থেকেই  
অগ্রে একটি অজানব বর্তিচিহ্নের ব্যবহার করেছেন তাঁরা। সেটি হচ্ছে বিভিন্ন ঘণ্টারের দুখ-  
ফেরানোর ভঙ্গি। শিল্পী দেখলেন, চিত্র থেকে চিত্রান্তরে সরাসরির পথে কোন শব্দ বস্তু না  
য়েথও শূন্যমাত্র মিলেরগুলির দৃশ্য এখিক থেকে ওদিকে ঘুরির দৃশ্যান্তর বোঝানো সম্ভব  
হচ্ছে।

কয়েকটি উদাহরণ নিয়ে দেখা যাক। করা বাক মহাভারত-জাতকের কাহিনীটি। চিত্র—৬ ও  
চিত্র—৭-এ আমরা যে চিত্রগুলি দেখেছিলাম সেগুলি সামগ্রিকভাবে দেখা যাচ্ছে চিত্র—৯-তে।



চিত্র—৯৬ মহাভারত চিত্র-নাট্যের-চিত্র।

এ কাহিনী-চিত্রটি যেন একটা চার-অক্ষের নাটক। চিত্রনাট্যকার কীভাবে তার নাটককে সাজিয়েছেন তারই বিশ্লেষণ করার আমরা।

প্রথম অঙ্ক : প্রথম দৃশ্য—'A'-চিহ্নিত প্রথম বৃত্তটি—চিত্র—৬-এর বামদিকের অংশ—  
সজাকক্ষ :

দ্বিতীয় দৃশ্য—'B'-চিহ্নিত দ্বিতীয় বৃত্ত—চিত্র—৬-এর বামদিকের অংশ—  
—নর্তকীন্দ।



শিঙীর অঙ্ক প্রথম দৃশ্য—'C'-চিহ্নিত বৃত্ত—মহাজনক হস্তিশপুটে ভোরসুখার অভ্যন্তর  
করে হিমালয় পর্বতে সমরাসী দর্শনে চলেছেন।

শিঙীর দৃশ্য—'D-E'-চিহ্নিত উপবৃত্ত—হিমালয় পর্বতের খটনা।

তৃতীয় অঙ্ক : প্রথম দৃশ্য—'F'-চিহ্নিত বৃত্ত—মহাজনক-জননী ও সীলী।

শিঙীর দৃশ্য—'G'-চিহ্নিত বৃত্ত—মহাজনক সীলীকে মসোর ভায়েগের  
সিঁথিতে জানাচ্ছেন। চিত্র—৭-এর কামিনিকের অংশ।

চতুর্থ অঙ্ক - প্রথম দৃশ্য—'H'-চিহ্নিত বৃত্ত—মহাজনক ভোরসুখার অভ্যন্তর করে  
সমরাসী দিতে চলেছেন। চিত্র—৭-এর দক্ষিণদিকের অংশ।

এবার লক্ষ্য করে দেখুন, প্রথম অঙ্কের দুটি দৃশ্য যেন একটি উপবৃত্তের (ellipse) অঙ্গভূক্ত। মহাজনক ও সীলী যেন মনোমুগ্ধ ও রতিভঙ্গিতে প্রতীকরূপে এই উপবৃত্তের দুটি 'নাভি' (focal)। এই দৃশ্যদ্বয় একই স্থান-কালের অঙ্গভূক্ত, ফলে বৃত্ত দুটিকে একই উপবৃত্তের অঙ্গভূক্ত করা গেছে এবং তাদের মাঝখানে চিত্রের কোন পূর্ণস্কেলের টেনেদান, যেমনহে একটি 'কম্পা-চিহ্ন', শব্দের রূপে। অপর পক্ষে 'B' ও 'C'-চিহ্নিত দৃশ্যদ্বয় একই স্থান-কালের নম্, এই দুটি দৃশ্যের মাঝখানে তাই অঙ্ক-সমাপ্তির স্বনির্ভর টেনেহে রেখে ভোরসুখার পূর্ণস্কেলে। অঙ্ক এই ভোক্স ঘটি-চিহ্নটি নাইক প্রাক্ষিত বা আরোপিত নম্—কাহিনীর সঙ্গে অঙ্গভূক্তভাবে মিশে গেছে। অনুদৃশ্যভাবে শিঙীর অঙ্কের দুটি দৃশ্য—'D' ও 'E'-চিহ্নিত বৃত্তদ্বয় পুনরায় একটি উপবৃত্তের 'নাভি' সংলগ্নিত। এই উপবৃত্তের নাভিদ্বয় কল্লুতা স্বাক্ষর্যের দুই প্রধান চরিত্র—হিমালয় পর্বতের সমরাসী ও মহাজনক। শিঙীর অঙ্কের পর পটভূমির বর্তনে স্থান-কালের পাখিও রেখেহে পুনরায় এক প্রচীর-দেখা। এলাহ তৃতীয় অঙ্কের দুটি দৃশ্য, হিমালয় পর্বত থেকে রাকপ্রাসাদে আমর ফিরে এলাহ। তৃতীয় অঙ্কে পুনরায় একটি উপবৃত্ত 'F' ও 'G'-চিহ্নিত বৃত্তদ্বয়কে ধরে রেখেহে :—না, এবার উপবৃত্ত নম্, এবার যেন মনে হাচ্ছে F ও G দুটি চাক—উপবৃত্তোপায় একটি ক্যান-কেল্ট যেন আটতানে। যেন, F-চিহ্নিত ছোট চাকটি এই ক্যান-কেল্টের সাহায্যে G-চিহ্নিত বড় চাকটিকে ঘোরাতে চাইহে। বহিঃস্থের এই স্বক-কিন্তু কাহিনীর সঙ্গে একসুরে কথা। F-চিহ্নিত ক্ষুদ্রতর বৃত্তে দেখাই মহাজনক-জননী তাঁর পুত্রকেহে নির্দেশ দিচ্ছেন, কী-ভাবে মহাজনককে মসোর আকর্ষ করতে হবে আর সীলী নতকান্দু হয়ে শব্দমাড়ার আদেশ শুনছেন। G-চিহ্নিত বৃত্তে দেখাই মহাজনক তাঁর ঘোঁসটিকে মসোর-ভায়েগের সংলগ্ন জানাচ্ছেন। তৃতীয় অঙ্ক শেষে পুনরায় স্বনির্ভর বা enthrall—পূর্ণ-বৃত্ত প্রাসাদ-ভোরসুখ। চতুর্থ অঙ্কে মহাজনক মসোর ত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন।

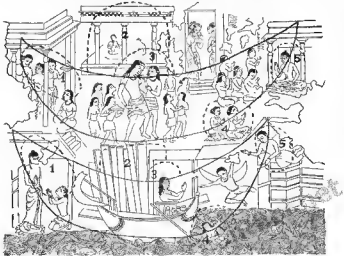
অঙ্গলতার কাহিনী-চিত্রশৃঙ্খল চিত্রনাট্যের এ-জাতীয় বিশ্লেষণ ইতিপূর্বে কোনও বিদ্যালয় চিত্র-সমালোচক করেহেন বলে জানি না। আমার বিশ্বাস, এ-বিষয়ে গভীরভাবে গবেষণা করলে, অঙ্গলতাচিত্রের অনেকগুলি নতুন রহস্য প্রতিভাত হবে। তাই এই প্রসঙ্গে আরও বিশদভাবে আলোচনা করে দেখাই অঙ্গলতা শিল্পী দর্শককে কী-ভাবে তাঁর কাহিনীর পটভূমি ইচ্ছা করে দিয়েছেন।

লক্ষ্য করে দেখুন, প্রথম বৃত্তে (A-চিহ্নিত) সব করটি চরিত্র উপস্থিত। রাজারানীর দিকে তাকিয়ে আছে। একমাত্র ক্যিভর দৃশ্য শেখের মেরেটি : সে-এই কুৎসারানীর নিচের বাসীটি (চিত্র—৬ দেখুন) তাকিয়ে আছে বিপরীত দিকে। ওই কুৎসারানী দর্শককে কাহিনীর গতিপথের ইঙ্গিত দিচ্ছে—শেখের দিকে পরবর্তী দৃশ্যে। অনুদৃশ্যভাবে C-চিহ্নিত বৃত্তের পর কাহিনী যে উপর দিকে যাবে তার ইঙ্গিত দিতে শিল্পী একটি রেখা একেহে—হস্তিশপুটে মহাজনকের মেরেদন্ত, দক্ষিণবহত ও ছত্রদন্ত একটি সরল-রেখার দর্শককে উপরে দিকে, D-চিহ্নিত বৃত্তের দিকে সেতে কাছে। এই D-চিহ্নিত বৃত্তে সমরাসীর পদমূলে যে হরিণটি আছে সেটি কাহিনীর সঙ্গে একসুরে কথা। উপদৃশ্য হরিণটি সমরাসীর ঘনিষ্ঠত্ব স্বাক্ষর্য শুনবে। সারনাথ হৃৎকালের একটি সাক্ষ্য সে কুটিরে তুলছে ; কিন্তু এই সঙ্গে সে আশ্চর্যের দিক থেকে আরও

একটি উপকার করছে। তার উপদ্রব্দে ভীষণিই যেন একটি ভীষণ-চিহ্নের ফলা। দর্শকে সে কাহিনীর গতিপথ নির্দেশ করছে। একই ভাবে লক্ষ্য করুন E-চিহ্নিত বৃত্তের প্রতিটি কুশীলব জাকিয়ে আছে সম্যাসীর দিকে, একমাত্র বাড়ির বৃত্তের শেষপ্রান্তের লোকটি। সে কাহিনীর গতিমুখের দিকে ফিরে বসছে। একই ভাবে H-চিহ্নিত বৃত্তের শেষপ্রান্তের ছেলেরা বিনোদ মহাজনের দিকে ফিরে আছে (চিত্র-৭ দেখুন) তবু তার জান হাতটি দর্শকে চিত্রকর্মের গতিপথ দেখিয়ে দিচ্ছে। তার উপরে-অর্থাৎ খজরীকবরও একই ইঙ্গিত করছে।

আমরা যা আলোচনা করলাম তা যে কাকতালীয় নয়, গ্রন্থকারের উর্বর-মস্তিষ্কের উপজট কল্পনা নয় তা প্রতিষ্ঠিত করার একমাত্র উপায় আরও দু-একটি উদাহরণ নিয়ে যাত্রাই করে দেখা। অসুন্দ, এবার পূর্ণ অবস্থানের কাহিনী নিয়ে বিচার করি।

চিত্র-২২-এ আমরা পূর্ণ অবস্থানের একটি অংশ দেখেছি। এটি একটি দুই-অঙ্কের নাটক। নিচে প্রথম অঙ্ক, উপরে দ্বিতীয়; এবং দুই অঙ্কের মাঝখানে একটি সুদৃশ্য ছেদ রেখা। এখানে কাহিনীটি সমুদ্রযাত্রাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে—জলমারায়ে এ নাটকের মূল ঘটনা। তাই শিল্পী দুটি অঙ্কেই এক-একটি নৌকার আকারে সাজিয়েছেন। নিচেকার অঙ্ক কামরুলের যে দৃশ্যে বৃন্দসেব ও পূর্ণকে দেখছি তার পর নৌকার পাশ-এর এক ঘাঁড়িই,



চিত্র-২২। পূর্ণ অবস্থানে চিত্রনাট্যের স্থল।

এ পাশের দাঁড়িটি আমাদের পথনির্দেশ করছে পঞ্চমতী দৃশ্যের দিকে। কেন্দ্রস্থিত নৌকার দৃশ্যে প্রধান কুশীলব জাকিলের ভাণ্য যে দুটি গিপরীতময়ী অকর্ষণ-বিকর্ষণের ঘর্ষণবর্তে পড়েছে সে ভাণ্যটি শিল্পী জানিয়েছেন একটি সুদৃশ্যকল্পিত কাহিনীর। নৌকার দাঁড়ি নির্দেশ করছে জলতরঙ্গের বক্ষসৈন্যদের এবং নৌকার অলঙ্কৃত গাঙ্গুইটি নির্দেশ করছে জাকিলের

চৌকসতীর দিকে—কাহিনী বেন এখানে স্থিতিবিহীন হয়ে রূইয়াক্সের প্রতীক্ষা করছে। অনুরূপভাবে উপরের অঙ্কেও আমরা দেখছি মূলতঃ তিনটি গ্রুপ। সর্ব্ব্বারমের গ্রুপে চারটি চরিত্র, তারপর মস্তকের এক ছেদ রেখা। ঐ গ্রুপের তৃতীয় সে রেখাটি অর্ধাঙ্গালা বহন করে এনেছে তার মূখ্য ক্ষেত্রের ভূমিতে আমরা চলে আসি কেন্দ্রস্থ গ্রুপ-এ। এটি পূর্ণ ও জ্যাক্সের দল। সেটি ত্রিকোণাকৃতি। ইংরাজিতে একে বলে পিরামিড কম্পোজিশন। পূর্ণের মস্তক এই ত্রিকোণের শীর্ষবিন্দু। তৃতীয় গ্রুপ একটি উপস্থিত। তার একপ্রান্তে পাঁচটি চরিত্র অপর প্রান্তে একা বৃন্দবেশ—তবু রক্ত ও রেখার একে বলা কহুলা গুরুত্রে ভারসাম্য টিক মতই বর্ণিত হয়েছে।

নিচের প্যানেলটির কম্পোজিশনে মৌলিকত্ব ও শৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এটি ত্রৈণীয়াত ছাদলিক কম্পোজিশন। এর মূল ছন্দ হচ্ছে নৌকাটি। লক্ষ্য করে দেখুন, বামদিক থেকে বৃন্দবেশ, পূর্ণ, নৌকার তলদেশের বরুণেখা, দেহদত্ত ও উত্তীর্ণমান পূর্ণ একটি অর্ধ-চন্দ্রাকার মালাক আকারে সাজানো। বেন সেটিও একটি নৌকা। এটি মনস্ককে দেখতে পেলে এগর লক্ষ্য করে দেখুন, উপরের তিনটি বক্তৃতাও অনুরূপ আর একটি নৌকা। শব্দে তাই না, দৃষ্টি কল্পিত-নৌকাতেই বিভিন্ন গ্রুপগুলি একই ছন্দে সাজানো। এ তথ্যটা বুঝতে সুবিধা হবে যদি ঐ চিত্রের উপরে আমরা কল্পিত অর্ধবৃত্তাকারবস্তুর বহিরঙ্গ-রেখা আরোপিত করি (চিত্র—১১)। এখন দেখুন, প্রতিটি গ্রুপ কী-ভাবে পরস্পরের পরিপূরক হয়ে উঠেছে! দৃষ্টি অঙ্কের সামঞ্জস্য-বিধানে কী সূচ্যে পরিচালনা—এমনকি শিল্পী নিচের নৌকার খড়্গা চন্দন কাঠগুলিকে ‘ব্যালেন্স’ করতে উপরের খড়্গা মস্তক তিনটিকেও একই ছন্দে সাজিয়েছেন।

আপনি যদি এবারও আমরা উর্বর-মস্তিষ্কের অভিব্যোগ তোলেন, তবে আমার পক্ষে অজস্রপক সমর্থনের সহচর্যে ভাল উপর তৃতীয় একটি উদাহরণ দেখ করা। বেশ, তাই করছি -

দশম-ঠেঙে দেখা স্বল্পমস্ত জাহজের চিত্রটি নিচে আসুন বিচার করে দেখা যাক। এ চিত্রটির বিশ্লেষণিত রূপ আমরা দেখছি চিত্র—৩৭-এ। পূর্ণ অবস্থানে যেমন সমুদ্র-বাহ্যকে ঘিরে কাহিনীটি গড়ে উঠেছিল, এখানে তেমনি কাহিনীটি গড়ে উঠেছে জাহজের ফুর স্ফুটায় জন্মান্তরবাদ-অবু। অজন্তা তো মনে হয়েছে, অজন্তা শিল্পী তীর কম্পোজিশন-এর মাধ্যমে একটি তত্ত্বকথা শোনাতে চেয়েছেন : জন্মান্তরবাদ একটি নিরবচ্ছিন্ন ধারা! আমাদের খণ্ড-



চিত্র—১০০ঃ স্বল্পমস্ত জাহজকে চিত্রায়ণে গ্রহণ।

অীকনের হানি-অগ্রদু আনন্দ-বিবাদ পরবর্তী জীবনে—একই ছন্দে ফিরে ফিরে আসে। এই তত্ত্বটাই শিল্পী তীর তরঙ্গায়িত কম্পোজিশনে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। বৃন্দবেশ ছিলেন জাহজের—পূর্ণ-পূর্ণ জীর্ণের ঘটনা ভিত্তি ভুলে গেলেন। কিন্তু সাধারণ মহামান্দু আমরা সে সত্যটা প্রাপ্তান করি না। যদি আমাদেরও সে দৃষ্টি থাকত তাহলে আমরাও দেখতাম

একই নাটক এই দুনিয়ায় ব্যয়ে ব্যয়ে অভিনীত হচ্ছে; নারক-নারিকর প্রায় একটি শাস্বত সতা, চিরন্তন সতা খল-নারকের কণ্ঠভাঙে। শিশুর এই মেঘ-গোপ্তের তুলনায় বহুত বৃদ্ধ মেওয়া সহস্র হর হরি আমজা এই চিত্রের উপর কণ্ঠকণ্ঠ কণ্ঠিত গুহল-হেথা আবেশ করি (১৮-১০০)। এবার আমজাও বৃদ্ধদের মত গাতিস্বরে হয়ে উঠছি।

এবারে সেবদ, প্রতিটি ভরঙ্গের কেন্দ্রে আছে অরকা-চিহ্নিত মূল আকর্ষণ, বা-খেচ কোটিজুটা এঁকে অন্যান্য চিত্রের প্রতি কিস্তারটা যোগানো হয়েছে। প্রথম ভরঙ্গের শীর্ষে



চিত্র-১০১ঃ শূন্যসংকেত দ্বারা চিত্রায়িত নিয়ম।

দক্ষিণে দুটি, বামে একটি মূখ-সমতায়ক করে শিখরী ভরঙ্গ-শীর্ষে বামে দুটি, দক্ষিণে একটি মূখ। প্রতিটি ভরঙ্গের পাদদেশে একই পদসেবাকারী কিস্তারী। এখন কি মনে হচ্ছে,

কম্পোজিশনের সৌন্দর্যনিকতার মাধ্যমে শিল্পী কল্পান্ধতার একটি অলংকারিত্ব বাজনার তির্যকপ্রকাশ করতে চেয়েছেন? অর্থাৎ এখানেও কাকডালীর কিছ্রু ছটোঁন?

অমলতা চিত্রনাট্যে বর্তীচিহ্নের ব্যবহার বিষয়ে আমরা আরও একটি উদাহরণ নিয়ে এগার দেখব। চিত্র-৩৫-এতে সূর্যসেয়ার জাটকের অনেকখানি আমরা একসঙ্গে একে পৌছিয়েছিলাম এবং কাহিনী যে সীমাল গতিতে দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে গিরিয়েছিল তা অটোচালনা করেছিলাম। ঐ চিত্রের উপর এবার একটি গ্রাক অরোগ্যপত করে আমরা কাহিনীর গতিচ্ছন্দটা যত্নে নেবার চেষ্টা করব (চিত্র-১০১)। কাহিনীর সূর্য G-1 খোপে। কাহিনী এগিরে চলে সূর্যসেয়ার গতিমুখে, সৈন্যদের মাথার উপরে-বাঁকা একটি পাখরের প্রাচীর-যে পর্যায়-প্রাচীর উপরিংশিত রাজমুদ্রার পরবর্তী দৃশ্যকে পৃথক করেছে। তারপর A-3-চিহ্নিত খোপে হরিণদৃশ্যের গ্রীবা-ভাগের নির্দেশ নিয়ে আমরা উপর দিকে চলেতে সূর্য করলাম। সেখানকার প্রান্তর-খণ্ড এবং সিংহীর গ্রীবাভাগের (B-3) সংকেতে আমরা নিশ্চিন্তভূত সূর্যসেয়ার দৃশ্যে এসে উপনীত হলো। পরবর্তী দৃশ্যে দেখছি—রাজা উঠে বসেছেন। এখানে সূর্যসেই আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু—তাই এই প্রকোপাকৃতি পিরামিড-কম্পোজিশনে রাজমুদ্রাকেই প্রকোপের শীর্ষবিন্দু। এরপর রাজার মাথার পিছনে অবস্থিত পর্যায়-প্রাচীর (A-6) কাহিনীর গতিমুখে সম্মুখে আমাদের অবস্থিত করেছে। তাই অন্যরাসে রাজার সঙ্গে আমরা শোভাযাত্রার যোগ দিই, নগর-তোষণে অতিক্রম করে ফিরে আসি আরম্ভক পটভূমি থেকে নাগরিক জীবনে। পথ হারাবার ভয় নেই—সিংহীর গতিচ্ছন্দ এবং পদ্মশোভা-বর্ধক ফেন্দুনেই আমাদের পথ দেখাচ্ছে, দেখাচ্ছে সার-দিয়ে-বসা দর্শকদল। এ খণ্ড-দৃশ্যে সিংহীই কেন্দ্রবিন্দু, তাই সবচেয়ে তার দিকে দৃশ্য ফিরিয়ে আছে। কিন্তু সিংহীর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে গিরে আমরা চিত্র-সীমান্ত অতিক্রম করে গেলাম। তার প্রয়োজন ছিল। পরবর্তী দৃশ্য যে পরবর্তী জন্মের অন্তর্ভুক্ত—স্থান-কাল-পাত্রের পরিবর্তন হবে পরের দৃশ্যে, তাই ঐ বিরতির ব্যবস্থা। ইণ্ডোরডালা।

দ্বিতীয় জন্মের প্রথম দৃশ্য সূর্য হচ্ছে G-3-চিহ্নিত খোপে। এগার দর্শক থেকে আমরা বামে এগিরে যাব। এগার আমাদের গতিপথ একটি পর্যায় স্তম্ভে (C-3) কাতে হবে, বাঁধে কাষপ্রান্ত নদী বেজাবে থেকে যাব, সেইভাবে আমাদের গতিপথ দৃশ্য যোয়ার। ঐ স্থানে আঁকিত কিছ্রু পটপ্রদায় (C-3) আমাদের নির্দেশ দেয় : সেনাপতি কাল্যাহারির পিছ্রু পিছ্রু প্রকাষের সঙ্গে রাজসভার প্রবেশ করতে হবে। রাজা-প্রজার মৃদু-দৃশ্য চিত্রের বাহিরে—সেই দিকেই চিত্র-ফ্রেমের বাইরে চলে যেতে বাধ্য হই আমরা।

লাফা করে সেধুন, নাগরিক এবং আরম্ভক জীবনকে শিল্পী কী সূর্যদৃশ্য ভাগিমার পৃথক করেছেন, কী অশ্বত্থ নিপুণতার সঙ্গে চিত্রনাট্যকে সাজিয়েছেন। তাই, অনেক পূর্বেসূরী খণ্ডিত বলেছেন যে, অমলতার কাহিনী চিত্রদর্শি এলোমেলোভাবে সাঙানো, আমরা কিন্তু সে-কথা সর্বাঙ্গগ্রহণে মেনে নিতে পারছি না। আমাদের মনে হচ্ছে, এ কাহিনীর বস্তুনিষ্ঠতায় আমরা ত্রিকমত শিক্ত নই বলেই এ-কথা মনে করি। অমলতা-শিল্পের আদিপটুটি হতে নিতে পারলে এ নাটক মোটেই দুর্ভেদ্য মনে হবে না।

একক-চিত্র ও কাহিনী-চিত্রের অঙ্গন-বীতি ও কম্পোজিশন নিয়ে আমরা এতক্ষণ আলোচনা করেছি, এবার তৃতীয় জাটের ছবি-নকশার প্রসঙ্গে আসতে হয়। অঙ্গনতার এই নকশা বা অঙ্গনকরণ-চিত্র হচ্ছে তার প্রাপ্তির বস্তু। এ-কথা স্বীকার করতেই হবে যে, আখ্যান-চিত্রে কাহিনীই মৌল, চিত্র গৌণ। কাহিনীর প্রয়োজনেই চিত্র সৃষ্টি করা হয়েছে, সে কাহিনী শব্দ-সম্মত ও পূর্ব-নির্ধারিত। শিল্পের প্রয়োজনে কাহিনীর সামান্য রকমের হাতে পারে, অঙ্গন-কাল হাতে পারে না। ফলে, চিত্রই কাহিনীর অঙ্গ। তাছাড়া, শিল্পীর মৃদু উদ্দেশ্য দর্শকের মনে ধর্মের অনুশ্রবণ ও ভাব জাগিয়ে তোলা—তাই 'আর্ট ফর আর্টস সেক' এ বাণী সেখানে অঙ্গল। তবু দেখছি, কাহিনী কোথাও চিত্রশিল্পের ভার হরানি-হয়েছে বাহক, হয়েছে সাধী।

শব্দ বা বর্ণা যেমন রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরের ভাব বা ভেদ্য নয়, তার প্রায়। কিন্তু এই নক্সা-  
 গুলিতে কোন কাহিনী নেই, সেখানে কোন বর্ণা বা কথা নেই—অথচ যেন শব্দ-  
 নক্সা বা সঙ্গীত-বর্ণা সাংকেতিক-ধ্বনির সাহায্যে রূপদী-সঙ্গীতের অঙ্গণ। সেই  
 সাংকেতিক-বর্ণা এখানে হচ্ছে রেখা আর রঙ। রেখার কঁচি ও কেমলে, রঙের  
 মীড় ও মূর্ছনার শিল্পী যেন চিত্রের আসরে রাগপ্রধান সুরের আলাপ করছেন এই নক্সা-  
 গুলিতে।

কিন্তু রূপদী-সঙ্গীত নয়, আমরা এই নক্সাগুলির সঙ্গে ইতিপূর্বেই তুলনা করেছি  
 রবীন্দ্রসঙ্গীতের। গীতিকজানের সহস্র সঙ্গীত যেমন সহস্র ভাবের গোঁড়ক, এই অঙ্গকরণের  
 নক্সাগুলিও তেমন সহস্র ভাবের ব্যঙ্গক। ডাটে কখনও রক্ত রস, কখনও বীভৎস রস, আবার  
 কখনও বা হাস্য রস, কদম্ব রস। এই অঙ্গকরণ-নক্সার আছে জাম-আতা-অঙ্গুর-আনারসের  
 'নৈবেদ্য', আছে পদ্ম-চাঁপা-চন্দ্রমুখী-চমেলার 'পীতিমাল্য', আছে রঙ ও রেখার 'পীতাজমি'।  
 এত বিভিন্ন ভঙ্গি, বিভিন্ন ভাব, এক রেখার কারিগরি এই নক্সাগুলিতে মিল্লবর্ণিত করা  
 হয়েছে যে, বিশেষে স্তম্ভস্ত হতে হয়। বিষর-বন্দুর বৈচিত্র্যই কি কম? হাতী, ঘোড়া, মহিষ,  
 ঘাবরান হরিণ, হনুমান, কাকাতুরা, রাজহাঁস, পাতিহাঁস, বানর, বাঘ, সাপ—কী নেই? আবার  
 উদ্ভট কিশুত নাগ, কিয়দ, কৃষ্ণনগরী পাটুরার অরুণা-পেচারা, আত্মশ্রুতি লক্ষ্মণ ও আছে।  
 বিষর-বন্দু হ্যাঁকাই শব্দসমূহ রঙ ও রেখার আলপনাও আছে। ফল-ফুল-জাটা-পাতার বৈচিত্র্যই  
 কী কম? পদ্মফুলই বা কত রকম। শাড়ির পাড়ের মত নকশা আছে, লক্ষ্মীপুত্রের  
 আলপনার মত গোলাকৃতি নকশা আছে, আবার ছোট ছোট চৌমুখিতে ছোট ছোট বিষর-  
 বন্দুও আছে।

দুটি কথা বলব। প্রথমতঃ, অঙ্গকরণের মৌলিকতা। অঙ্গপনা-নক্সার মর্মকথা হচ্ছে  
 কৃতকর্মসুলে রেখা ও রঙ একই আছে যারে যারে ফিরে ফিরে আসবে। যাতে সবটা মিলিয়ে  
 একটি সুন্দর ছন্দে নক্সার রূপ নেয়। মূল্যবোধের চিত্রে যা জাকারির কাজে, রাজপুত চিত্রে  
 ও 'কাব্যশিল্পী'তে আমরা এ সভ্যকে যারে যারে উপলব্ধি করেছি। কিন্তু অজন্ম এ-বিষয়ে এক  
 অস্বস্তি কড়িম্ব। প্রত্যেকটি নক্সাই নৃতন ও মৌলিক। কেউ কারও নকল নয়। আগেরই  
 বলেছি, শিবতীর গৃহের দিল্লিতে একটি গোলকাকৃতি নক্সায় তেইশটি হাঁসের একটি অঙ্গপনা  
 আছে (২১৫)। সেখানে প্রত্যেকটি হাঁসের ভঙ্গি মৌলিক ও বিশিষ্ট। অঙ্গকরণ-শিল্পে এটা  
 নৃতন কথা। এর কারণ হিসাবে বলতে পারি, অজন্মের চিত্রকর হচ্ছেন স্নাতশিল্পী; প্রত্যেকটি  
 মুহূর্তেই তিনি নৃতন সৃষ্টির উন্মাদনায় আত্মহারা।

দ্বিতীয় কথা, শিল্পী এই সব নক্সা শা-কিছু এঁকেছেন, তার ভিতর তার প্রাথমিক  
 মনোরম পরিচয় পাঠ। বিশ্বকর্মেটির অসীম বৈচিত্র্যে তিনি রঙ ও রেখার ধরতে চেয়েছেন,  
 ছোট ছোট চৌমুখিতে, কিন্তু প্রতিটি বিষর-বন্দুই প্রতি পরিপূর্ণ প্রথা, মন আয় মনোবন্দ্য  
 কর্তব্য। ইউরোপীয় চিত্রকরের মত বাস্তবের হুবহু নকল করার দিকে তার কোঁচ চাই—  
 কিন্তু প্রত্যেকটি বিষর-বন্দুর প্রাথমিকভাবে তিনি সবচেয়ে বিকশিত করে তুলেছেন। 'স্বাচ্ছন্দ্য-  
 পাশী-পশু' বাস্তবানুগ হল কিনা এ নিয়ে তার মাথাব্যথা নেই—কিন্তু 'স্বাচ্ছন্দ্য' এই রূপ-  
 রস-শব্দ-সঙ্গীতের জগৎ-প্রসঙ্গে ভীষণ ও সুন্দরের বিচিত্র প্রকাশ, একথা শিল্পী কখনও  
 ভোলেছেননি। 'এককর্ণা' যেন 'বহুমা' হয়েছেন। পদ্মফুল, ফুল এঁকেছেন তখন তার বলতে  
 পেয়েছেন—এই বেশ আভিজ্ঞান, আমি সেই সুলভের দূত? 'স্বাভাবিক' পদ্মকে পৃথিবীতে যদি  
 কেউ হার মানিয়ে থাকে, তবে তা অজন্মের ছাঁচ। শিল্পী যেন সারা বিশ্বকে লিখিয়ে ধরতে  
 চান, মাগে ধরতে চান।

অজন্মের অসংখ্য প্রাচীরে, অদ্বৈত স্তম্ভে ও দিল্লিতে যে লক্ষাধিক নক্সা আছে, দু-মরটি  
 নক্সাচিত্র এতক তার পরিচয় দিতে যাক্সা হবে ধুঁকত। এ গ্রন্থে পরিচয়দেয় সমাপ্তমূলক ও  
 ইতিশতঃ বিকশিত বাস্তবীয় নক্সা বা অঙ্গপনা অজন্ম-পুঁজো থেকে অনুকৃত।



সময়ে মেনে চলতেন না। কোন কোন সময়ে তাঁরা উদ্দেশ্য-পরিপ্রেক্ষিকতের আশ্রয় নিতেন। অর্থাৎ, ধর্মের জিনিসই বড় করে আঁকা হত, কাছের জিনিস ছোট করে। এই প্রাচুর্য পরিপ্রেক্ষিকত অনুযায়ী জৌকি বা পালকবন্দর যে ধারটি আকাশের থেকে সবচেয়ে ধূরে সেটিই হাঁহিতে সবচেয়ে চওড়া দেখানো হত, যে ধারটি সবচেয়ে কাছে সেটিই হবে সবচেয়ে সরু। বলা বাহুল্য, এটি বাস্তবের উল্টো। ধরা যাক, চিত্র—৬—এ নর্তকী দলের পিছনে ব্যতীতি। জৌকা ছাদের যে পাঁচালটা আকাশের কাছে সেটিই মাগে ছোট, যে পাঁচালটা ধূরে সেটিই অকালের বড়। পারায়েতেই সমানতরাল রেখাটি লিখিমান কিন্তু দিক ধূরে গিরে মেশেন—নর্তকের দিকে বেন এসে মিশতে চায়। পরিপ্রেক্ষিকতের সংজ্ঞা অনুযায়ী একে দুটি ছাড়া আর কি বলা যাবে?

এই আশ্রয়-অঙ্গলভ্যতার সমাধানে হিসাবে আমরা তিনটি ধৃষ্টি রাখিল করতে পারি। এক, ধরে নিতে পারি অঙ্গলভ্য-শিল্পী পরিপ্রেক্ষিকতের আইন-কানুন জানতেন না। দুই, ধরে নেওয়া যায়, অঙ্গলভ্য-শিল্পী এটা জানতেন কিন্তু ধূর বেশী ধূর দিতেন না। তিন, শিল্পী সজ্ঞানে এই অশাস্ত-বিকৃতি ঘটিয়েছেন বিশেষ কোন কারণে।

প্রথম প্রস্তাবটিকে আমরা সূত্রটির পরিভাষ্য করতে পারি। চিত্রশিল্পের অন্যান্য বিষয়ে যারা অত্যন্ত পরামর্শা দেখিয়েছেন, পরিপ্রেক্ষিকত-সম্বন্ধে তাঁদের এই প্রাথমিক ধারণা ছিল না—এটা মেনে নেওয়া অসম্ভব। তাছাড়া, অসম্ভব ক্ষেত্রে তাঁরা পরিপ্রেক্ষিকতের বিজ্ঞান-সম্মত নির্ভুল প্রয়োগ করেছেন। না মেনে তাঁরা জে কেমন করে করবেন? দ্বিতীয় প্রস্তাবটিকে এই একই কারণে ব্যাখ্যা করতে হচ্ছে। চিত্রের স্বভাব-সম্বন্ধে যারা এত বেশী ব্যস্ত, বাঁসের হাতের কাছ একেবারে নিখুঁত, তাঁরা পরিপ্রেক্ষিকত বিষয়েই বা কেন অবধা এমন অসাক্ষানী করেন?

প্রশ্ন হতে পারে, তবে কেনেন্দুই বা তাঁরা এ ভুল করলেন কেন?

তার প্রতিপ্রশ্ন হিসাবে আমি জাব, কেনেন্দুই কি প্রচলিত রীতিকে ধূরে ধূরে শিল্পী লক্ষ্য করলেন? সত্যকে 'এ্যাবস্ট্রাক্ট একস্প্রেশনিসম্' অথবা গল সেজারের 'পোস্ট-ইম্প্রেশনিসম্' যদি আজ থেকে হাজার বছর পরে কোন চিত্র-সমালোচকের নজরে পড়ে, তবে সে-ও জো ফাবে পেলক ও সেজান পরিপ্রেক্ষিকত-সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন। শিল্পী বাঁসনী স্নায়কে হাজার বছর পরে কোন চিত্র-সমালোচক এো অনুভবের মিশরীর চিত্রকরের সমকালীন বলে মনে করতে পারেন, যেহেতু বাঁসনী স্নায়ের চিত্রে সামনে-ফেরা ধূরে পাশ-থেকে-সেবা চোখ আঁকতে দেখেছি। ষোড়শ শতাব্দীর চিত্রকর পার্মিনিয়ানিনো (Francesco Parmigianino) যে কী-ব্রায়া মজারবার চিত্রটি এঁকেছিলেন 'ম্যানারিসম্'-এর খাতিরে, সেটি দেখেও জো ফাবে বলতে পারি, চিত্রকর 'পার্মিনিয়ানিনো'র প্রাণ কত লম্বা হয়—এ সামান্য কথাটিও জানতেন না। ষড় শতাব্দীর 'ইম্প্রেশনিস্ট' এক বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে 'জাভাইস্ট' ও 'সার্মারিগালিস্ট' চিত্রকররা জানসারে প্রচলিত চিত্র-রীতিকে যে কত ভাবে পরিবর্তিত করেছেন, জো ফাবে চোখের উপরেই দেখেছি। আধুনিক চিত্র-রীতিতে জো পরিপ্রেক্ষিকত একেবারেই অপর্যবেক। তার মানে কি এঁরা কেউ পরিপ্রেক্ষিকতের প্রচলিত রীতি সম্বন্ধে অস্বীকৃত মনে একটা উপাহরণ দেখানো যাক।

মানে করা যাক, চিত্রকর দেখাতে চান একটি টেবুলের উপর একটি স্কেট রাখা আছে, যাহতে সুন্দর নকশা-কাঠি, আর দেখাতে চান যে, টেবুলের-সিটে রাখা আছে, একটি ফুলদানি। 'দৃষ্টিভঙ্গ' পরম্পরায়াক্রমের দিকে নিতে গেলে (চিত্র—১০৬) স্কেটের নকশাটা দেখানো যায়, কিন্তু ফুলদানিটা ঢাকা পড়ে যাবে। অপরদিকে, দৃষ্টিভঙ্গ নাথিয়ে এনে যদি 'শতদলবিন্দু'তে হাবিরা আঁকতে বাঁস, তখন ফুলদানিটা স্পষ্ট হয় বটে, স্কেটটা হারিয়ে যায় (চিত্র—১০৭)। এভাবে যদি স্কেটটা ছবির ভলের মাকামারি রাখি, তাহলে দেখেছি, ফুলদানি ও স্কেট দুটোই মোটামুটিভাবে দেখা যাবে; কিন্তু স্কেটের নকশাগুলি ভালভাবে খাঁকা যাবে না (চিত্র—১০৮)।



এবার যদি পরিপ্রেক্ষিতের প্রাচীর পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে কিসকল দ্বিতীয় প্রাচীরে স্থাপিত হইবে? তাহলে দেখি (চিত্র-১০৭) ফুলদানি এবং পোতের নকশাকে একই চিত্রে আঁকা সম্ভব হচ্ছে, যদি দু'টি আলাদা চিত্রের মত বাস্তবায়ন হইবে না।



চিত্র-১০৬ : পোত ও ফুলদানি—সামান্য দৃষ্টিকোণ। চিত্র-১০৭ : পোত ও ফুলদানি—পৃথক দৃষ্টিকোণ।



চিত্র-১০৮ : পোত ও ফুলদানি—সদৃশ দৃষ্টিকোণ। চিত্র-১০৭ : পোত ও ফুলদানি—প্রায় পরিপ্রেক্ষিতে।

প্রায় এই জাতীয় সমস্যারই সম্মুখীন হতে হয়েছিল অঙ্কনকার চিত্রকরকে যাবে যাবে। আমার কল্পিত দৃষ্টিকোণ, এমনই তিনি এসব স্থলে প্রাচীর-পরিপ্রেক্ষিতের নতুন ধারায় কোন কোন চিত্রে একেছেন। একটা উদাহরণ দেওয়া থাক।

অঙ্কন-চিত্রে পরিপ্রেক্ষিত-সম্মুখ অলোচনাকালে বিখ্যাত ফরাসী চিত্র-সমালোচক প্রিন্সতী জঁ ওবোআইরে\* যে উদাহরণটি নিয়ে আলোচনা করেছেন, আমরা সেটিকেই মান হিসাবে গ্রহণ করতে পারি। চিত্রটিতে পাশাপাশি তিনটি সভ্যত্ব-তত্ত্ব আছে। এটির অবস্থান ১৭ এবং ১২২। সর্বদিক্বে মহাজনকের (?) অভ্যন্তর-স্থানের দৃশ্য; মাকের মণ্ডপে সীকাইক (?) স্থান করানো হচ্ছে এবং সর্ববাহুর মণ্ডপে একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুকে করেচি স্থাপত্যিক আঁকা করা হয়েছে। শিবতীর ও কৃতী মণ্ডপের মাকবান, পথে করেচি ভিক্ষু (অভ্যন্তর-স্থান) স্থান গ্রহণ করেছে। অঙ্কন-শিল্পী বিদ্য-বন্দুটে বেলাবে একেছেন, তার চুম্বক চিত্র এখানে চিত্র-১০৮-এ দেওয়া গেল। সিঁড়ি-বৌদ্ধ-নির্মিত পাশ্চাত্য-পরিপ্রেক্ষিত ইহঁদের আঁকলে এবং সর্বদিক্বে মণ্ডপের সামনে থেকে আঁকলে মণ্ডপ তিনটিতে চিত্র-১০৯-এর মত দেখাবে।

নিম্নলিখিত চিত্র-১০৬ অনেক বেশী বাস্তবায়ন—কৃতপ্রায়িক! চিত্র-১০৬-এ দৃষ্টিকোণ বদলে গেছে, আর কিসকল ভিক্ষু তো যাবে যাবে স্থান বদলেছে। প্রিন্সতী ওবোআইরে কহছেন—“এই চিত্রটি ঘুরেছে জয় করল শিল্পী সত্যিকারের কোন বাড়ী দেখে আঁকেননি বা নকল করেননি। বাড়ীর স্থপতি মানচক্রে দেখে তার প্রতিটি দৃষ্টিকোণটি সম্পূর্ণভাবে উপস্থাপিত করবার চেষ্টা করেছেন মাত্র।”

\*“Composition & Perspective at Ajanta”; Art and Letters, India & Pakistan, Vol. 22, No. 1, London, 1948—by Jeanne Auboyer.

আমার মনে হয়েছে, কবিতা তা নয়। শিল্পী সত্যকে সম্বন্ধ-বিশিষ্ট বা মণ্ডপতয়ের কাগজ আঁকবার সখ্য। আমরা সমানতরাল রেখাগুলিকে কিলারমান কিন্দুর দিকে তেরহা করে আঁকেননি। কোন আঁকেননি, তা উপলব্ধি করা যায় চিত্রের মূল বিষয়-বস্তুকে কল্পা চিত্রতা করলে। শিল্পী তিনটি দৃশ্য একত্রে আঁকতে চেয়েছেন। ফলে, পারস্পরিক-বিভিন্ন ব্যাকরণ মনেতে গিয়ে তিন মণ্ডপ-আসানের বিশ্লেষণ কমাতে রাজী নন। এমন কি সর্বত্রই মণ্ডপের কাছে গিয়ে তিনে সঙ্কলণ কিলারমান কিন্দুজিকে উল্টো দিকে সরিয়ে নিয়েছেন। অর্থাৎ, চিত্রকর যেন স্থির নন, এক-একটি স্থান থেকে যেন এক-একটি মণ্ডপ তিনে এঁকেছেন। দর্শক যেন



‘এ ১০৪১ প্রাচীন পরিপ্রেক্ষিতের রচিত অঙ্গুর্যে পটিকা মণ্ডপতর, অঙ্গুর্য—১৯২ ও ১৯৩।

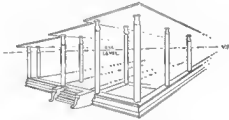
চিত্রের রাজ্যে প্রবেশ করে ঘুরে ঘুরে মণ্ডপগুলিকে দেখতে পাবেন। না হলে পরিস্পষ্ট-পটিকা ডিক্লেসের আঁকা বাবে কেমন করে? বোধ ডিক্লেসের চরম অর্থাসানকারী মহিলা-মণ্ডপের লগেই বা দর্শকের কেমন করে পরিচয় করিয়ে দেবেন চিত্রকর? অঙ্ককের চলচ্চিত্রের ভাষায় বলতে পারি, ঐ মণ্ডপতরের বিভিন্ন ঘটনা একই সিকোয়েন্সের অঙ্গুর্য, কিন্তু সেটিকে হুঁসারিত করতে অঙ্গুর্য-শিল্পের ক্যামেরাখ্যান তিন তিনবার তাঁর ক্যামেরার স্থান বদলেছেন, তিনটি বিভিন্ন স্টে নিয়ে।

ব্যাকরণ কি? প্রচলিত সাহিত্য-রীতির সংশ্লিষ্ট মূলসূত্র যে তো নয়? কিন্তু ব্যাকরণ সাহিত্যের অনুদ্য, তার পূর্ণাঙ্গ অনুসারী। প্রাচীন যখন সৃষ্টির অঙ্গুর্যে ব্যাকরণ-বহির্ভূত কোন শব্দ বা বাধ্য ঘটনা করেন, তখন বৈয়াকরণিক সবিনয়ে তা যেনে নিয়ে বলেন—এ হল ‘অব্য’ প্রয়োগ। অঙ্গুর্য-রীতিও প্রয়োগনের অঙ্গুর্যে বলতে পারে। আঁকতেই যখন ব্যাক্তীর পরিপ্রেক্ষিত আঁকেন, তখন তিনি কিলারমান কিন্দুর কিন্দুমাতে কীভাবে সখ্য করেন না। কিন্তু বাস্তবতার যখন তাঁর ব্যাক্তীর ‘এলিমেন্টেশন’ বা ‘সাইড-ভিউ’ আঁকেন, তখন কিলারমান কিন্দু কিলার হয়ে বার। চিত্রকর যদি তখন এসে বলেন—ওহে বাপু, বাস্তবকল্প, ইত্যাদি এ ছবি সিনেমা-স্টো-স্টো-স্টো সূত্র হিসাবে আশাযোগ্য ফলে তবুও কিলারমান হওয়ার আই-লেক্স? কিলারমান আশিষিত পয়েন্ট? বাস্তবতার তখন তার অর্থে বলবেন—মশাই, এ হল সাংস্কৃতিক জি, বিশেষ জাতের চিত্র। বাস্তব বলতে ত-ই একটি বিশেষ কাজ সম্পাদন করবার প্রয়োজনে আঁকা হয়েছে, তাই এর ব্যাকরণও পৃথক।

অজন্মতার শিল্পীও ঠিক ঐ কথাই বলবেন। এখানে কোন ‘বিস্ত্র’ বা anomaly নেই। এ-চিত্রটিও একটি কিলারমান প্রয়োজনে আঁকা হয়েছে। তাঁর চিত্র এখানে তিনটি ঘটনাকে একই চিত্রের পরিসরে দেখাতে চায়। তাঁর ও ভাববসের কাবেরনই এখানে মশা, চিত্রের ব্যাকরণ-সূত্র গোপ। শিল্পের প্রয়োজনে তাই শিল্পী নতুন ব্যাকরণ-সূত্র নির্দেশ করতে চান। সে সূত্র এই : মণ্ডপ তিনটির সাবনের বিক বা আসান আঁকবার সময় নিছক ‘এলিমেন্টেশন’ আঁকা হবে,

তখন বিলাসমান বিন্দু অগাধের এক পাশ আঁকবার সময় বিবর-বস্তুর প্রয়োজনে বিলাসমান বিন্দু ইচ্ছানুসারে সরানো যাবে।

এই নতুন নতুন প্রয়োগ করা হয়েছে বলেই একই চিত্রে তিনটি মণ্ডপে তিনটি দৃশ্য এবং গলিগথে আরও একটি দৃশ্য আঁকা সম্ভবপর হয়েছে। লিওনার্দো-দে-সিঞ্চি পঞ্চাশ চিত্র-১০৬-এর সংকীর্ণত পরিবর্তে এই বিবর-বস্তুগুলি একত্রে আঁকা অসম্ভব।



চিত্র-১০৬ ও পরবর্তী রীতিতে আঁকা মণ্ডপসমূহ।

প্রাচ্য-পারস্যের কীটবিদ রীতিতে কর্ণকোণ বা ভাস্কর্যমণ্ডল-গুলি দৃশ্যবস্তু থেকে বেরিয়ে আসার চোখে এসে মেশে। কর্ণকোণের যে প্রান্তটা অসমতল কছে আছে, সেটাকেই আমরা ছোট্ট সোঁচ, ছোট্ট প্রান্তটা বড় সোঁচ। এ-জাতীর পরিকল্পনা অঙ্গনতীর অনেক স্থানে দেখা যায়। কিন্তু আমার মনে হয়েছে, শিল্পী অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিল্পের প্রয়োজনেই এ রীতি অনুসরণ করেছেন—নিছক রীতি মেনে চলার জন্য নয়। যেমন ধরা যাক, বিবর পশ্চিম লাভকে দেখানো পক্ষে এ উপপ্রস্থারাজ পাশা খোলাছেন, সেখানে পাশার সেকটরিক প্রাচ্য রীতিতে আঁকা হয়েছে (চিত্র-২০)। তার জন্য পাশার ছকটিকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, যেন শিল্পী উপর থেকে পাশার ছকের স্থানল এঁকেছেন, অথবা অন্য দিক, পাশার ছকটা যেন টেবিল থেকে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে। এটি কেন করেছেন শিল্পী? করেছেন এমনকি যে, ঐ পাশার ছকটিই এই ক্ষণস্থায়ী সবচেয়ে জরুরী জিনিস, তাই কাহিনী-চিত্রের প্রয়োজনের দিক থেকে পাশার ছকটিকে প্রাধান্য দিতে হয়েছে। এ দৃশ্যে কাহিনীটি তখন ঐ পাশার ছকের পক্ষে থাকে কিয়দংশ। পাশাভা-পরিপ্রেক্ষিতের আইন অনুসারে আঁকতে গিয়ে ঐ অকল্পিত ছককে শিল্পী ছোট করে দেখাতে রাজী নন। তাই এ প্রাচ্য রীতির অনুসরণ।

আরও ভাল একটি উদাহরণের উল্লেখ করা যায়। বাস্তবে চিত্রটি একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। তাই এর রসোপলব্ধি করতে হলে গ্রিক্স সাহেবের দৃষ্টান্ত মূল গ্রন্থটি অধ্যয়নকৈ দেখতে হবে (চিত্র-৪০)।

চিত্রের বিবর-বস্তু—যশোদা ও রাহুলকে শয্যার কোণে বসিয়ে সহযোগ করছেন। সেখানে শিল্পী দেখাতে চান পালঙ্কের উপর যশোদা বসে আছে এবং দেখাতে চান পালঙ্কের নিচে কিছু তৈরসপত্র। পাশাভা রীতিতে আই-পেডেল উঠতে গলে, গরুড়াকোণক করে শিল্পী দেখেছেন নিম্নাঙ্গা গোপাকে আঁকতে অপূর্ণিমা হচ্ছে না, কিন্তু ঢাকা পড়ে যাচ্ছে পালঙ্কের নিচে তৈরসপত্র। কিন্তু শিল্পী ভুলে রাজী নন; কারণ, ঐ তৈরসপত্রের মধ্যে দুটি জিনিস যে ভীষণ আকর্ষণীয় হবে। একটি ছিন্নতার ব্যস্তমত এবং একটি নির্বাণিত-বীণ দীপ্যকার! এ দুটি তো সামান্য তৈরসপত্র নয়, এ যে তাঁর চিত্রের আর্শাত্মক অঙ্গ। ঐ নির্বাণিত-বীণা দীপ্যকারটি যে এ চিত্রের অন্তর্গত কোনোর ছুঁত প্রতীক! ঐ ছিন্নতার বীণটি যে সূত্রবদ্ধ-তনয়া যশোদার প্রয়োজন বর্ধকালী দাম্পত্য জীবনের অকালনের সেরতক। ও দুটি চাই।

শিল্পী পাশ্চাত্য রীতিতে আই-লেভেল সারিয়ে এনে দেখেছেন—ও দুটিকে আঁকা বাঁচছে বটে, কিন্তু নিয়তিভিত্তিক মন্দভাবিনী যশোধরার দেহটি ছোট হয়ে যায়, সমুচিত হয়ে যায়। শিল্পী এ-দুটি বিষয়-বস্তুর কোনটিকেই খাটো করতে রাজী নন; ফলে, তাগে করলেন ঐ নিষ্ঠুর পশু পাশ্চাত্য-প্যারস্পেক্টিভের বিরুদ্ধে-স্বরকে। প্রাচ্য রীতিতে ছবিটি আঁকলেন তিনি। বিলীতমান বিলু দুটিকে সারিয়ে আনলেন দুই দিমন্ত রেখা থেকে সম্মুখের দিকে, বর্শকের দিকে। এইবারে শালকের উপরে নিচিত্রিত যশোদরা এবং নিচে নির্বাণিত-শিখা দীপায়ার ও মিস্ত্রীর সীমাকে একই দৃশ্যক্ষেত্রে আঁকা গেল।

শব্দের নিম্নবাস পড়ল যেন শিল্পীর এতদ্বশে।

এ পরিচ্ছেদের শেষ পর্বায়ে আর একটি কথা বলব। শিল্পীর সবলেই বৌদ্ধ; কিন্তু মনে হয়, হিন্দু-শাস্ত্রকারদের মূল নির্দেশ তাঁরও মেনে চলতেন। সে শাস্ত্র বলে, শিল্পানি সংস্কার দেব-শিল্পানি। সমস্ত শিল্পই দেব-শিল্পের অনুপ্রেরণায়, সর্ব-শিল্পের মূলে দেব-শিল্প। এইরকম স্বাক্ষর বলাহেন, ‘আত্মসংস্কৃতিবাবি শিল্পানি হৃদয়োমায় বা এতৈবজমান আত্মনঃ সন্তোষমুতে।’ অর্থাৎ, এই দেব-শিল্পের স্মরণে যে লাভ হয় তা আত্মসংস্কৃতি। এই শিল্প-সাধনাই এক স্বর্গ। সেই স্বর্গের মাধ্যমে স্বর্গমান আপনায় আত্মাকে কিংহ্রেনে হৃদয়োমায় করে তোলে।

অজন্মতার শিল্পী সেই মহান শিল্পস্বর্গের স্বয়ং, তিনিই তার স্বর্গ। রঙ আর তুলি সে স্বর্গের সন্নিধি আর হোমশ্রুতি। শিল্পের পথে তিনি মূর্তির সন্ধান করেছেন—তিনি মৃত হয়েছেন; তাঁর পরমপ্রাপ্তি ঘটেছে।

স্বা মূর্তি—স্বাতিমূর্তিঃ।

এশীয়-শিল্পের পরিপ্রেক্ষিতে অঙ্গনতা

কোন একটি মহৎ শিল্পকর্মের প্রকৃত মূল্যায়ন করতে হলে স্থান-কাল-পারিপার্শ্বিকের নির্দিষ্ট জাকে ঝুঁকানো করতে হবে। অঙ্গনতা-চিত্রের বিশ্লেষণ আমরা করছি, এখন দেখব সমগ্র এশীয় শিল্পক্ষেত্রের ভাষা স্থান কোথায়। অঙ্গনতা কী-ভাবে, কতখানি তার পারিপার্শ্বিকে প্রভাবিত করেছে, সে নিজেই বা কতটা প্রভাবিত হয়েছে। বস্তুতঃ ভারত-শিল্প অঙ্গনতার স্থান অতি উচ্চ, এবং যে-যেহু এশীয়-শিল্প ভারত-শিল্পক্ষেত্রের দ্বারা প্রভূতভাবে প্রভাবিত তাই সমগ্র এশিয়ার শিল্পবিশ্বকোষে অঙ্গনতার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। এজন্যই বিশ্ব-শিল্পে অঙ্গনতা এক বিশেষ।

পূরাকালের জ্যোতির্বিজ্ঞানী যুক্তি পেরেছিলেন—নৈম-আকাশের জ্যোতির্বিদ্যুৎগুলি সব এক জাতের নয়। তাদের মধ্যে কয়েকটির নজরচারণকালে বৈশিষ্ট্য আছে—তারা নক্ষত্র নয়, গ্রহ। গ্রীক জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বিশ্বাসে এসে—মহাকাশের কেন্দ্রবিন্দুতে পৃথিবী আছে স্থির, আর গ্রহ-নক্ষত্র-সূর্য-চন্দ্র সেই কেন্দ্রস্থ পৃথিবীকে চক্রাকর্ষন করছে। উনিবিংশ-শতকের ভারতীয় সংস্কৃতিবিদগণও অনুগ্রহভাবে এক সময় ভেবেছিলেন—সমগ্র এশিয়ার শিল্পচিত্রের ভারতবর্ষকে কেন্দ্র করে প্রসারিত। পরবর্তী যুগের শিল্প-বিদগণেরা তখনই প্রতিবাদ করলেন, গ্রীক সে-ভাবে পৃথিবী-যুগের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ভুলেছিলেন যে, পৃথিবী মহাকাশের কেন্দ্রবিন্দু নয়, সেও সূর্য প্রসারিত প্রহমাত—এশীয় শিল্প-সংস্কৃতির সৌরমণ্ডলে ভারত-বর্ষও একটি গ্রহ। আফগানিস্থান, তিব্বত, নেপাল, মধ্য-এশিয়া, সিংহল, কম্বোডা, চীন, জাপান এবং যাবতীয় ভারতবর্ষকে প্রদক্ষিণ করছে না আসে, ভারত-সময়ে সকলেই সূর্যপ্রতিম এক কেন্দ্রবিন্দুকে প্রদক্ষিণ করছে। তারা তাদের চক্রাকর্ষন-পথে কখনও পরস্পরের কাছাকাছি এসেছে, কখনও বা দূরে সরে গেছে—কিন্তু এক অঙ্গনতা অঙ্গনত অভিকর্ষের বশে তারা কেউ সেই অঙ্গনত সূর্যের প্রভাবের বাইরে ছুটে বেড়িয়ে যেতে পারেনি, তাদের যত্নবশতের কোন ভাঙন ঘরেনি। কী সেই কেন্দ্রস্থ সূর্য? কী সেই মহাকাশতিক অভিকর্ষের বশন, যা তাদের কেন্দ্রাতিগ বেলকে প্রতিহত করেছিল? সেই তত্ত্বটাই বর্তমান পরিচ্ছেদে খুঁজে দেখব আমরা।

ভারতবর্ষ, ডক্টর কুমারস্বামী বলছিলেন, “খ্রীষ্টজন্মের শত শত, বোধ করি, সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব থেকেই ভারতবর্ষ ছিল আভ্যুদয়সময়-পর্বের-উপভোগ প্রাচীন-প্রাচীর এক পূর্ব-পূর্ব অঙ্গীকার।” বস্তুতঃ সেই প্রাচীন-প্রাচী-শিল্পশিল্পের নির্দিষ্ট সর্বত্র অঙ্গনতা-শিল্প নয়, ভারত-শিল্পক্ষেত্রই বিচার করতে হবে—যে শিল্পক্ষেত্রের ভৌগোলিক বিস্তার সহস্র-কুইন্টাইল, আর কালের বিস্তার করেক সহস্রাব্দী। এই ক্ষুদ্র পরিচ্ছেদের সীমিত পরিধির আমরা সেই অতিকাল্পক মহান শিল্পমন্ডলের একটা অঙ্গনতা মাত্র দিতে পারি।

স্বাধীনতার ক্ষেত্রে যদিও হর্যাপ্পা-মহেন-জো-দারোর কাজ-কর্মের পথিণির সঙ্গে হিন্দু-ভারতের প্রাচীনতম প্রস্তর-কলিতের কোন সম্পর্ক আমরা খুঁজে পাই না, তবু প্রথম পর্যায়ের ঐতিহাসিক হিন্দু-ভারতের আন্দোলনের সঙ্গে হিন্দু-ভারতের শিল্প-সম্পদের একটা তীব্র যোগসূত্র নজরে পড়ে। আদিক এক শিল্প-ভাবনায়। উদাহরণ স্বরূপ চিত্র—১১৬-এতে প্রদর্শিত মহেন-জো-দারোর রোজ-নির্মিত নারিকার সঙ্গে চিত্র—১১৭-এ মহেন-জো-দারোর তুলনা করে দেখতে পারি। একটি রোজদ, একটি পাখির; একটি কী-বাগানী হিন্দুরী, একটি পূর্ব-বৌদ্ধা কুমারী। প্রায়শঃই লঘু, নিম্ন, শীর্ণ বাহুস্বয়, এক অপরূপত শতনন্দন বিকট-বৌদ্ধ শিবতীরের বৌদ্ধভাবনায় দেখা-কৃতের সঙ্গে এক সুরে বাঁধা নয়—তবু মনে

হয় কোথায় যেন কী-একটা ছিল আছে! মনে হয় না—এই দুটি শিল্প-সামগ্রীর মধ্যে দুই-তিন সহস্রাব্দীর ব্যবধান! মিলটা যে ঠিক কোথায় তা আশাতরুণিটে এখনই ধরতে পারছি না, কিন্তু ওর পাশাপাশি কোন বিশরীর, ব্যাব্রিসোনীর, চীনা বা গ্রীক ভাস্কর্যের নারীমূর্তি এখনো ফলতে পেরে সেগুনি ভিন্ জায়ের! কেন, জা জানি না!

অনেকে লঘু-হস্তব্য প্রকাশ করে বলেন, পশ্চিমযাণ্ডে শিল্পক্ষেত্রে অনেক বেশী ব্যস্তবান্ধব, ভাগ্যতিক এবং প্রকৃতি-অনুসারী, তুলনায় নাকি ভারতীয় শিল্পমানে অক্লান্ত, ধর্মীয় এবং অপর্যব। কবীরা অধিসত্য, কবং কলা যায়—কেতাবিসেব মাস্তবেব বিপরীত। উদাহরণ স্বরূপ মধ্যযুগের ধর্মিক-স্বপ্নভোর গীর্জার, সুউচ্চ মোটাকৃতি মিনারে এবং সুচলো খিলানের পাশে মূর্তিগুটির কথা চিন্তা করুন। খ্রীষ্টান শিল্পদিল—তাদের অধিকাংশই মাজক-সম্প্রদারভূত—সারা যুরোপের গীর্জার যে বীশু, সন্ত ও যেরব্‌তনের মূর্তিগুনি গড়েছেন তারা পার্যব নয় অগো। তারা সবাই অলভাবিকভাবে দীর্ঘাকার, তারা হাসে না—তারা যেন রক্ত-ম্রাণের জীবের অনুকৃতি নয়; তারা স্ববীর, অপার্যব, বর্শকের মনে প্রম্বা ও ভীতি সঞ্চারে জানই তাদের আবির্ভাব। তুলনায় সমসাময়িক ও পূর্বযুগের ভারতীয় শিল্পী শিল্পশাস্ত্রের বীমা-ফর্মুলার ভিতরেই যে-সব দেবমূর্তি, বাক-কিরন-নাথ-গম্বর্ষ মূর্তি গড়েছেন তারা জবরজো পার্যব;—তাদের দেখলে মনে হয়, এই মূর্তিয়ার আলম-বেদনা হালি-অরু দিয়েই তাদের গড়। গবেষণামনীর জোড়ের শিশুমূর্তি যে অক্লান্ত, অপার্যব, একথা মনে থাকে না; মাতৃস্নেহের ভাববাজনাই সেখানে বড় হয়ে ওঠে।

শিশু-সভাতার পটন ও মৌর্ষের উমানের অন্তর্ভর্তী করে সহস্রাব্দীর ভিতর জায়ত-বর্ষের শিল্পচেতনা কী-ভাবে সঞ্চিত হয়েছিল তার কোন প্রমাণ নেই। সমস্ত অপোকে



চিত্র—১১০৪ খোঁদা শিল্পক্ষেত্রে নিকট ইন্দো-ইউরোপীয়  
[ঐতিহাসিক ভারতের প্রথম শিল্পশিল্পী]।

নির্মিত মস্তস্তম্ভগুলিই বস্তুত হিন্দু-ভারতের প্রথম যুগের শিল্প-নিদর্শন। সারনাথে প্রাপ্ত ত্রি-সিংহ-শীর্ষ শস্তম্ভটিই সমীক্ষণ পরিত্যক্ত। কারণ এই শস্তম্ভের শীর্ষদেশ থেকেই ভারত-সরকারের প্রতীক-চিহ্নটি সংগৃহীত। যোদ্ধার হিন্দু-ভারতের প্রচীনতম ভাস্কর্য-নির্দর্শনটি আছে ভুবনেশ্বরের অনতিদূরে খোঁদা শিল্পক্ষেত্রে ঠিক উপরেই। স্থানীয় এক সরল প্রস্তরখণ্ডে মূর্তিটি উৎকীর্ণ—দ-ভারমান হস্তীর সম্মুখভাগ। তথ্যগত ব্যুৎপন্ন, প্রতীক

(সিঃ-১১০)। সম্রাট অশোক সিংহাসনে আরোহণ করেই কলিঙ্গযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়েন, সেই যুদ্ধক্ষেত্রে ঐ শিলালেখ ও হস্তিযুদ্ধের নির্মাণ। সুতরাং ঐ হস্তিযুদ্ধের অশোকসম্রাট-পুত্রের অশেফা ব্যাখ্যেপঠ। এই হস্তিযুদ্ধের এক বিশিষ্টতার রাজপ্রাসাদের উৎকীর্ণ নকশায় (মধ্যের কর্ণের সমগ্রাংশের) রচিত একটি পাথরফলকে বিশিষ্টতার প্রাসাদের 'মাসাদ' খোঁদিত দেখাচ্ছিল—সেই পাথরফলক খাটের দশকে গিল্পীতে স্থানান্তরিত হয়েছে বলে শূন্যের। জলকূলের যে নমুন দেখা, জলে মনে হয় প্রাক-মৌর্যযুগেও এ গিল্পী উন্নতমানেরই ছিল। যুদ্ধের সময়সরে, অলেককা-ভয়ের সমকালে জীয়া কী গড়েছিলেন জানি না, কিন্তু মৌর্য ও শূন্য যুগে ঐ শিল্পীগণ যে রাজ্যসংগ্রহ লাভ করেছিলেন তার প্রমাণ আছে। বহিঃজগতের প্রত্যয় সত্ত্বেও এই ভারতীয় ভাস্কর্যের গুরুত্ব-বিচার্য্য বংশ পরম্পরায় শিল্পকর্মে স্থানীয় বৈশিষ্ট্য বহুরূপে প্রকাশিত হয়েছে।

মৌর্য ও শূন্যযুগের সেই শিল্পীদের প্রত্যয় উত্তরে পঞ্জাব, পূর্বে মধ্য এবং বাক্ষিবে সাতবাহন রাজ্য পর্যন্ত রূপে বিস্তৃত হল। এই শিল্পসম্প্রদায়ের প্রথম অভিব্যক্তি দেখতে পাই মধ্যভারতের এক গ্রিকোথাকৃতী চূর্ণযুগ। ভারত-যুদ্ধের ও সচিহ্নে। যেন ঐ গ্রিকোথাকৃতী চূর্ণযুগ থেকেই রূপে তা ছড়িয়ে পড়ে পশ্চিমে ও বাক্ষিবে—ভাঙ্গা, কার্ণে, কনডেন, কলেশ্বরী, নাসিক, অমরাবতী ও অঙ্গভাঙ্গ। কয়েক শতাব্দীর ভিতরেই সেই ধারা শৌর্যে গেল উত্তরে গান্ধার, কাশ্মীর, মধ্যের এবং এলিকে উত্তিমার উপর্যুপ-বর্তমানিত। মূল উৎসের ঐ যে গ্রিকোথাকৃতী চূর্ণযুগ—ভারত, যুদ্ধের ও সচিহ্ন, এদের পরম্পরের হ্রস্ব স্ফেদ-বৃদ্ধি মাইলের বেশী নয়। বোধহয় ঐ শিল্পসম্প্রদায়ের আর্থিক সহযোগিতা এসেছিল পরলৌক্য ও বিদ্যা থেকে। এই সময়ের মধ্যে সর্বপ্রাচীন হচ্ছে ভারত, সর্বশেষ সচিহ্ন—যুদ্ধের এই দুইয়ের মাঝামাঝি বলে অনুমিত হয়।

ভারত-প্রাপ্ত রেলিং-এর কয়েকটি নমুনা কলকাতার বায়ুসের চুক্তিতেই জানাযাও করে দেখতে পাবেন। হস্তিযুদ্ধের পাথরে 'অ-উৎকীর্ণ', যুদ্ধ ইংরেজিতে বলে 'অলটো-রিলিজ'।

এখানে যুদ্ধের নাই—সবই হানিমান যুগের। রেলিং-এর গঠন-কৌশল একটা বিবিস্য নিয়ম মেনে চলে। নকশা ও হস্তিযুদ্ধের দেখলে মনে হয় ভাস্কর-দল পূর্বযুগের একক শিল্পীর স্বরা প্রভাবিত; এবং সেই পূর্বযুগের ছিলেন সত্ত্বের অথবা গজবতীশিল্পী। ভারত-শিল্পী যেন পুরোপুরি ভাস্কর নয়, তিনি মূলতঃ চিত্রকর। তাই হস্তিযুদ্ধের চিত্র-মাতিক নয়, পটে-জাঁকা ছবির মত পাশাপাশি মাঝামাঝি। জাতক-কাহিনীকে প্রস্তর খোঁদাই করার প্রয়াস এখানেই প্রথম দেখতে পাচ্ছি।

যুদ্ধ-প্রায় নিবন্ধন জাতি অঙ্গ। প্রথম যুগে যুদ্ধের মেরুমতি করতে যিরে তার বহু নিবন্ধন নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। তবু ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্রাটশাসন যুদ্ধ-কিছু, কিছু নমুনা আরও দেখতে পাবেন। তা দেখে বোঝা যায় যুদ্ধের ভারত-শিল্পের মধ্যে একটি সৌখ্যবোধ ঢাকা করে চলেছে।

সচিহ্নে মূল আকর্ষণ হচ্ছে একটি যুদ্ধের মনস্তাত্ত্বিক যিরে একটি রেলিং-এ তার চারটি ভোরণ। এ-জাড়াও সেখানে আরও কয়েকটি যুদ্ধ, মন্দিরের ধলোকাপ-প্রভৃতি অবিস্কৃত হয়েছে।

সচিহ্ন শিল্পীদলকে মোটামুটি দুটি বসে বিভক্ত করে দেয়। প্রথম দলের সচিহ্ন আদিত্য, আল। তার পূর্ণশোভক রিলিং-সচিহ্ন প্রস্তুতকরণী। আলের নাম বাক্ষিবে-ভোরণে এখনও দেখতে পাওয়া যায়। আনন্দে 'জায়া' বীরা হস্তি যুদ্ধের তাদের হস্তিযুদ্ধের সনাত করা শত্রু নয়। হস্তিযুদ্ধের অশোককৃত শীর্ষক, দীর্ঘাকৃতি ও লম্বাকৃতি। দ্বিতীয় শিল্পীদল সম্ভবতঃ ছিলেন বিদিশার (সচিহ্নের তদন্তদ্বারা এক বাক্ষি শিল্পসম্প্রদায়) হস্তিযুদ্ধ-শিল্পীদের স্বরা প্রভাবিত। তাদের তৈরী হস্তিযুদ্ধ অশোককৃত ভাবী, হস্তাকৃতি ও স্ফলক। প্রথমোক্ত শিল্পীদল পাথরে অনেকটা গভীরে খনন করেছেন, দ্বিতীয়োক্তা করেননি। কাজটা সহজই অনুমের। দ্বিতীয়োক্ত দলের উপর গজবত





শিল্পীদের প্রভাব ছিল। গদ্যদন্ত অত্যন্ত দার্দ্র্য, তাই শিল্পীরা গভীরে খনন করে গদ্যদন্ত নষ্ট করতে স্বভাবতই পরাধ্যক্ষ। সে যাই হোক, দুই শিল্পী মিলে দু-দিন-চারশ বছর ধরে সার্টির জেরখণ্ডগুলি গড়ে তোলেন।

ভারহুত-সর্টির বৌদ্ধ-শিল্পীদের সঙ্গে কোন যোগাযোগ ছিল কিনা জানি না, কিন্তু প্রায় একই সময়ে দেখছি ভুবনেশ্বরের উদয়গিরি-ধ্বজগিরিতে একদল জৈন শিল্পী কৃত্তিম পার্বত্য-গুহায় একই পদ্ধতিতে কাহিনীচিত্র খোদাই করছেন, স্তম্ভে অলঙ্করণ করছেন। ভৌগোলিক দৃষ্টে বসেই, ধর্মও পৃথক, তবু উভয়টির একান্তবাসী এই জৈন-শিল্পীদের উপর ভারহুত-সর্টি-অঙ্গনতার প্রভাব যে পড়েছিল একথা অস্বীকার করা যায় না। খ্রিঃ—১১৯-এ আমরা ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংগৃহীত কয়েকটি শিল্প-নিদর্শন একত্র করেছি। উপরের প্রথম সারিতে সার্টির ভাস্কর (দক্ষিণ তেরখ) এবং তার নিচের সারিতে অঙ্গনতার চিত্রশিল্পী যত্নদত্ত-রাজকের একই দৃশ্য ফেঁদাবে রূপায়িত করেছেন, তাতে বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে পড়ে যে, তাঁরা পরস্পরের প্রভাবাধীন। পরের সারিতে বামে অঙ্গনতার চিত্রকর (১০ গুহা) এবং দক্ষিণে উদয়গিরির ভাস্কর (গণেশ গুহা) একই কালে এতদেহে রাজ্য কর্তৃক রানীকে শাশ্বত দোবার দৃশ্য—তাদের ভৌগোলিক দূরত্ব হিন্দু প্রাচ্য হাজার কিঃ মিঃ। কৃত্তির সার্টির যত্নদত্তের প্রেরণ (বামে ভারহুত, মাঝে উদয়গিরি, দক্ষিণে সার্টি, পোখকে, অলঙ্কারে, শিরগড়গে প্রম হং দ্বিত্য একই শিল্পীর হাতের কাজ।

উদয়গিরি থেকে এগর অমাবসের সেড়-হালার মাইল উত্তর-পশ্চিমে যেতে হবে পরবর্তী শিল্পকর্মের সম্মানে—বুদ্ধদেবী-বিবোধি ‘গাম্ধার’ রাজ্যে, যে রাজ্য থেকে এসেছিলেন যত্নদত্ত-মহির্দীপানগরী সেই আধুনিক কালাহারে। তক্ষশিলাকে কেন্দ্র করে প্রথম খ্রীষ্টাব্দ থেকে এখানে একটি শিল্পচর্চা শুরুর হয়, যার উপর মহাজারতের ভারহুত-বুদ্ধগয়া-সর্টি এবং বহিঃভারতের গ্রীক-ক্লেমক-পারসিক প্রভাব পড়া সত্ত্বেও সে নিম্ন মৌলিক অঙ্কন রেখেছিল। এই দিগ্-গাম্ধার শিল্পে আমরা দেখতে পাই ভারতীয় মূর্তির আশে গ্রীক শোভক ও অলঙ্কার, এখানে বৌদ্ধিসত্ত্বের গুচ্ছরাজি আমাদের বিশ্ময়ের উদ্রেক করে, বৌদ্ধ অর্ধ-চেনের স্তম্ভে মৌখি রোমক-সেনাপতিদের অনুকরণে প্রস্থাবিশ্ব উত্তরীর। হীনবাসী শিল্পীরা বুদ্ধ-মূর্তি গড়তেন না—বৌদ্ধিদুম, ধর্মচক্র, পদচিত্র বা পদ্মবল্লর প্রতীকটিতে বুদ্ধদেবকে বোঝাতেন ; গাম্ধার-শিল্পীরা গ্রীক-রোমক প্রভাবে বুদ্ধদেবকে কল্পনা করতেন একজন সুগঠিত-ভদ্র তরুণের রূপে। তাঁর দীর্ঘ ঠলম্বিত কর্ণবুদ্বল, কুণ্ডলায়িত কুন্তলচূর্ণ, দীর্ঘনাশা, দৃঢ়-নিবন্ধ ওষ্ঠ এবং করুণাধন মূর্তি আঘাত নরন হরতো গাম্ধার শিল্পীদেরই পরিকল্পনা। অলঙ্কার-একিছরে মস্তক জাছে—কেউ কেউ বলেন, বুদ্ধমূর্তির প্রথম পরিকল্পনা করেন মহারাজ শিল্পীরা। এ-প্রকারে স্বাভাবিক ইতিহাস জানে না। শরৎকালের অনবদ্য ছোট-বল্ল ভদ্রন-মূর্তিতে হরতো লবণ খুঁজে পাবেন। সে যাই হোক, গাম্ধার-শিল্পের পূর্বপোষকদের মধ্যে সর্বপ্রথম বলতে হয় কুণাভরাজ বর্নিকের নাম। বহিঃভারত এই চৌনিক সম্রাট গাম্ধার ওয়া মহারাজ-শিল্পকে অর্ধাঙ্গকুলে সাহায্য করেন।

মহা-শিল্পীদের প্রসঙ্গে সবচেয়ে বিশেষত্বের সংবাদ—ভৌগোলিক নিরবচ্ছিন্ন সাধনা। দীর্ঘ ছয়-সাতশ বছর ধরে চম্ভাগত বহিঃভারতমণে মহারাজাধী-কল্পিত হয়ে গেছে, গ্রীক-শক-পল্ল-হক-কুশান আর হুণদের অষ্টমণে মহারাজ রাজপথ রটে ভেসে গেছে, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক পরিবর্তনের যুগান্তর এসেছে করে করে—অবচ মনে হয় মহারাজ শিল্পীর দল সেন-সব ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন ; প্রতিভাযে থেকে প্রণোদিত গৃহভান্ডারে নিরন্তর ছেনি-হাড়ুড়ি চালিয়ে গেছেন ; এত কড়-বন্ধন-কল্পপ্রাণেও তাঁদের সামান্যকি শিল্পের সেই পত্তনাদীপ এই ছয়-সাতশ বছর ধরে অনিবার্য-শিখর জেতলে রেখেছিলেন। মহারাজ-শিল্পের নিঃসৃত্যে নিঃসৃত্যে মঞ্চ করে আছে বৌদ্ধাশিল্প—নানান ভাগিতে বুদ্ধদেব, বৌদ্ধিসত্ত্ব, মহাবান দেব-দেবী—হারতী-মণ্ডল-মঞ্জু-প্রজ্ঞাপারমিতা ; কিন্তু হিন্দু দেবদেবীদেরও তাঁরা উপেক্ষা

অনেনানি—বিকৃতি, স্বর্ন, গগন, হরপার্বতী, লক্ষ্মী-স্বর্গরূপ সবই আছেন। প্রথমদিকে মধ্য-শিল্পী নেন ভারত-সচী-স্টাইলের অনুবর্তী। প্রথম তাঁরা তাঁদের বৈশিষ্ট্যকে খুঁজে পানেন। মধ্য-শিল্পের যে প্রথম শিল্পনির্দেশটি খুঁজে পাওয়া গেছে তা মধ্য-মধ্য শিল্পের রীতি। মূর্তিটির মস্তক ও হস্তমস্তক অস্বাভাবিক, উচ্চ নীচসেই পরস্পর ব্যতিরিক্ত ও ভাবমূর্তিতেও পরিণত। তাঁর কব্জি-এর অপর একটি মূর্তি অবশ্য একতর অলম্বার পাওয়া গেছে। সেই মূর্তির মধ্যকারে সশ্য সচী উত্তর-ভাগের (প্রথম শ্রীশ্রী) শ্যাবশালের মূর্তির নির্মাণ-কৌশল ভুলবীর। মধ্য এই একটি মূর্তিতেই মন, অলম্ব মূর্তিতে লক্ষ্য করি—প্রথমদিকে তাদের শিল্পপ্রাণ, অলম্বার, কোমর-বন্ধ ইত্যাদি ছিল ভারত-সচী-অলম্বার সম্বন্ধী—সেমন দেখছি চিত্র—১১১-এ ; কিন্তু প্রথম কব্জি-শিল্প যেন নিজ বৈশিষ্ট্য খুঁজে পেল। তাই পরবর্তী-মূর্তির মূর্তিগুণিতে মধ্যের ছাপ পড়ল।

এ-কথা মনে করা ভাল যে, খাইবার-পাস্ অথবা বোয়ান-পাস্ খিমে মধ্যমাত্র নিম্নলিখী বিহার-বাঁহিনীই ভারতবর্ষে লুপ্তপাট করত এসেছিল—কতকটা এই পথেই ভারতের মধ্য মধ্য-এশিয়ার যোগাযোগ করতছিল। সেই পার্বত্য পথ ধরে মধ্য-মধ্যমাত্রের ধরে এসেছেন এবং গিয়েছেন অলম্বার, বার্বিক, ভাঁকামাই, পশ্চিম। তাঁরা নিয়ে গিয়েছেন ভারতীয় কর্ম, শিল্প, চিত্রশাস্ত্র ; নিয়ে এসেছেন ভিন্বেশী সম্পদ—নিয়ে আর নিয়ে মনে দীক্ষিত সেই পার্বত্যপথে, ইতিহাস যাকে বলেছে 'রেশম-সড়ক'। এ রেশম-সড়কের ধারে গড়ে-ওয়া কয়েকটি জনপদের শিল্পবিচার করব এবার।

আফগানিস্থানে ফেরাবন্দীর উত্তরপারে 'বেগাম' গ্রামে একসময়ে ছিল কুশান-সম্রাটের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী। তার নাম 'কপিল'। এই কপিল-নগরীর উল্লেখ আছে চৈনিক পরিভ্রমক হিউ-এন-সাং-এর প্রথমভ্রমণে। এখানে আবিস্কৃত হয়েছে কিছু গ্রীক ও রোমক মূর্তি, পল্লিনগরীতে প্রাপ্ত চব্বকের অনুকরণে নির্মিত পানপাত্র, চীনা-মাকের নির্মিত মস্তক। এইসব বিহীনভারতীয় শিল্পনির্দেশের সঙ্গে একই কুশতর পাওয়া গেছে অলম্বার ভারতীয় মূর্তি, ক্ষুদ্রমূর্তি (statuette) যাতে গলবার ও মধ্য শিল্পের প্রভাব অনস্বীকার্য। বেগাম ছাড়া কালালাবাস অথবা হাজাভেও পাওয়া গেছে প্রচুর মূর্তি ; ভারতীয় ও গ্রীক ভাস্কর্যের অন্তর্ভুক্ত সংমিশ্রণ। প্রফেসর খেলস্কট বলেছেন, 'হাজাভে (যার প্রাচীনকালে নাম ছিল 'নগরহাট') প্রাপ্ত শিল্পসামগ্রীতে মহাযানী বৌদ্ধ-শিল্পের প্রভাব রয়েছে।' এ-অঞ্চলের সবচেয়ে বড় শিল্প-নির্দেশ পাওয়া গেছে 'বামিহান'-এ। সেখানে আছে অতি প্রাপ্ত মূর্তি দ্বয়—একটি মধ্যমাত্র মধ্যমূর্তি, ৫০ মিটার ও ৩৯ মিটার উচ্চ। প্রথমদিকে প্রাপ্ত-শিল্পের ছাপ অতি স্পষ্ট। এ মধ্যমূর্তির উপরে একটি কুদুপাতে যে ভাস্কর্য দেখতে পাওয়া যায় তাতে নিঃসন্দেহে ভারতীয় ছাপ। বামিহানে কিছু প্রাচীর-চিত্রও পাওয়া গেছে যার নির্মাণ-পদ্ধতি ও স্টাইলে অদ্বৈতা মধ্যমাত্রের প্রভাব।

এবার চীন-অতিমূর্তির রঙনা দেওয়া বাক। চীন ও মধ্য-এশিয়ার সঙ্গে ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে মধ্য থেকেই শুরু। একে বৈদ্য কখন, এশীর শিল্প-উপলব্ধির এই দৃষ্টি দ্বারা প্রথম পরিচয় করে চীন-সচী স্টাইলের ও তার আদর্শ, চীন ও মধ্য-এশিয়ার পাকিয়েছিলেন। যদিও সঠিক সময়ে জানা যায় না, তবে এ-কথা বোঝা যায় যে, চীনদেশে চ-ইন সাম্রাজ্য এবং ভারতে মোর্য-সাম্রাজ্যের গৌরব-প্রতি যখন মধ্য-পন্থে ভ্রমণ এ-মুঠি মহান প্রতিবেশী পরস্পরের পরিচিত ছিল। ভারত-চীনের ভিতর রেশম-সড়কের ভিতর সমান্তরাল ধারা। প্রথমটি উত্তরদিক থেকে—ভিয়েনশান পর্বত-মালার উত্তর-সানদেশ বরাবর—সম্রাটবন্দু, ডালবন্দু, বোকাবন্দু, গার হতে ইশ্‌কুল হ্রদে

কিনার ঘেঁষে সে-পথ ছিল চীন-কাকট্রিয়া-পারস্যের বাণিজ্যপথ। শ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীর ভিত্তেপান্ (চীনা ভাষায় 'পান' মানে পর্বতমালা) পর্বতের দক্ষিণ-সান্নিদেশে বসেছিল। কিন্তু এই পর্বতের দক্ষিণে আছে উষ্ণর তাকলামাকান মরুভূমি—পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ; ব্যতিত মরুভূমির সমান্তরালে বয়ে চলেছে শব্দভ্রোরা তারির নদী। শ্বিতীয় ও তৃতীয় শত্রে এই নদীর দুই পাশে ঘেঁষে। শ্বিতীয় পথে, তারির নদীর অববাহিকার উত্তর দিকে পড়বে—খাশগড়, তুরস্ক, শিজিল, কুচা, কারাশহর, তুরকান। তৃতীয় পথটি চলেছে তাকলামাকান মরুভূমির দক্ষিণপ্রান্তে ঘেঁষে, অর্থাৎ হিমালয় পর্বতের উত্তর-প্রান্ত বরাবর। সে পথও মরু হলেও এই খাশগড়—সে-পথে পড়বে ইয়ানকাঙ, নিয়া, চারুচান, মীরান, লব-নর। তিনটি পথেই এই-প্রান্তে খাইবার-পান্ এবং এ-প্রান্তে তুন-হুয়াঙ।

এ তিনটি 'রেশম-সড়ক' বা 'মশলা-সড়ক' দিয়ে সহস্রাব্দীকাল ধরে চলছিল করেছে অমৃত-নিবৃত্ত জবশারী, বণিক, পণ্ডিত ও তীর্থযাত্রী। বণিকেরা উঠে পিঠে বোকাই দিয়ে নিয়ে গেছে লাক্ষা, মসারা, গজগন্ধ, তৈজসপত্র, সূক্ষ্মাতি, কস্তুরী, চন্দন আর নিয়ে এসেছে চীনদেশক, সিন্দূর, রোজের তৈজসপত্র, বেড়-পাথরের কারুকার্যশ্রিত সৌখীন সামগ্রী। আবার এই পথেই এসেছিলেন চৈনিক পরিব্রাজকের দল ফা-হিয়ান, হিউএন-ত্সাঙ, ই-চিং; চীনদেশে নিয়েছিলেন ভারতীয় প্রমথলা—কাশ্যাপভাস্কর, ধর্মতর, কুমারজীব, ধর্মকেন্দ, বুদ্ধদেব, বুদ্ধভদ্র, বোধিবর্ম, বজ্রবোধি ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রমথ পথের ধারে ধারে গড়ে উঠে গ্রাম, জনপদ,



চিত্র—১১২৪ অরুণ ও সিংহী  
চৈনিক দিল্লী—সি. লুও-হিয়েন।



চিত্র—১১০১ সুনাম ও সিংহী অমলতা মণ্ডল-ইংরেজ।

মরুশাসনশালা। গড়ে উঠে মরু-সম্মারাম—খাশগড়, তুরকান, শিজিল, মীরান, তুন-হুয়াঙ। আবার খবর রাখি না, তাই জানি না—কিন্তু খুঁজিয়ে যদি দেখতে আসে অনুভব করবেন—হাকার হাকার মাইল ধরে মরু-মরু মরু-মরু পর্বত অতিক্রম করে কী অনিশ্চার্যভাবে সেইসব মরু-সম্মারামে আরতীয় তারা অমলতা-শিল্পের শাকর পড়েছে! কিন্তু আরিত আলোচনা সম্ভবপর না, তবু আসুন কিছুটা দেখে আসি সেই 'হারানে-লিপ্যন্তর' দেখ।

দ্বাদশগুণে আছে কিছু প্রাচীর-চিত্র, যার নির্মাণ-বৌশল ও শটাইল অজন্মতার অনুসারী। এগুলি আঁধারশেষে বসন্ত ও সপ্তম শতাব্দীতে আঁকা, অর্থাৎ অজন্মতার যেতদন্ত সন্তদশ-বিহারের বাল্যকাল, মীরজ, প্রায় সমসাময়িক। তুর্কফান গড়ে শুধু আরও অনেক পরে, নবম শতাব্দীতে। সেখানে গান্ধার শিল্পের সূচক চীনদেশের উত্তর-মুগের হুন রাজার শিল্প-চেতনার আত্মত্ব লক্ষ্যমাত্র। খোদেন থেকে তুর্কফানের পার্শ্ব-ভাগের প্রায় মাঝামাঝি কতকগুলি কৃত্রিম গৃহা আছে মীরজেন, সেখানে অজন্মতার-উত্তর আঁকা প্রাচীর-চিত্রে জাতক-কাহিনী। এখানকার কিশোর-কিশোরীর একটি কাহিনী-চিত্রের নিচে রোমান হরফে চিত্রের স্বাক্ষর রয়েছে যেহেন। রোমক চিত্রকর, নাম—ভিত্তা অথবা ভিত্তাস্। ভাঙতে ভাঙতে লাসে মধ্য-এশিয়ার মধ্য-পারস্যদেশের সম্ভাব্যভাবে ভারতীয় চিত্রে বৌদ্ধ-জাতকের ছবি আঁকছেন একজন ইতালীয় চিত্রকর। দ্বাদশগুণের মিহখাই (মহন্ত-গৃহা)-বিহারে আঁকিত একটি চিত্রে সমস্ত বৌদ্ধপ্রমাণের দেখানো মনে হয় হুইজু, তাঁরই কটিল করে কসেছিলেন অজন্মতা সন্তদশ-বিহারে সার্বিকত্বের পরীক্ষাদেশে (চিত্র ১১৬)। এই মধ্য-এশিয়া শিল্পের সবচেয়ে পরিণত উদাহরণ পাই চীনের প্রবেশমাত্রের গড়ে ওঠে মধ্য-শাহর—তুর্কফান। সেখানকার শিল্পে ভারত-চীন যেন একাকার করে গেছে। এ পাখই বৌদ্ধধর্ম ও ভারতীয় সংস্কৃতি গিরোঁদে চীন, কোরিয়া ও জাপান।

হু—একটি উদাহরণ বেশ করতে থাকলে বসন্তটা সহজে বোঝানো যাবে। অজন্মদের প্রথম উদাহরণ চীনা-শিল্পী লি লুঙ-মিহেন-এর আঁকা একটি শিল্পের স্কোপ। শ্রাবণ-শতাব্দীতে ঐ বিখ্যাত চীনা চিত্রকরকে মধ্য-এশিয়ার কোন সংস্কারের প্রধান অর্থে মহামান-ধর্মের কিছু ছিট আঁকতে নিয়োগ করেন। এই বেশক-চিত্রটি তাইই ফলশ্রুতি (চিত্র—১১৭)। এটি প্রাচ্যের



চিত্র ১১৬ঃ জোয়াং হি (চীনা-শিল্পী)।



চিত্র ১১৭ঃ অশোকেশ্বরের  
সম্মুখীন (মধ্য-এশিয়া)।

লোকের বিনিয়নের বিখ্যাত সংগ্রহ—গোলবার থেকে অনুকৃত। প্রাকের বিনিয়ন চিত্রটির নাম-করণ করেছেন "An Arhat and a Lioness" (জৈনিক অর্হৎ ও সিংহী)—বর্তন বলেমান—কে ঐ অর্হৎ, কেন ঐ সিংহী অনুভূত ভাষা। কোন কোন ভিৎস কলালমালাচক বলেছেন—অহিস্যোন্তে-পীকিত অর্হৎ-কে পশুজা অচরণ করবে না—এটাই হচ্ছে চিত্রের বিব্যবস্ত। আমার কিছু বলে হয়েছে লি লুঙ-মিহেন চিত্রের বিব্যবস্ত সত্য করেছিলেন সূত্রসম

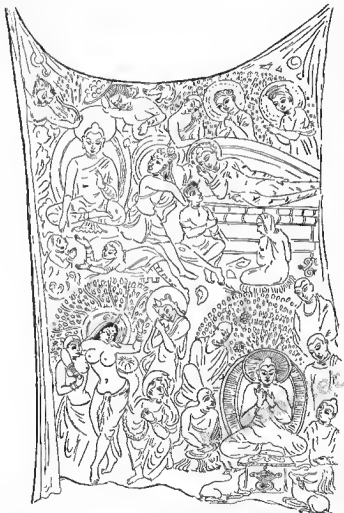
জাতক কাহিনী থেকে। ঐ বৃক্ষ অর্থাৎ নন্দ, কাশীরাজ সুমাস এবং সিংহীটা পদ্মশরির প্রতীক নয়, কারাতুরা রাজার প্রেরণী। উদ্ধাক্ষিত অর্থাৎ-এর মস্তক মূর্ত্তিত, শিখরে রত্নচ্ছতীও আছে—কিন্তু তার অঙ্গ; পতী অজ্ঞান নয়, ঝাঁকোচিত কারুকর্ম্মখচিত চীনাংশুক, তার বর্ণে কুণ্ডল, বাস হস্তে অঙ্গল। সবচেয়ে বড় কথা, পুঙ্খ ও সিংহী যেভাবে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছেন তার ভিতর একটা বিশেষ রসের সন্ধান পাচ্ছি সেন। ঐ চিত্রের পাশাপাশি যদি অজন্মতা সম্ভবশস্যহার সেই খণ্ড চিত্রটিকে সন্নিবেশিত করি (চিত্র-১১০) তাহলে তুলনামূলক বিচারটা সহজ হবে। লক্ষ্য্যার, মঙ্গল্যার অঙ্গ-বসন-অভ্যাস্ত চীনাশিল্পী অদেখা সিংহীর পুঙ্খটি আঁকতে পারেননি। সুদৃষ্টি-স্নেহের চিত্রের পঙ্খাংশুট পর্বাভের বেধ এবং মেঘান্ত্র একেবারে ‘টিপিক্যাল’ চীনা; অঙ্গ পুঙ্খটির ভাঙ্গা, চলন্তুল প্রভৃতি অজন্মতা-পর্য্যী।

আমাদের শিবতীর উদাহরণটি সত্যই করেছি তুন-হুয়াঙ-এর ২৫৭ নং গৃহা থেকে। চিত্রটি (চিত্র-১১৪) ‘কোয়ান্টারিন’ হচ্ছেন অবলোকিতেশ্বর পদ্মশাণির চৈনিক রূপান্তর। এবারও পাশাপাশি তুলনা করতে সুবিধা হবে বলে অজন্মতার প্রথমগৃহ্যের চিত্রটি এখানে সন্নিবেশিত করে দিলাম (চিত্র-১১৫)। সাব্যস্ত খুঁজে পাইছেন? চীনা চিত্র চিত্র নয়, তার হুঁতুর চোরে রত্নচ্ছতীই বেশী প্রকট—তবু দক্ষিণ হস্তের মৃত্যুর, কহুখান আনিত দৃষ্টিতে কি



চিত্র-১১৫ঃ শিবজিন-সম্মানভেদে প্রতীকিতঃ।

একই ব্যক্তির কাছাকাছি নেই? মনে হচ্ছে না কি যে, তুন হুয়াঙ-শিল্পী অজন্মতার ঐ বিখ্যাত চিত্রটি নিশ্চয় দেখেছিলেন। তার মানে এ নয় যে, মধ্য-এশিয়ার শিল্পীকে হাজার মাইল পার্বত্যপথ পথরকে অতিক্রম করতে হয়েছিল—কারণ আমরা অন্যরাসে অনুমান করতে পারি, চিত্রটি কোন বৌদ্ধপ্রভাবের সত্যই তুনহুয়াঙ-এরই তিনি হস্তে দেখেছিলেন। বস্তুত্বক্ষে বাক্য, পরিভাষক, ধর্ম্মপ্রচারকদের মাধ্যমে এভাবে বহু শিল্প-অনুকৃতি ভারতের বাইরে যেত। হিউ-এন-ক্সাং স্বয়ং ভিনদেশের অধিক শিল্পসামগ্রী ভারতব্য বৈকে নিয়ে গিয়েছিলেন।



চিত্র-১১৭। চিত্র-১১৮-র অংশ-বিশেষের বর্ণিত আকারে।

সিন্ধের সেকালে আঁকা ছবি কীভাবে ভারতীয় ধর্ম, চিত্রশাস্ত্রাচার সংস্কৃতি এবং শিল্পচেতনাকে সম্প্রসারিত করেছে তার একটি অনবদ্য ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে খাঁজিল্ সল্যারামে।

ঠানিক-তুর্কিস্থানে অবস্থিত খাঁজিল্ সল্যারামের এই চিত্রটিতে দেখছি মহারাজকে তরুণত বৃদ্ধদেবের কীবাণী সম্বন্ধে অবহিত করতে মন্দিরীর একটি সিন্ধের সেকাল মেলে গড়েছেন। (চিত্র—১১৩)। চিত্রের ভিতরের ঐ চিত্রটির মধ্যস্থ উপস্থাপিত করতে সিন্ধের স্ট্রেলটিকে বহিত অক্ষরে পুনরায় একে দিয়ার (চিত্র ১১৭)। এখান লক্ষ্য করে দেখুন, শতাব্দীসংগ্রেহ কীভাবে চারটি ছল ঘটনা ওখানে দেখানো হয়েছে। প্রতিটি খাঁজিল্

চিত্রেই কিন্তু অজন্মতার নিয়মিত চারটি শিল্পকর্মের অনুকৃতি। নীচের কমান্ডকে শিল্পী একেছেন—কুশিনী-কাননে বৃদ্ধদেবের জন্মস্থানত। এটি অজন্মতা মিতার গুহার একটি চিত্র (অবস্থান—২।২৪) অবলম্বনে আঁকা। মায়দেবী একইভাবে জন্ম হাতে সখীর গলা জড়িয়ে শালভিক্ষা-ভিক্ষামায় গজয়মান। নিম্নভাগের বক্ষিয়ারে মৃগদেবে বৃদ্ধদেবের প্রথম ধর্মচক্রপ্রবর্তন। এটি নিছক ভারতীয় শাইলে আঁকা—অজন্মতা, শারনাথ, অমর্যাবতী, মধ্যভাগ অসংখ্য শিল্পসমগ্রীতে একই ছন্দে ধর্মচক্রপ্রবর্তন-শ্য পরিপূর্ণটি হাতে দেখেছি। উপরোক্তের বাম পার্শ্বে ষাট-বিজয় কাহিনীটি অজন্মতা প্রথমগুহার (চিত্র—১১) চিত্রের সঙ্গে তুলনীয়। বক্ষি-প্রান্তের মহাপরিবর্তন চিত্রটি অজন্মতা বড়বিশেষিত গুহার ভাস্কর্য-নির্মাণের অনুকৃতি। ফলে, এই চিত্রটি থেকেই আমরা অনায়াসে বুঝতে পারি কী পশ্চিজে অজন্মতার শিল্পচেতনা বহিঃভরতে সম্প্রসারিত হয়েছিল।

আমরা মহা-এশিয়ার আরও একটি শিল্পসম্পদ উদাহরণ হিসাবে পৃথক করে দেখব। ঠানিক-তুর্কিস্থানে তুরফান মরুপ্রান্তরে অবস্থিত বেজেন্‌ক্লিক্ গুম্ফার অবস্থিত একটি চিত্র এখান আমরা দেখছি (চিত্র ১১৮)। অপর শতাব্দীতে আঁকিত এই চিত্রটির বিষয়বস্তু ভারতীয়, বৌদ্ধধর্মের, উপরাজে দেখা পড়ির ভাষা সংস্কৃত, কলিঙ্গি রাশী, বহিঃ-যেহেব্লিক্ চিত্রে আঁকিত ব্যক্তিরা কেউ ভারতীয়, কেউ তুর্কি, কেউ না নিছক চীনা। মূল-লতা-পাতা অলঙ্করণে ভারতীয় শিল্পের অসংখ্য মহা-এশীয় প্রভাব বেশী। রাশী-ব্রহ্মে দেখা সংস্কৃত শৈলাকটা বাঙলা হয়ে।

হস্তাঙ্কন সুকর্ণন নারীভরমুদ্রাণি।

সম্রাট কীনায়ান্ পুদ্বার্থম্ উদ্যানম্ প্রেতীনাভুতম্॥

যার অর্থ “হস্তী-প্রশ-শ্বক-মোহিত-মণি-মুদ্রাণি সমেত জামি বাণিজ্যমাণ্য করোছি হরজন বিজয়ীকে অর্ঘ্যদান-মানসে।” অর্থাৎ জাতিত্মের ভবিষ্য-বৃদ্ধ করছেন, তিনি পূর্ব পূর্ব জন্মে হরবার অর্থকন বণিকগৃহে জন্মলাভ করেছিলেন, এক তার সমস্ত সম্পদ উদ্যানীতন বৃদ্ধের চরণে অর্ঘ্য দিতে তিনি হরবার পুত্রাধ্যা করেন। চিত্রের বেজেন্‌ক্ল-রোখা দ্বাং বৃদ্ধদেবী প্রতিনামা-মল্লিক এ-চিত্রের নিচে, বামপ্রান্তে দেখা যাচ্ছে সুসজ্জিত করেকটি গৃহপারিত দ্বাং—উট, ঘোড়া, অশ্বপত্র। তার উপর জ্যোতিঃপ্রভা-মণ্ডিত এক দেবদূত—অর্থাৎ বৃদ্ধদেবের স্বর্গীয় অনুচরবলের একজন। বিনি তথ্যগতের তরফে উপহারগুলি গ্রহণ কর্তৃক আশ্রয় হয়ে আসছেন। আমরা যদি ভিন্নর বরাবর কেন্দ্রস্থ বৃদ্ধমূর্তিকে প্রদক্ষিণ করি তবে এরপর আরও উপরে দেখব পাশাপাশি বোহিসত্ত্ব বস্ত্রাণি ও পদ্মপাণ্ডিক। বোহিসত্ত্বের বিপরীতে, বৃদ্ধমূর্তির কাছে তার হৃদয় প্রধান শিরঃ-সারিগুহ ও মহামৌলিকজয়ন। তাঁদের নিচে আরও দুজন অর্থক। নিচে চিত্রের বক্ষিপ্রান্তে বৃদ্ধন স্থানীয় বণিক নতজানু হয়ে অর্ঘ্যদান করছেন। তাঁদের নেহাভূতি ও সাজ-পোষাকে চীন ও তুর্কিস্থানের প্রভাব। কেন্দ্রস্থ বৃদ্ধমূর্তি তম্বর, উদ্যানী, আবরামন, বক্ষিগহনিত অভয়া ও বামে বরলা-মুদ্রা। চীন-জাতিত্ব বেশম-সড়কের মাধ্যম্যি বেজেন্‌ক্লিক্ গুম্ফার অবস্থিত এই অপরিস্ফুট শিল্পকর্মটি মের মহাচীনের চিত্ররূপ ও ভারতীয় গুপ্তবৃদ্ধের এক মিলনভীর্ষ।

তা হোক, আমি কিন্তু অন্য কথা জবাব দিচ্ছি। আমি ভাবছিলাম : এ চিত্রের সাহায্যে ও মৌখিকভাবে কীভাবে ব্যাখ্যা করলেন শিল্পী? মেজেকলিকের চিত্রকর যখন তুলি-হাতে এ প্রাচীরচিত্র আঁকতে বসেন তার অন্তর্গত সহস্রাবর্ষ পূর্বের বিশ্বের ঐ দুই মহান শিল্প সৌহার্দ্য



চিত্র—১১৪ঃ মেজেকলিক-এর ব্যাখ্যা।

করেছেন, অর্থাৎ পরিণির্বান লাভ করেছেন। এক তাঁদের দেখতে যে কেমন ছিল তা কেউ জানে না। তাহলে মেজেকলিক শিল্পী তাঁদের আঁকলেন কেমন করে? নিছক কল্পনায়? মনে করে দেখেন, অদৃশ্য সমস্যার সমাধান রাখায়েল কীভাবে করেছিলেন। রেনেসাঁ-যুগের দৈক্য



শিল্পী রাখিয়েল আঁকতে কালেন 'একশনের আকস্মিক'; কিন্তু সেই জ্ঞানপীঠের যেনব বিখ্যাত চিত্রের তাঁর ভেদ দেখুন; হাজার বছর আগে গড় হেরেছেন! রাখিয়েল একটি মূন্সের ভৌশল করলেন—অতীত যুগের শিক্ষালয়ের কলশাপ্রায়ী চিত্র আঁকলেন না, তাঁর সমসাময়িক শিক্ষালয়ের করলেন মডেল। শেলটোর মডেল হলেন লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি, হেরাফ্রটাস-এর মডেল হলেন মিকেলান্জেলো, জ্যামিতিক-কলক শিক্ষাখোরাস-এর প্রতিফলিত আঁকলেন কম্পাস-হাতে সমসাময়িক স্থপতিবিশ্ব-প্রাচীরের আকৃতি অনুসারে। তাই ভার্মিলাস-বৈজ্ঞানিক-শিল্পীও কি সারি-পূর আর মহামোহন্যরায়কে স্থপতির ভাবে স্থানীয় মূর্জন অহংকে মডেল করে নিয়েছিলেন?

পাঠককে অনুমোদন করব—সিদ্ধান্তে আসার পূর্বে একবার অজ্ঞাত সংস্করণ-বিহারের আদি-পুস্তকের পরীক্ষা চিত্রের কোন অনুলিপি দেখুন। না, একশনের চিত্র-৫৫ নয়, আপনাকে তুলনা করতে হবে 'আঁক' ওলিকক্যাল সান্তে' অর্থাৎ ইন্ডিয়া-সম্পাদিত 'অজ্ঞাত মূর্জালস' গ্রন্থের শ্লেট নং LXXV-এর সঙ্গে তুলি তুলিয়ার-এর খা আট অর্থাৎ ইন্ডিয়ান-এশিয়া-র শ্লেট নং ৬১০। চিত্র-৫৫-র সঙ্গে চিত্র-১১৮-তে মিল খুঁজে না গেলে সে যোগ বর্তমান প্রত্নতত্ত্বের অপরূপ তুলিত। প্রামাণিক গ্রন্থে মিলিয়ে দেখলেই বুঝবেন, বৈজ্ঞানিক-শিল্পী তাঁর সমকালীন কোন বৌদ্ধ অহংকে মডেল করেননি—অজ্ঞাত-শিল্পীর আঁকা বৌদ্ধ অহং-এর তাঁর চিত্রে অনুকৃত করেছেন। সন্দেহও এই অজ্ঞাত-চিত্রের কোন অনুলিপি তিনি সেই মধ্য এশিয়াতে কসেই পেরেছিলেন কোন পরিপ্রায়কের সম্মুখে।

উত্তরদিকের অভিযানে ফলত দিয়ে আমজা হাট এখার সমুদ্রপথে হাফিলাভিমুখে ব্যাঘ্র করি তাহলেও দেখব সেই একই দৃশ্য। সমুদ্রের ওপারে ভিন্ন দেশে ভিন্ন শিল্পীর দল তাঁদের স্থানীয় শিল্পের ধ্যানধারণার সঙ্গে প্রমাণত মিশিয়েছেন ভারতীয় কলাবিশালকে, ভারতীয় চিত্রশিল্পকে। ভারত-শাটী-আরব-শাটী-অজ্ঞাতের কলা-চিত্রতার তির্যক প্রতিফলন হয়েছে—সিহলে, রক্তকেশে, কাম্বোজে, চম্পার, জাভার। সিহলের সিংগিরি-পুস্তকের অপরূপ-কল্পনা-বৌদ্ধ-বৌদ্ধ-শাটী-আরব-শাটী-অজ্ঞাতের আকৃতি দিয়ে গড়। মূন্সের জাভা, কলি, ববু-এর ভারতীয় পেরাণিক কাহিনী ভারতীয় শিল্পশৈলীকে স্থপতির। কাম্বোজের ওলিকক্যাল এবং ওলিক-জাভা নগরমূর্তি, মূন্সের ভারতীয় প্রভাবমূর্তি নয়। প্রভাবমূর্তি না হলে একথা বলাই না যে, এই সব দূর-প্রাচ্যের শিল্প প্রদেশে একমাত্র ভারতনির্ভর। অথবা ভারতীয় শিল্পীরাই যিনি সেগুলি গড়েছেন। উনবিংশ ও বিশ শতাব্দীতে ইউরোপ থেকেই এশিয়ার সাময়িক অর্থ-নৈতিক জীবনে ঔপনিবেশিক প্রভাব বিস্তার করেছিল—ভারত সেভাবে প্রাচীন প্রাচীতে নিজের শিল্পচেতন্য ঘোষণা করে চাপারনি। অপরূপে পরিপাশ্বিকের প্রভাব তার উপর পড়েছে, কিন্তু জাভা সে নিম্নলিখ ভারতমো হারানি। এই প্রদেশে প্রবাসীদের "The Foundations of Indian Culture"-গ্রন্থের একটি অনুচ্ছেদ লেখা করা যেতে পারে। প্রবাসীরা বলছেন

"মিশরীয় যিনিদার এবং অপরূপের প্রাচ্য-প্রভাবের ভিতর রয়েছে একটি গ্রীক সভ্যতা : কিন্তু অ-হেলেনীয় বা 'বর্বর'-সভ্যতা থেকে গ্রীক-সংস্কৃতির মূন্স-ভাবের সরে থাকতে চেষ্টেছিল। আভ্যন্তরীণ দান-প্রতিফলনের উর্ধ্ব-স্থাপিতের বৌদ্ধো এভাবে সে কয়েক শতাব্দী হয়ে বেঁচেও ছিল। প্রাচীন ভারতের অথবা অনুর্ধ্ব ছতী ঘটেছে যেন—পরিপাশ্বিক সভ্যতার বৈচিত্র্য সত্ত্বেও আভ্যন্তরীণ প্রাচ্য-প্রাচ্যের হাফিলা সেও সত্যিই ছিল : বহু ভারতবর্ষের ক্ষেত্র দেখেছি তাঁর আন্তর-বৈচিত্র্য এবং আভ্যন্তরীণ দান-প্রতিফলন জাভা আরও অধিক পরিমাণে প্রাপকৃত চেষ্টেছিল। চীনের সভ্যতা একটি তৃতীয় উদাহরণ। গ্রীস আভ্যন্তরীণ থাকতে চেষ্টেছিল, কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতি কোন যুগেই বাইরের প্রভাবকে অস্বীকার করেনি। বহু কাল : নিম্নলিখ মূন্স-বর্জিত, পরিপাশ্বিক এবং বহিরাগত প্রভাবকে স্থাপিতের ক্ষমতা ভারতের পক্ষে স্বাক্ষরদের কাছ করেছে।

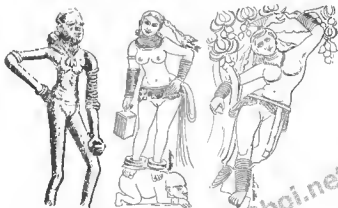
বীহাৰিশৈশৱ চিন্তাভাৱৰ অনুগুন সে অনুভৱ কৰেহে, হয়তো ভাতে অভিজ্ঞতও হয়হে ; কিন্তু হতাশকিত হাৰে স্বাৰ্থকৈ পৰিত্যাগ কৰে—আপন জাৰকৰসে জীৰ্ণ কৰে সেগুণিৰে স্বাৰ্থ সংস্কৃতিৰ মতো সুসংহত হুঁশ দিহে আপন কৰে নিজেহে।”

তাই কনছিলাম, জাৰত এইসৰ শিল্প-সংস্কৃতিৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হাতে জাৰনি, বৰং এনেৰে সপেগ একই ভালে একই হুঁশ হোঁকনতো অংশ গ্ৰহণ কৰেহে, চক্ৰাবৰ্তন কৰেহে, বিৰোধে ও নিৰেহে ; —হাৰতো বিৰোধে বেশী, নিৰেহে কম, সেটা বড় কথা নহ। বড় কথা, এয়া সবাই সমধৰ্মী, যৌবনুজ্ঞেৰ অংশীদাৰ।

এ পৰিচ্ছেদেৰ সূচনাৰ আমাৰ সৌৰ-জগতৰ যে চিত্ৰসূচী দিহেই সেটাই আকাৰ বহি : হুঁত-বস্পল-বৃহস্পতিৰ সপেগ পৃথিৱী থেমন সূৰ্য-গ্ৰহাংকণ কৰেহে, ঠিক সেইভাবে প্ৰাচীন-যুগে জাভা-জাৰ্টী-কীনি-জাপান-ৰা-এশিয়াৰ সপেগ ভৱতৰ্হৰও নিৰন্তৰ চক্ৰাবৰ্তন কৰেহে। তাহলে এই শিল্প-সৌৰ-জগতৰ সূৰ্য কে? কোন্ অতিকৰ্ম-শক্তিই বা এনেৰে কেন্দ্ৰাতিগ বেগে কক্ষযুগত হাতে দিল না সহস্ৰাব্দীকাল?

জামুন, সেই হুঁশ প্ৰশ্নসকলৰ সমাধান খুঁজে ঘোঁৰি এবাৰ :

একটা শাসনতকালৰ শিল্পভাৱনাকে ধনিষ্ঠভাবে বিবেচন কৰে দেখা দাক : নারীৰ সৌন্দৰ্য!



চিত্ৰ—১১১১ মণে লো-কায়েৰ চিত্ৰ—১২০৪ মণে  
মণেৰী। হাৰ্ণিৰী।

চিত্ৰ—১২০৪ মণেৰী।

আমাৰেৰ আলোচনাৰ সূচিকা হৰে যদি আমাৰ প্ৰাচীন-প্ৰাচীন ভিন্ন ভিন্ন প্ৰান্তেৰ কয়েকটি উদাহৰণ পাশাপাশি সাজিহে পৰীক্ষা কৰি। চিত্ৰ—১১১১ থেকৈ চিত্ৰ—১২০৪-এ তাই কৰা হজেহে। এই শিল্পসামগ্ৰীসূচী ভিন্ন কালে ভিন্ন দেশে শিল্পীৰা হুঁশাৰিত কৰেহে; কিন্তু প্ৰত্যেকটিৰ হুঁশ প্ৰতিবেদন অতিম : নারী দেহেৰ সৌন্দৰ্য!

ঐ শিল্প-সংস্কৃতিৰ উপৰ জোৰ হুঁশালে একটা সভ্য আমাৰ অনুভৱ কৰব, ওয়া একজাতৰে। তেন ওয়া একজাতৰে? কী ওনেৰ সমধৰ্মিতা? না, এখনই তা সূচিকে বলতে

পারছি না। কিন্তু ঐ সঙ্গে যদি আর এক সারি শিল্পদ্যাত্রী পশ্চিমবঙ্গ থেকে সংগ্রহ করে এনে মাজিত্রে দিই তবে সহজেই করতে পারব : ওয়া ভিন্-জাতের। বরা থাক, ভেনাস-ইড নারী দেহের সৌন্দর্য

মেসো, স্যাবারেলের মায়েল্য, লিওনর্দোর মোনালিসা, তিশান-জর্জনে-রুক্স-এর ভেনাস, কিম্বা রেনোয়া মেগাথেনোজোর ম্যাকব্রা—  
আমলে একটা নির্দিষ্টতার কলতে পারি—যদিও দুটি জলিকাতাই মূল প্রতিবেদন আশ্রয় :  
অনাবৃতা নারীদেহের সৌন্দর্য, তবু ওয়া ভিন্-জাতের।

বিবাহবন্ধ বধন অভিন্ন, নারীদেহের সৌন্দর্য-সৌন্দর্য-সুন্দর্য প্রতিবেদন যখন দেশ-কাল-নিরপেক্ষ মোটামুটি সাম্ব্যত—তখন কেন ঐ দুটি জলিকাতার রমনীকুলের চিত্র ভিন্ন কাজের? ভৌগোলিক অথবা সময়ের দৃষ্টান্তই কিন্তু ঐ কৈশোর্যশোর মূল কথা নয়। বিচার করে দেখুন—মহেন্দ্র-জো-নারো (চিত্র-১১৯) এবং ববলীসের (চিত্র-১২৪) মধ্যে মতো ভৌগোলিক দূরত্ব গ্রীস-ইতালী ভারত থেকে আর দূরে নয়। মথুরা বাঁকণীর (চিত্র-১২০) তুলনায় ভেনাস-ইড-মেসো-এর সময়ের দূরত্ব মহেন্দ্র-জো-নারোর চেয়ে কম। আহলে?

ভারতবর্ষ নারী-সৌন্দর্যের তিনটি রূপান্তর দেখেছিল—নারীর মাতৃভাব, সখীভাব ও কন্যাত্ব। প্রথমটি এসেছে প্রাগৈতিহাসিক মাতৃভাবিক সমাজ-ব্যবস্থার স্থান-ধারায় ঘেলে। ঐই মাতৃভাবের চিত্রটি পশ্চিমবঙ্গেও ছিল—ঐ রূপায়িত হয়েছে অসংখ্য মামোনার, মেরী-মাতার মূর্তিতে। আমরা এখানে যে ছয়টি মূর্তি সন্নিবেশিত করছি তাদের কারও মাতৃভাব



চিত্র-১২২। কলকাতা  
—নারীর সখীমণি।



চিত্র-১২০। সিদ্ধেশ্বরী।



চিত্র-১২৪। মথুরা-  
বাবলীস।

প্রকট নয়। একটু লক্ষ্য করলে দেখব, চিত্র-১২২ এবং চিত্র-১২৪-এর মধ্যে রূপায়িত হয়েছে কন্যাত্ব—মাকি চারটির হাল্ধ সখীভাব, অল্প নারিক।

রমণী দেহের সৌন্দর্য-সুন্দর্যের বিষয়ে নির্দেশ দেবার সময় ভারতীয় শিল্পদ্যাত্রী যেন খুলে বসেছিলেন সংস্কৃত-কালো নারিকার কলি। তার ম্যাদেশ হবে কীণ, উপরে ও নীচে যৌবন বাঁচিলা; তার উল্লে যৌবনের স্বপ্ন অরুণত। উপস্থাপিত ছয়টি নারীমূর্তির প্রত্যেকটিতেই সেই কল-নারিকার মূলকলদ্বারা সুন্দর-সুন্দর্য কতিপয় দেখতে পারছি

প্রথম উদাহরণটিতে। কার্যটা বলা গেল—সেটি নির্মিত হয়েছিল হিন্দু কবিভুলের কব্জের বহু পূর্বে, বস্তুতঃ হিন্দুধর্মের আদিগ্ধ 'বেদ' রচিত হওয়ারও পূর্বে। তা হোক, তবু যদি আমরা চিত্র—১১৯ এবং চিত্র—১২০-র মধ্যে তুলনামূলক ক্রিয়াকর্ম করি, তাহলে দেখব ওদের মাদৃশও বড় কম নয়। সে মাদৃশ্য ওদের মণিবস্ত্র অলংকার প্রাচুর্যের জন্য নয়, দেহ-ভাষামার জন্য নয়—সে সমর্থনিত আর মূল আবেগ গভীর। ওরা দুজনেই মাদার হাত রেখে বিচিত্র ভাবে বর্ণকের দিকে বহুসময়ী দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ওদের গুণ্ডপ্রাপ্তে একই জাতের আসা, কৌতুকময়ীর কটাক্ষে একই জাতের হাস্য,—বোধকরি ওদের জীবনবোধনেও একই জাতের ভাষা। কী ওদের বাজনা? প্রথমটি প্রাচীনতর, মহাকাশের স্থূল হস্ত্যবলগণের তার সূক্ষ্ম বর্ণিকাতম্য কিন্ত—তাই শ্বিতীজ্ঞকেই আমরা বর্ণিতভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখতে পারি। দেখছি, মদ্রা-বর্ণণীর পদতলে মৃত্যু-অঙ্গুর লিপ্ত হচ্ছে—সে মৃত্যুজরী। না, বর্ণিতগত জীবনে সে মৃত্যুকে জয় করত—তোমার-আমার মত সেও মরণশীল। তবু লালনিক স্বর্গসি'র সঙ্গে কল্যেদন জীবিতবর্তনের সঙ্গে 'জীবন-অমৃত' সেই অমৃতের স্থান সে পেয়েছে; বর্ণিতগত নয়, সমর্থিতগত জীবনে সৌন্দর্যের সংস্থানে দাঁড়িয়ে সে নন্দন-ভক্তের মূলকথা, প্রজ্ঞান-ভক্ত কল্যেদে। তার লক্ষণ হলে একটি পিঙ্গর—কিন্তু তার পোষ-খানা শূন্যপক্ষীকে সে পিঙ্গরবস্ত্র করত, পাখীটি আছে তার কাঁধে। ও কল্যে, প্রেমের নিগড় দিয়ে বর্ণিতগত পিঙ্গরবস্ত্র করা নিঃপ্রয়োজন—বস্ত্রের মধ্যেই প্রেমের মূর্তি, নন্দন-ভক্ত সেই শিকাই নিয়েছে জকে। তাই লিপ্যী ওর পদতলে পড়াভূত মৃত্যু-অঙ্গুরকে ঘোরাই করেই ক্ষান্ত হননি, ঐ মূর্তিকার উপরে গড়েছেন এক মিছন-মূর্তি। ঐ মৃৎলক্ষ্মীর আনন্দন প্রেমসই বর্ণককে মূর্তিতে দিচ্ছে কীভাবে ঐ বর্ণণী মৃত্যুকে জয় করেছে। মৃত্যু যদি মরণজীবনের অন্ত-রস, তবে ঐ রসিকা স্থান পেয়েছে প্রজ্ঞান-ভক্ত আধ-মরণের। আর তাই ও বর্ণকের দিকে তাকিয়ে হয়েছে; সে হাসিতে আছে জাহ্নব। মরণ-সময়ে জীবন-গুরী জালতে ভীত বর্ণককে তাকে সেন ঐ নাসিকা তার বিলাল-কটাক্ষে আর মোহময়ী জ্যোত বলাছে,

“কিম্ব গুণ পূজ্যতে মূল্যাকর, বহু প্রেমনির্মাণজালে।

মদনসময়ে স্তননিভম্বজঘনব্রতঃবিনশতো নী মনোহরাণী।

মৃৎকটিক বিদূষক বলছেন—সমগ্রব্যতির জলধানের কথা কেন চিন্তা করছেন মহাশয়, মল্লভসেনার স্তননিভম্বজঘন-বান থাকতে এ শূণ্যর-সাগর পাড়ি দিতে আর ভয় কি?

চতুর্থী উদাহরণটি (চিত্র—১২১) সচীর পূর্ব-ভোজালীর্ষমিতা এক 'শুকিকার'—বনসেবীর। বৌবনের ভয়মালা তারও কবচস্ত। সেহকরীতে তার প্রাণ-প্রাচুর্য বিমলকর। অলংকারের বাহুলা একে পাড়িত করত—কটিন্বে প্রসাম্পত রহস্য এবং হস্তপদাঙ্গির মণিবলয় সজ্জা তার নারীর্ষ বিকচিত।

ঐ মদালসা শুকিকার সঙ্গে এবার যদি চতুর্থ উদাহরণটি (চিত্র—১২২) তুলনা করত, তাহলে একটি পৈশরীতা নজরে পড়বে। কার্লে-মনিয়ের ঐ নারীর্ষমিতা সে কার্লে-মনিয়েরও কোন ঘাটতি নাই—বহুলাকার পূর্ব-বিকলিত উত্তর, কীপ মদ্যেদ্যে পূর্ব-বিকলিত এবং মৃৎ-কল্যাণকের ন্যায় আনন্দব্রত নারী সৌন্দর্যের সে-এক জন্মদায়ী উপহাস। তবু মনে হয়, ওর আবেদন অন্যভাবেই। ওর হাসিটি মোহময়ী নয়, পরিহৃত্তির; ওর স্তন্যে ভাষামার রত্নাত্মক-রমণীর প্রদর্শনবায় নেই, আছে সাক্ষ্যের সন্দেহ। কতৃজ্ঞ এ রমণী হাতের সহধর্মিণী, নিজ যৌবন বিভাষিত করতে সে প্রসঙ্গ-ভার মত মণিবস্ত্রপ্রাপ্তে এসে দাঁড়ায়নি। এর আবেদন পূর্ণোদ্যে ঘোরা যেত যদি ওর স্তন্যের মূর্তিটিও পাশে একে নিরুদ্য-কারণ ওরা দুজন তথ্যগতের মণিবস্ত্রের স্বারী হয়েই দাঁড়তে এসেছে। কার্লে চেতে বৃন্দেদেবকে চিরস্বামী আসনে বসাতে পেয়ে ওরা দুজন পবিত্রত। তাই ঐ বিকচ-বৌকনার মূল প্রতিবেদন ত্রস্তার; তাই ওর কন্যাতন।

কন্যামূর্তিই যদি, জাহেল ও বিকট-বৌকো কেন? এক কথার দাবাব সেওয়া হুশকিল। যে প্রসঙ্গটা ভোমার-আবার মনে আসিল, তা হু-হুগলর বছর আসে জগতে না শিল্পী-দর্শকের মনে। ওদের কাছে ওটা ছিল স্বভাৱসিদ্ধ। নারীমূর্তি—তা সে মাতৃভাবই হোক আর কন্যা-ভাবই হক হবে সুলভী নারিকার; এক সে সৌন্দর্য কথো নারীমূর্তি বর্ণনার সঙ্গে ভাল রেখে চলবে। প্রসঙ্গান্তরে বামার আগে এই কাণ্ডারটাই ভাগিরে বুকে নিই :

ইউরোপ-খণ্ডে জেনেসা-পুরুষত্বী হুগে লক্ষ্য করে দেখেছি, প্রতিটি চিত্রকর সমসাময়িক নারীর প্রতিরূপিত বা 'পোর্ট্রেট' আঁকবার সময় ওদের বৌদল্যপাটুলি সন্তোষপনে রেখেছেন। গ্রীক দেবদেবী, রোমক ন্যায়দেবী, কাইকেল-বর্ষিত নারীচরিত্রের স্তনস্বর ওঁরা করে যাতে একেছেন—কোন কোন স্থলে নারীমূর্তিকে নান্দিত্য করে আঁকবার হুতিপূর্ণ কাখ্যাও হুগে পাওয়া যায় না (উদাহরণ স্বরূপ লর্ডনের 'ফে চ্যাম্পেট্রে' কিম্বা Fete Champetre, অথবা 'লুন্চন-ও গ্রাস' 'Luncheon on the Grass')। সম্ভবতঃ কথ্যবৃদ্ধের খ্রীষ্টান বাস্তবদের কড় আনুশাসন ভেঙ্গে বদন রেনেসাঁ হুগে অনাবৃত্য নারীগণের সুবাস নুতন করে আনিপুত হল তখনই এল এই বাসভাঙ্গা উচ্ছ্বাসের বাস্তবকড়ি। সে কাইহোক, সে কথা বলিহিলাম—সম-সাময়িক সামাজিক রূপণীর প্রতিরূপিত পশ্চিমের চিত্রকর কেন 'ঐচ্ছ' হিসাবে ভর বকবরণে হতে সেননি। ইমান-গুদন আইক-ওর 'মিওজার্মি ও তার স্ত্রী' থেকে শূদ্র বরে ওয়েডেন-এর 'পোর্ট্রেট অব এ লেডি', লিওনার্দোর 'গিনেভ্রা লেই কেসলী' অথবা 'মোনালিসা', তিশানের 'লা বেলা', এমেরিক আর্নিকককেও ঐ 'ঐচ্ছ' মেনে চলা হয়েছে। ফ্লোরেন্সের 'ম্যাকমোরেলস রোজ' অথবা মানের 'অলিম্পিয়া' প্রকৃতিকে কঠোর লাব না, কার্লস 'রোজ' অথবা 'Victorine Meunier' (অলিম্পিয়ার হুডেল) সামাজিক মর্যাদা-সম্পন্ন্য হুহিলা নন, সর্বজনস্বীকৃত্য হুডেল। বরং লাব, ঐ অলিম্পিত, 'ঐচ্ছ'-র কথন ছিন্ন করত হলে চিত্রকরকে হু-খনি হুবি আঁকতে হুয়বে—একটি ঘোষণা; বহা লাবিত্তির তথাকথিত 'অনাবৃত্য মোনালিসা' অথবা গোহিয়ার 'মাল্য হা নুত'। তুলনায় জরতবর্ষে দেখি, অসংখ্য সমসাময়িক নারীমূর্তি চৈত-বিহারের বহিঃস্থারে উৎকীর্ণ করা হুয়বে—অনিবাহ্যেই লতার সহযর্মিণী, দেখানে রূপণী সগৌরবে স্তনসুগল বিকসিত করে লজাবমান্য। আমি না—সে-হুগে জারতীর আদ্যনারী ও-জনে বিকট-উরসা-হুগে সামাজিক আনুষ্ঠানে ঘোণ দিতেন কি না, অথবা দিল্পী তার কল্পনার ঐ প্রত্যঙ্গ হুপায়িত কজর শৈলিক ও সামাজিক আনুষ্ঠানে লজ করিয়েলেন কি না। এই প্রসঙ্গে আকও লাব ওঁমির বা চৈত-বিহারে হুপায়িত লতার সহযর্মিণীর স্তনস্বর উৎকীর্ণ করা হুগেও, কোথাও তাঁদের নিন্দ্যাপ প্রকট করা হয়নি, যেভাবে লাজিয়েছে মাহেন-লো-ন্যারো নারিক্য, সর্গীর হুজিক্য অথবা মচ্চার হুজিক্য।

পঞ্চম উদাহরণটি সিংহলের গুয়াট্রাচী থেকে সংগৃহীত (চিত্র-১২০)। সিংহল-অঙ্গরী মেমাস্তরাল থেকে পৃথিবীতে পুণ্যবর্ষণ করছে। এ-চিত্রে অলান্তরে প্রভাব অতি লুপ্ত্য বনিও লাব—অলান্তর বর্ষিকাল্য ও স্বভাব্যত জাব-বাক্তর উৎকর্ষ লজ করতে লাজিয়ে সিংহলী-শিল্পী। সংস্কৃত কাব্যে রঞ্জার স্তনকর্ণার প্রকলিত উপমান—স্বর্ঘ্যই 'অভিন্ন প্রভূতি এ-কথ প্রসঙ্গবধি প্রযোজ্য হতে পারে না, তবু সংস্কৃত কবিতা একনে অস্বীকার করা হুয়বে, এ-কথাও করতে পারি না। স্বরং কালিদাস কি হুগে লাজিক্য হুজিক্য বর্ণনার বলেননি 'স্টোত্রকল্পা স্তন্যভার'?

শেষ উদাহরণটি (চিত্র-১২৪) বরবুগ, ভজা থেকে সংগৃহীত। এখানেও কন্যাকাব। মূর্তিটি ঘোষণালা সুকণ্ডার; পারস-লুপ্ত নিরে সে মজল্যপুণ্য সময়সীর দিকে এখিরে চলেছে। তাই এই বিকট-বৌকোর ভিতরেও আমরা বৌহিনীমূর্তি দেখি না, বা দেখি পূর্বে উদাহরণ লিতে। তাই এখানেও স্পর্ষি কন্যাভাব, বা মাতৃভাবেরই হুপান্তর। এবং সে-জন এ মূর্তিটির সঙ্গে জাবের জাকো হুটি উদাহরণের ভিতর একবার লাজ-হুপসীই সহযর্মী। এতক্ষণে আমরা হুগে একটু একটু হুগে পুরহি—সংকলিত হুটি শিল্পসামগ্রীর হুগে

কবিতার যোগসূত্রটো কোবার, কেন ভার্য পশ্চিমবঙ্গের অকুহেল একসারি রমণীর স্বপ্নের নয়।  
পশ্চিমবঙ্গের মাতৃভাষা আছে—অসংখ্য মালেনার, ঘেরী মাতার গুণাবলি। কিন্তু সেখানে  
মাতৃভাষাতে ন্যস্ততার উপর একটি কুসংস্কারের প্রকাশ আছে; মালেনা-মাতৃভাষা মনে  
বিকশিত হলেও তা পুঙ্খ নশপুঙ্খের জন্য, রমণ-অবলম্বনা নয়। ভারতবর্ষে মাতৃভাষাকে  
মলিনতা ভরায় কথা শোনা না—কুমারসন্তানের কনি জই তাঁর নারিক জগদমলিনকে অক্ষম  
সুখের শেষ সীমান্তের পৌছোইতে গেরেয়েলেন।

প্রতীক 'অ্যাপোথোফেনাস'কে মূল খুঁটি করে বহিঃপ্রাণের মাধ্যমেই অন্তঃপ্রাণের চরম প্রকাশের সন্ধান করেছে—শিশু সৈমানে কাকামণী নর, ভীষ্মনন্দনী, অপরূপকে প্রাচ্যদগত শিশু-শাস্ত্রব্যবস্থার মিশ্রণকে মূল খুঁটি করে কলা ও মহাকাব্যের অন্তর্গত কাহিনীকে বিশেষ ভঙ্গিতে প্রতিফলিত করতে চেয়েছে। এখানে শিশু ভাবরঙ্গী, কাকামণী, বাস্তব জীবনমণী নর। শব্দ নির্দেশ কোথাও তার ব্যাধি হয়নি, হৃদয়ে সোপান। সমস্ত প্রাচ্য জগৎ, একই শিশুপ্রত্যয় উদ্ভূত হয়েছিল—যারের ওপরে শিল্পের অন্তঃপ্রাণের অভিসারে তার ব্যাধি। তার তাই একশিলা তপস্বীশা, ছন্দোময়, অপরূপকে আশ্রয়-অট, বরদ্বার—একটিকে নিজে মগ্ন করে জ্ঞান—তার সবাই একই আবেশনময় মেহেহে।

এ পরিচ্ছেদের প্রথমে সৌর-জগতের যে উপমাটা দিচ্ছেন তিনি মিলিটারী-সম্প্রদায়ের  
সেইভাবে বলতে পারি—এ মিলিটারী-সম্প্রদায়ের জয়হুত-কলা-শিল্পের ছবি হচ্ছে সূর্যের সবচেয়ে  
নিম্নতরঙ্গী গ্রহ—বুধ। তখন বুধান, বহুবদর অথবা কপাল সে ভুলান হয়েচে ইন্টারনেট-  
সম্প্রদায়-সমূহ। খিলাফতের মহাচিন্তা সে উপমাটির ভেতরকার বৃহৎপত্র উপমা—আর  
অসম্ভব অসম্ভব এই পৃথিবীর হতে জীবনের অস্তিত্বের সূর্য-প্রদর্শনশক্তি একটি গ্রন্থ।

তিনি, পাঠক এতক্ষণে অটোব' হয়ে অনিবার্য' শেখপ্রশ্নটি মাখিল করবেন : তাহলে ফেরান্দিয়াই সূর্য কে ?

উইলিয়াম জর্জ বার্নার্ড শেল্লিসের কবিতা নিয়ে গঠিত একটি কবিতা-সংগ্রহ।

আশা করি, এতক্ষণে বোধা গেছে যে, বৌদ্ধভাবের অংশীদারদের কেন 'তন্দু' ডান্ডে ঝাঁপিয়ে, মৃত্যুবরণে কেন ওদের চিত্র উজ্জ্বল হয়ে থাকবে, বেন কন্দা ওদের ভঙ্গিতে, ওদের সম্মতিতে। বিভিন্ন দূরের অবস্থানভাগী ওরা সবাই চৈত্র্যপ্রদীপনগত একদল প্রত্যাশিত প্রাণ!

ଆଜିକା଼ର ସମୟ କେନ୍ଦ୍ରାଢ଼ିଗ-ବେଘେ ବା ଗୁରୁତ ବଳୟୁତ ଖାଟେ କିବା ନା? ତାର ସମ୍ବନ୍ଧ  
ନାହିଁବେନି ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି ସ୍ଥାନାନ୍ତରର ଗୁଡ଼ : ସମ୍ପଦ ଶାନ୍ତବ୍ୟ ଗଢ଼ାନ୍ତି। ସମ୍ପଦ ଶାନ୍ତବ୍ୟ ଗଢ଼ାନ୍ତି।

হুত-হুতের ঠেসব জ্ঞানের পথ দেখাতে অজ্ঞতা অনির্বাক-শিখার আর পশুপ্রদীপধারি  
 ছেলে দেখছে। কী সেই পশুপ্রদীপ? কী সেই অজ্ঞতা-নিপতী? হাল প্রতিবেশন? প্রফেসর  
 কর্তৃক বিনিময় এককণ্ঠের আর কতকাল কলঙ্ক-ন-ঘাবন!

আমার মন মানে না। 'অকিন্দক' নিশ্চয়ই দেখিয়েছেন তাঁরা—মহান ভাষিকের প্রিয় ফিরিয়ে দেখিয়েছেন। কিন্তু সে তো মহাকাব্যও দেখিয়েছেন। প্রথমটি 'কালিকা' দেখাননি।

কেনবাস? কিন্তু মহাকাব্যের মূল প্রতিভাবান কি শুধু কীকম-বৈচিত্র্য?  
লক্ষ্যক উল্লী লেখকদের—কিন্তু লেখক লক্ষ্য কি এক নয়? অর্থাৎ  
চরিত্রে অসংখ্য বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়ে কি জাতিগত-কেনবাস শ্রেণ্যনির্দেশ উপস্থাপন সে  
স্বাভাবিক?

४३. असुनर्णी सहस्रा शालिवोक्तं कर्मानेकान निहिदार्थं मयादि ।

বীর্ভিচিচাচেন্ত বিম্বহাসো নঃ চন্ডঃ স নো বম্ভ্যা শক্তো সংবনন্তঃ ॥

—সেই একলাই বহুবান্ধব হয়েছেন, তিনি আদিত্য, মনো এবং অশ্বত্থ আছেন সেই পরমপুত্রের আহ্বানের শব্দবলিতে নিজেও রঞ্জন।

অজন্তার মহাশিল্পীও নানা অলঙ্কারে, নানর আভরণে সাজিয়েছেন তাঁদের মন্দির—  
'ঐকবর্ণা' কী-ভাবে 'বহুবর্ণা' হয়েছেন তা দেখিয়েছেন—কিন্তু লোকের লক্ষ্য এখানেও সেই  
এক। এখানেও তাই অজন্তাশিল্পী পাতলপাত্রে উৎকীর্ণ করেছেন এই মৃত্যুঞ্জয়ী বাণী।

অলঙ্কৃত্যন্তে কুসুমৈর্মহিবৃদ্ধাঃ তরিতৃণশ্চরৈঃ জেরাভিলম্বিতা গথাঃ।

সরাসৌ মতভ্রমণৈঃ স্নেহোৎসাহিগুনৈর্বিবিশবধিগঠৈঃ স্তু বেদিনীঃ॥

অর্থাৎ মহাবৃদ্ধকে অলঙ্কৃত করে কুসুম, মোমস্তবক সুসজ্জিত হর বিদ্যুৎ-মাল্যায়, মত-  
ভ্রমর-পরিবেষ্টিত শতদলই সরোবরকে স্ফুল্লর করে তোলে—তেমনি মেঘধারীর কাছে সংযমই  
হচ্ছে একমাত্র অলঙ্কার। অর্থাৎ,—স নো বৃন্দয়া শতরা সংযমহুঃ!

সেই চিত্রশিল্পীর পর্ব শেষ হলে বিপতকন্যায় প্রথম তাঁর পঞ্চপ্রদীপ তুলে ধরে উজ্জবে  
বেধাবেন পরর সত্তরক। যারা বলে প্রদীপ ধরে সূর্যকে বেধানো যায় না, তারা ভুল বলে।  
জ্বলির রাক্ষু ভগ্নুর মাটির প্রদীপ তুলে ধবেই সূর্য্যবাসিত করতে হয়। অজন্তাশিল্পীর নিরলস  
মাগনা এই সৌর-অপত্যের সেই অবিভাবকেই বেধছেন :

গবাক্ষনির্ম্মহসুর্ভাগিবেদিক্যস্নেহেন্দুকান্যাপ্রতিমাদমালম্বিতম্।

মনোহরাস্তম্ভাঃ .. ... আ চৈত্রমাম্বিরম্।\*

অর্থাৎ "গবাক্ষ-দ্বার-চিত্রশোভিত প্রাচীর, ইন্দ্র-গন্ধর্ব্ব-লিঙ্গর সমান্বিত মনোহর স্তম্ভ  
পরিবেষ্টিত এই গুহানিচয়—এইসব কিছুই গভর্গহের অজন্তরাস্থ সেই মহাকায়ুগিকের  
উশোশো উৎসর্গকৃত।"

এই বাণীই অজন্তার শেষ কথা।

boiRboi.net

\* এই উদ্ভূতিটি যেহেতু গুহানিচয়ের বহিঃস্থ অংশের উৎকীর্ণ একটি খিলারূপের অংশ। কিন্তু  
নির্দিষ্টত মতবাদ্য সত্ত্বতে স্যাদাপ্রতি ভ্রম ; উদ্ভূত অংশ-বস্তু পেরেকের মৌত্র শাঠ্যাকার করা গেছে।

### শেষ প্রায়

অল্পমাত্রাবাসের মেয়াদ আমার শেষ হয়ে এল। বাবার দিন সকালে বসেছিলুম বাগেজট নদীর পারে স্বীকা ইসলামাইলের সঙ্গে। গৃহ-অশিক্ষার দ্বারা তখনও খোদেনি, শব্দে ইরানি ব্যক্তিদের ডাঁড়। কথা প্রসঙ্গে ইসলামাইল সাহেব বলেন—ইরানজাননী বলেছেন, The artist, to enhance the emotional effect of the scenes, has delineated Madri with all the charms of youth and beauty which he could imagine.

শুনে আমি বলেছিলুম—বেশ করি সেটাই একমাত্র কারণ নয়। করুণ কাহিনীটিকে ছন্দগতভাবে করবার উদ্দেশ্যেই শিল্পী মাত্রীকে অপরিপক্ব সুলভী করে চিত্রিত করেননি। সম্ভবতঃ কারণটি আরও গভীরে নিহিত।

তিনি বলেন—কি রকম?

বলি—পালি ভাষা আমি জানি না, কাল রাতে মূল জাতকের আক্ষরিক অনুবাদ পড়ছিলাম। পড়ে আমার মনে হয়েছে, জাতককার বিশালত্বের মহানুভবতা প্রচারে এতই মূখর যে, মাত্রী-চরিত্রটির আতর্গত বৈশিষ্ট্যের কথা বলবার সময় স্বভাবই স্বলম্বিত হয়ে পড়েছেন। মাত্রীর প্রসঙ্গ দেখানে আমি অসুখী আছি।

ইসমাইল সাহেব হেসে বলেন—আপনি এ গল্প আপনার বইয়ে লেখবার সময় নিশ্চয় জাতককারের এ দুটি লক্ষণের কথা ভাবেন।

আমি বলি—কখনো ঠিক হল না, ইসলামাইল সাহেব। জাতককারের কলকৌশলের অভাবের প্রতি ইঙ্গিত করছি না আমি। মহৎ সাহিত্যের যোগ্য এই লক্ষণ। আপনি বাঙলা ভাষা জানেন না, না হলে একটি উদাহরণ দিতুম। যখনই অথবা বাস্তবিক প্রতি সম্পূর্ণ প্রমাণ দ্বারা সত্যও এ-জাতীর অভিজ্ঞতা এনেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। গত যুগের মহাকাব্য উপেক্ষা করুণ হয়ে এ-যুগের মহাকাব্য পরিলেখ্য আর উর্দু-ভাষা চরিত্রের মর্দা মিত্রের দ্বিতীয় লেখনী ধারণ করেছিলেন।

তিনি বলেন—এখানে কি কলতে চাইছেন?

আমি বলতে চাই, জাতককার মাত্রী-চরিত্রটি চিত্রণে যে অবহেলা, যে উপেক্ষা দেখিয়েছেন, তাতে কৃষ্ণ হয়েই অল্পমাত্রার শিল্পী সেই কাব্য-উপেক্ষিতার অসুখ্য অভাবের সময় সৌন্দর্যের পরিপূরকে মিত্রের দ্বিতীয় চরিত্রের মাত্রীর অপ্রাপ্ত মর্দা।

ইসমাইল বলেন—অ হো বুদ্ধলাম, কিন্তু অল্পমাত্রার শিল্পী স্বয়ং যে চরিত্রটির প্রতি অবহেলা করেছেন, উপেক্ষা করেছেন, তার মর্দা আহলে কে মেতাবে?

—কায় কথা কহেন আপনি?

—ভেবে দেখুন। নাসরানী সূত্রের পক্ষে পেরেছে চন্দ্রসরস্বতীকে, মাত্রী ফিরে গেলেছে তার স্মারিতপুস্তকে, সীতলীর স্বপ্ন সার্থক হয়েছে পরজন্মে, মহাভারতের পক্ষে জটিল ধারণা করেছে সে। কল্ম-কল্মান্তরে গোবিন্দও এগিরে গেছেন পুণ্য-পরিভ্রমণের দিকে—সেই কলমে তিনি স্বপ্নের লাত করেছেন, তাঁর মহাপরিনির্বাণ হয়েছে। কিন্তু বাবুজি, আমার প্রশ্নের মতের পরিণতি কি? অল্পমাত্রা গৃহের তাঁকে শেখার দেখেছি কপিলাবস্তুর প্রাণ-ভেদে মনোভাবকে ভিক্ষা দিতে—জেনেছি, তারপর উপেক্ষিত অবহেলিতে রাজকন্যা নিদারুণ অভিমানে গৃহকে পরিত্যাগ করেন পিতার কাছে, তাকে শিখরে দিরেছিলেন পিতৃবন প্রার্থনা করতে। তাঁর সে হোসে আর কিরে আসেনি! তাঁকে মূর্ত্যুত্তর অবস্থার রেখে রাজা শ্রুত্বাশ্রয়ন ঘটে গিয়েছিলেন নাস্রোয়াজনে। বস্তু, তারপর তাঁর কথা কলমে ফুটেছেন শিল্পী। বাবুজি,



আমি মূলতঃ—সুন্দরকে আমি মহামানব হিসেবে চিন্তা করি, কিন্তু আমার ঘোষণা থাকেও কম চিন্তা করি না। অজলতার শিল্পীদের দেখা গেলে আমি বলতাম—গৌতমবৃন্দেব মহানুভবতা প্রচারে তুমি এতই মূর্খ যে, আমার মা-বোনেরা পরিণতি দেখাতে চলে গেলে তুমি!

আমি অথক হয়ে বোধ, বলিরেখাশ্রিত সুন্দর মূর্খ উত্তেজনার লাল হয়ে উঠেছি। জড়াতাড়ি প্রসঙ্গটি পাল্টাবার জন্য আমি বলি—আজ্ঞা, আর একটা প্রশ্ন। ফর্দাপুর গ্রাম তো অজলতা গৃহ থেকে দূর তিন মাইল। এ গ্রামে লোকজনের বাস নিশ্চয়ই তিন-চারশ বছরের। অথচ ওরা জানত না এত কাছের এই গৃহা-শ্মিরগুলির অস্তিত্ব?

মীর্জা ইসমাইল ততক্ষণে সামলে নিজেছেন নিজেকে, বলেন—ওরা জানত না হয়ে নিচ্ছেন কেন?

—জাহলে বাইরের শূনিয়া এতবড় খবরটা জানতে পারল না কেন?

—জানবে কেন? এটাকে তো ওরা মস্ত বড় কোন খবর মনে করত। ওদের বিশ্বাস এ গৃহই স্বাভাবিক। ক্যানিয়াম সাহেব ফর্দাপুর গ্রামে বোধিবৃক্ষ করেছিলেন। গাঁওবুড়ো তাঁকে বলেছিল—ও গৃহের কথা তো আমরা বরাবরই জানি। আমাদের খুড়ো-জাঠা-বাপ-পিতামহী সম্মানিত জানত।

সাহেব কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন—ওই গৃহের মধ্যে অমন সব ছবি কারা এঁকে থেকে জানবার কৌতূহল ছয়নি তোমাদের?

সাহেবের অনীচ্ছাজ্ঞার হেসেছিল গাঁওবুড়ো, বলেছিল—জানব না কেন? সবই তো জানি। ওগুলো তো ছবি নয়, ওগুলোর শিখনে মস্ত এক কাহিনী আছে।

অজলতা গাঁওবুড়ো সাহেবকে শুনিয়েছিল সে ইতিকথা :

অনেক—অনেকদিন আগে—সে ঋতু কুড়ি বছর আগেকার কথা তো বলতে পারব না; কিন্তু তখন আব্বাসের পাখী আর গাছ-পাখত-নদী-তুল, সব মানুষের জাহার কথা বলতে পারত। স্বর্গের দেবদেবীরা স্বর্গবাসের একত্রেমিতে স্নানত হয়ে দেবদেবী ইন্ডের কাছে এসে ধনী দিলেন একদিন, বললেন—প্রভু, একজাতির জন্য আমাদের মর্ত্যে গিরে বনভোজন করে আসবার অনুমতি দিন। ইন্দ্র বলেন—তা বাও, কিন্তু হুঁশিয়ার! মনে রেখ, সকালের আলো ফোটার আগেই, প্রথম পাখীর ডাক শোনার আগেই, সকলকে স্বর্গে ফিরে আসতে হবে। তা না হলে স্বর্গের বরজা ডিকালের জন্য বন্দ হয়ে যাবে কিন্তু। দেবদেবী-গণদেবী-কিন্নর-অপ্সরার বন খুঁপীয়াস হয়ে ওঠে। বলে বলে ওরা হাওয়ার ভেসে ভেসে নেমে এল মর্ত্যে। এই বাগোড় নদীর গৃহাগুলি দেখতে গেলে তারা শ্মির করে, খেয়াল-খুঁশিতে এখানেই কাটিয়ে যাবে একটা পৌষলী ছুটির দিন। ওরা বাগোড়ার নেমে স্নান করে এল। গাছের শূকনো পাতা কুড়িয়ে এনে খিড়ি বানালো। মহা আনন্দে কেটে গেল একটা দিন আর একটা রাত। কিন্তু গৃহের অধিকারে ওরা চলে গেল পূর্ব-আকাশের দিকে নলর স্বপ্নতে। ওদের আদেশে তখন ফর্দা হয়ে এল পূর্ব-আকাশ, জোরে ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করে—ঋণকার গৃহের ভিতর ওরা জানতেও পারল না। শেষ শেষ সবাইকে চমকে দিয়ে দিলে উঠল জোরেই হুঁকড়া। বাস। বন্ধ হয়ে গেল স্বর্গের সোনার বরজা! আটক পড়লো ওরা। যে যেখানে যেখানে ছিলেন বন্দী হয়ে পড়লেন গৃহের বেওয়ালে—কেউ ছবি—কেউ প্রেত পাথর!

কাহিনী শেষ করে মীর্জা ইসমাইল বলেন—কী মূর্খ ছিল ওরা!

আমি বলি—এ গল্প শুনে কিন্তু ওদের মূর্খামির কথাটাই আমার সবচেয়ে মনে পড়ত। আমি ভাবছিলাম—কী সুন্দর উপকথাটি। ভাবছিলাম, যদি ওদের মতো সরল বিশ্বাসে এ কাহিনী মনে নিতে পারতুম।

হুঁ কুণ্ডিত হর ইসমাইল সাহেবের। বলেন—আপনি বিশ্বাস করতে চান এ আব্বাসে গল্প?

ব'ল—ইসমাইল সাহেব, কিংবদন্তি করি এ-কথা তো আমি বলিনি। কিন্তু এই অজ্ঞান-  
‘ছত্রের বংশোদ্ভূত’দের জন্য আশ্রিত-আমি তো অনায়াসে মেনে নিতামি—কলমকার বিশ্রান্তর  
হাতের বাহু দানের সামগ্রী চায়, মেনে নিতামি বোম্বস্ফোরকের সঙ্গে মৃগীর মিলনে জ্বালাপ, পুণ্য  
তখন হতে পারে, স্বীকার করে নিতামি স্বল্পসন্ত হস্তীর অসিত্ব, বিশ্বাস করি  
সুতসাম-ভাতকের অস্ত্রীকরণে কাণ্ডকারখানা। কিংবদন্তীটিকেও যেনে নিলে যদি রসের  
কাণ্ড লাভবান হই, তবে একেই বা স্বীকার করে নেব না কেন?

মনেকক্ষণ ইসমাইল সাহেব কোন জবাব দিলেন না। তারপর দূর-নিরন্তরের দিকে তাকিয়ে  
বসতে থাকেন স্বাভাবিক, তাহলে আপনাকে আমার একটি অভিজ্ঞতার কথা বলি। এ-কথা  
আজও কাউকে বলিনি—জানকুম কেউ বিশ্বাস করবে না। কোনো প্রাচীণ যুগের জ্যোতিষি।  
আপনাকেও আমি এ-গাণ্ডি বিশ্বাস করতে বলছি না—হলে করুন এ-ও এক আশ্রয় গল্প।  
সেইমত একে মেনে নিলে যদি রসের কাণ্ড লাভবান হতে পারেন।

উপলব্ধির বসন্তের নবীন প্রবাহমান স্রোতের দিকে তাকিয়ে অনামনস্কের মতো স্বপ্ন  
মর্ত্যে ইসমাইল অতঃপর বসতে থাকেন তার অভিজ্ঞতার কথা।

এখানে এখন আমি প্রথম চাকরির নিত্রে আসি, তখন আমাব জোখান বাস। জাতিক-  
বাহিনীগণের তখনও জামি না, মেজর পিণ্ড, প্রীতিধ, সেন্তী হেরিহেরমের নামও শুনিনি।  
তিনতুলে আমার কেউ নেই, ফলে একদেই পড়ে থাকতুম সারা বছর। হিন্দুনি গিয়ে আর  
সবলেন মতো আমিও অস্বাভাবিক হস্তচলিত প্রথমটায়। তারপর সহকর্মীদের মধ্যে একে একে  
শ্রমের জাতকের কাহিনীগণের। অস্বাভাবিক চিত্রগুলিকে যে মনে দেবত্ব, এর পর  
খোব অন্য কোনও জীবের দেখতে শব্দ করতুম। ওদের হাসি-কান্না, শব্দ-দৃশ্যের ভাগ নিতে  
শুরু করি সেই সময় থেকেই। প্রতিটি চিত্রের হাতী, বাঘ, হরিণ, রাজহংস, শাম, পাহাড়  
নদী—প্রতিটি অঙ্গুরী, দিগন্ত পশ্চিম—ভাতক-বর্ষিত নরনারীর সাথে আমার মিলতিল হল।  
ওদের ভালবেসে ফেলি রসে। ছোলাফো মেঝেই ছবি আঁকতে ভালো লাগত। সরকারী  
কামের অবকাশে ওদের ছবি আঁকতে শুরু করি। পাতার পরে পাতা, বাতায় পরে বাতায়  
ছবি খেলি ছবিতে। সবই পেনসিল স্কেচ। একটা মানুষের জীবন তো বড় কম নয়, শেষে  
জান কী কথায় উদ্ভূত নতুন ছবি পাই না। ছুরে ছুরে বেকাই নতুন ছবির সম্মানে।

এই সময় এমন একটা ঘটনা ঘটে যা যাওয়া আমি আজও দিতে পারি না। অনেকদিন  
আমেকার কথা, তবু সেদিনটির কথা স্পষ্ট মনে আছে আমার। সেটা ঘোর বর্ষাকাল। সেদিন  
একটিও ঘাটী আসিনি। আমার সহকর্মীরা কেউই আসেনি গৃহ-অগ্নিরে। সকাল থেকে  
বর্ষা হচ্ছে ক্রমাগত। তবু দেশের কোঁকে স্কো-বই কলে আমি এসেছিলাম গৃহায়। হঠাৎ  
প্রচণ্ড বর্ষা শুরু হওয়ায় ছুটিতে ছুটিতে গিয়ে আতর নিলাম দশ নম্বর গৃহ-অগ্নিরে। ঘরে  
আছি তো রসেই আছি বর্ষা ধারার নাম নেই, শেষে ক্রান্ত হার পাখরের মেলেতে শুরু  
পড়ি। এ গৃহায় কোন ছবি নেই। চারদিকের দেওয়াল গুড়ে গুড়ে ছবি আঁকি। পুঁত  
সম্পদ-বহন ঘর নানান জায়গার মানুষ নানান ভাবের প্রেমে জ্বলে-জ্বলে অস্বাভাবিক  
স্বাভাবিক। রসে ছবিতে পড়ি। নিশ্চয় ঘণ্টা সময় ঘনিষ্ঠতাই আমি গৃহ-অগ্নিরে একবারে  
পড়তে কোথা। না, ঘুম ভাঙল কাটা বোধ হয় ঠিক দুপুর। হঠাৎ ঘুম আমার সত্যিই  
ভাঙলি—আমি স্বপ্ন দেখছিলাম যে ঘুম ভেঙে চমকে উঠি বর্ষা। ঘুমের ভিতর স্বপ্নই  
হ'ল, অথবা জাগরণেই হ'ল, কেবলমাত্র আকাশ বেশ পরিষ্কার হার গেছে ইতিমধ্যে—বর্ষার  
জল উপলব্ধির কলমাগিনী বাজিয়ে জনগণি প্রকাশ হ'ল চলেছে। এদিকে সূর্যবাসকের  
পথে বীষ হার গৃহায় প্রবেশ করেছে এক জলক রোদ—পূর্বের দেওয়ালে পড়েছে সেই  
সোনালী আলো। হঠাৎ নাকের পড়ল, আমার সম্মুখে গৃহায় প্রাচীরের মে আসলি অতঃপর  
স্পর্শে উত্তরল হয়ে উঠেছে, সেখানে সমস্ত প্রাচীর গুড়ে একটা বৃহৎরতন চিত্রাঙ্গী।  
সত্যিই হার যাই আমি, —কী অস্বাভাবিক, এ ছবি তো কই আগে কখনও দেখিনি। শব্দ তাই

নয়, রক্ত আর মেথার এমন উজ্জ্বল ছবি তো অদ্বৈতার কোথাও নাকি পড়নি আমার। স্তম্ভবিশ্বের অভিজ্ঞত হয়ে আমি তাকিয়ে দেখতে থাকি সেই চিত্রটিকে, অশ্রুত সেই প্যানেলটি বড় বড় হৃদয়বিশ্বের অস্তর আবাস প্রান্তসজ্জা স্বর্গীয়তার বানী বানীর এলায়িত তবুকে ধরে আছেন রক্তা, গর্শভীর কিলবর সভামণ্ডল। তবুর হবে মেথতে থাকি চিগেদী। আমার চেয়ে যেন পলক পড়ে না। ক্রমে তিল তিল করে অঙ্গলারিত হল অঙ্গনবর্ষের শেষ আলোকরাশি। একবারে নিভে গেল সমুদ্র। সিংহস্ত-জ্যোত্ব অশ্বকায়ে মেটে গেল বাগোড়া উপত্যকা।

ঠিক সেই সময়েই তবুর ভাবটা কেটে গেল আমার। যেন বাস্তবরূপেই 'হুয়ে এলাম ফের। অথবা বলতে পারেন ঠিক তখন স্বাক্ষরশি শেষ হল আমার। মোট কথা, বাহ্যতঃ সম্মুখে সচেতন হওয়ার পরে পড়ল, গৃহের ভিতরটা সম্পূর্ণ অন্ধকারের গর্তে কিলান। গৃহামুখ থেকে বেরিয়ে এসে ঘোঁষ, আকাশে কুটে উঠেছে সম্ভবির চিরন্তন সিজ্ঞাসা। পানে পারে চলে আসি নিজের ভোয়। অজ্ঞার ভাবটা তখনও আছে কিন্তু। বাসার ঘিরে এসেই ফের বার বার স্মেক-বই। গৃহের দেখা ছবিটি তখনও স্পষ্ট মনে আছে আমার। কাজেই সেখান আমার ছবির বাতাস সারায়ত লেগে।

পরদিন সকালে সহকর্মী কক্ষের সোফাটা দেখতে গে বসে—এখন থেকে কি অঙ্গলতা-শটাইলে এমন মন-শব্দ ছবিই আঁকবে?

আমি বলি—মন-শব্দ ছবি নয় ভাই এ ছবি দশ নম্বর গৃহের দেখে এঁকেছি।

কক্ষ হো হো করে হেসে উঠে বলে—মারের কাছে হাসীর গলপ? দশ নম্বর গৃহ আমি চিনি না?

ওর সেই অট্টহাসে যেন অভিজ্ঞান ফিরে আসে আমার। ভাই তো! এ ছবি আমি কাল কেমন করে দেখেছি? বছর দশেক আঁকি অঙ্গলতার—দশ নম্বর যে কোন ছবি নেই তা আমার চেয়ে আর কে বেশী জানে? তাহলে?

তখনই দোজনর দশ নম্বর গৃহের দিকে। কাম্বল? সমস্ত দেওয়াল জুড়ে শব্দ শারি শারি স্বাক্ষর। আঁকিবুঁকি? বেরনগরি, ইংরাজি, মাকটি, কাঁড়ি। আমি কি জাহলে স্বপন ঘোঁষছি কাল? এত স্পষ্ট? বসে গইলুম সেখানে। সমস্ত দিন। সে দিনটি ছিল মেঘমুখ হাস্যকরোদ্ভব। যেন আমার দৃষ্টি দেখে স্বর্গীয়তা গাছের পাতাগুলি কিকর্মিক করে হাসছে। গড়িত কোয়ার ঠিক ভেতনি করে স্বর্গীয়তার পথে বাক্য হয়ে গৃহ-মালিকের প্রবেশ করল অসংসর্গের কোড়হল। কিন্তু যেন আরও দেখে গমকে গেল। যেন সচেতন আমাকে দেখে প্রণামাঘিক সে কর্তব্যবর্ধ করে গেল শব্দ—উদ্ভাসিত হয়ে উঠল পূর্ণপ্রাচীর। তাকিয়ে তাকিয়ে চোখ ধলা কবচে কিন্তু সেই আঁকিবুঁকি ধাঁড় কিছই দেখতে পেলুম না। নিজেই পরদামিতে নিজের উপরেই নিজের হয়ে উঠি ক্রমশঃ। তবু উঠে যেতে পারি না। ক্রমে তিল তিল করে সরে গেল স্বর্গের শেষ আলো। মানবের অস্তিত্বের ক্ষতিই-নাশিত মূহুর্ত পূর্ণপ্রাচীর অশ্বকায়ে বর্ষনিতা টেনে দিল।

মোহগমের মতো ফিরে এলাম অঙ্গলত অঙ্গুর একটি দিন। শব্দ ছবি তবুর বার্ম প্রতীকার কাটিয়ে। পরদিন, তার পরদিন—কিন্তু না, সে চিত্রটি আর দেখতে পেলুম না একবারও। মনকে কোথাই স্বপনই দেখাছিলুম তাহলে।

এই ধারণা নিয়েই শব্দী হয়ে থাকতুম আমি; কিন্তু একটি ঘটনা আবার পুলিশে গেল সব। প্রায় বছরব্যবেক পরের কথা। আঁকি-গাছিকাল অমিল থেকে কড়াসহেব এসেছেন কাল পরিদর্শনে। আমাকে খুব পেনে করতেন; তিনি বলেন—কই ইসমাইল, কি কি নতুন ছবি আঁকলে ইতিমধ্যে? তাঁকে দেখাই আমার স্মেক-বই। সেই ছবিখানি তাঁকে দেখাতেই বলেন—মেজর খিলের চকচক কোয়ার সেলে হে?

আমি বলি—মেজর ছিল কে?

সংসার হেলে বসেনি—হাঁর ছবি দেখে নকল করছে এখান।

আমি অবাক হয়ে বসি—এখান। কিসের ছবি?

—এল নম্বর গৃহ্যার পূর্বপ্রাচীরে বড়লত-জাতকের ছবি। প্রায় একশ বছর আগে এ ছবি অঙ্কন অবস্থার দেখেছিলেন মোক্ষ গির্গ, কর্তা করেছিলেন তিনি। অফিসের আলমারি থেকে একটি প্রাচীন গ্রন্থাবলি বার করে ছবিখানি দেখালেন আমাকে! স্তম্ভিত হয়ে গেলুম আমি! কি অশ্রব! সে ছবি আমি এঁকেছি, হুবহু সেই ছবি।

আমি কাউকে কিছু বলিনি। জানতুম, করলে বেড়ি বিশ্বাস করবে না। অশ্রব চলল। ডাকব, মেজর গির্গের ছবি দেখে নকল করে মিছে কথা করছি আমি। কিন্তু কেমন যেন একটা দেশের গেয়ে বলল আমাকে। মনে হল, অলম্ভা গৃহ্যার এ চিত্রখানি তো শুধু ওর আর থেকেই আঁকা নয়—এ যে লক্ষ-লক্ষশতাব্দের সন্ধানের ফলস্রুতি। বহুশতাব্দীকালের বৌদ্ধ প্রদেশের দল ধর্মবীর্য মধ্যে এদের পেরোঁছিলেন—যাদের লগ্নতে এরা অফিসবর। যাদের লগ্নতে খুঁজলে তাদের দেখা পাওয়া যায়। স্বপ্ন আমি ঘোঁষনি—সেদিন কোন মনে জানি না আমি সন্ধ্যারীর উপলব্ধি হয়েছিল। সহস্রাব্দের ওপরে কোন একটি কালে। কতকটি শব্দ—মহাস্থবর হল। আমার ঐক্যনামের সত্য উপলব্ধি হতে পেরেছিলাম সেই অতীত যুগে—প্রত্যক্ষ করেছিলাম ঐ ওরোদের সম্মুখীন সত্য-সমাপ্ত সেই বড়লত-জাতকের চিত্রটিকে! ধর্ম আমি মুসলমান—মুর্তিপূজার আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু গোঁড়মুগ্ধ যে একজন মহামানব ছিলেন, একথা জেনে যানি। আন্তরিক শ্রদ্ধা করি অলম্ভার নিশ্চিন্দে। শিল্পীর কি জ্ঞাত আছে: বিহীন বলি কি আমাকে কৃপা করা হবে না?

তাই যদি হবে, তাহলে সেই অস্তব্ধ-উজ্জলিত শাখা মূর্তির সহস্রাব্দের বর্নিকল কেন সরে গেল আমার দৃষ্টির সামনে থেকে?

অস্বস্ত এক প্রগল্ভামিতে গেয়ে বলল আমাকে। যতটা পর যতটা আমি বসে থাকি শূন্য দেওয়ালের শিক জাকিয়ে। মনে মনে বলতুম—হে অলম্ভাশক্তি, তুমি আমার দৃষ্টির সামনে থেকে সরিয়ে নাও এই মহাকাশের বর্নিকা, আমাকে দেখতে নাও সেই হাজার বছর আগেকার উল-সম্ভার। সহস্রাব্দের কতকিছ-ল্যাক্ষিত এ ধূসরালেশের নয়, আমাকে দেখাও রক্ত ও রেখার সম্মুখীন সেই সত্য-সমাপ্ত চিত্রখানী। এই সময়েই বৌদ্ধ শাস্ত্রখানি গোপন করে পড়তে শুরু করি। মিস্টারিসম্ সন্দেহে বেগানে থাকিছ, লেখা হয়েছে খুলে পড়ি। কুণ্ডিতশাখা পল্লবিত এই সময়ে পড়ি। রাত্রি বই পড়ি, আর দিনের বেলা বসে থাকি শূন্য প্রাচীরের নিচে থাকতে। দিন আসে, দিন যায়—কিন্তু আর একটি দিনের তরেও এমন কোন ঘটনা ঘটে না। আহা নাই, নিত্যা নাই, পরীরের প্রতি বর নাই—পাখিরের মতো আমি বসে হয়ে রইলুম আমার সাহাবর। সহকর্মীরা এই সময়েই ঘরে নিল আমার মস্তিষ্কবিকৃতি করেছি।

জানি এ আমার শাখাখানি, তবু একদিন মনে হল কুল রাজকুমারীর চিত্রিত যেন অতি শূন্য কিছু পরিবর্তন হয়েছে। যেন কেউ আমার অলম্ভা ওর ওড়াপ্রান্তে, চোখের কোণে পুঁকটো খুলির শূন্য ঠান দিয়ে গেছে। বিরাহী কুল রাজকুমারীকে এতদিন দেখেছি বিবাদের প্রতিমারূপে—এখন মনে হল, তার দৃষ্টিতে লেগেছে কোঁকড়ের চিহ্ন, ওঁড়প্রান্তে যেন ফুটে উঠেছে অশ্রু হানারেখা। ও যেন এতদিনে একজন ভ্রান্তির খুঁজে পেয়েছে। সেই হোসরও যেন এই অশ্রুহারা ওরই মতো কিসের প্রতীকারপ্রার্থী হয়ে চলেছে।

সহকর্মী বলছে বসি—কুল রাজকুমারীর আলোকে কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করছে ইতিমধ্যে?

বসু রাগ করে ছব—হ্যাঁ। রাজকুমারী নয়, রাজকুমারের। তাঁর মস্তিষ্কবিকৃতির লক্ষণ দেখা দিয়েছে।

তারপর আর একদিন। সেদিনও আকাশ জড়ু মেঘের পাহাড়ী বর্ষা। বাড়ীরা কেউ আসেনি। সহকর্মীরা কেউ কার হারনি ঘর ছেড়ে। পূর্বপ্রান্তে আমার জন্ম হয়েছিল, তবু

নেপথ্য থেকে আমি এসে হাজির হলাম গৃহ-আশ্রয়ে। প্রথম গৃহাচিহ্নে শোঁছাতেই ভ্রান্ত হয়ে পড়ি একেবারে। ছুটির দিন, বাক্য নেই। ঘরে বসে আভা দেওয়ার চেয়ে এই নিরানন্দ গৃহাই আমার ভালো। দেখছি ভার্যাকে চেয়ে চেয়ে—বৃষ্ণের প্রলোভন চিত্র, বোঁসিত পদ্মপাণি চন্দ্রোদয়-জাতক, সুবন্দন কতকল—দেখলেই চেয়ে কুল রাজকুমারীর দিকেও। যে যেমন ছিল সে তেমনই আছে—ভোঁরের কুঁকড়া থেকে ওঠার কবী হয়ে পড়েছে সবাই। দেখে দেখে মৃৎকণ হয়ে গেছে ছাঁকুড়ো—শব্দে ঐ কুল রাজকুমারীর ওষ্ঠপ্রান্তে যেন যেন হর এসে লেগেছে অতি কণি একটি কৌতুকের অভাস। না, ওষ্ঠ-প্রান্তেও নয়—মোঁসী-নিবন্ধ দু'খনি প্রাপ্ত।

কখন আমিও পড়েছি বেজাল নেই। ঘুম জড়ল যখন তখন গভীর রাত। বাহিরের বর্ষণ খেমে গেছে, ছোঁড় মেঘের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে শব্দের স্বদেশীর চাঁদ। জ্যোৎস্নার জেসে যাচ্ছে বাগোড়া উপত্যকা। অত্যন্ত দুর্বল লাগছে শরীর। উঠে বসব এমন শক্তি নেই। শির কণি, ছাঁকি রাতটুকু এখানেই কাটিয়ে দেব। আবার আমিও পড়ি আমি।

এই পর্যন্ত কল মীর্জা ইসলামইল আমলেন।

আমি বলি—আরপর?

—কলি; কিন্তু কিভাবে বললে আপনাকে যেকোন পাত্র তা বুঝে উঠতে পারছি না। আমি অপেক্ষা করতে থাকি। একটু চুপ করে থেকে বললেন—না, স্থানই দেখেছিলুম। আবার উনি চুপ করে যেতে বলি—কি স্থান?

আমার প্রশ্ন ঠর কানে গেল না। গৃহের শব্দে ভুলে নিয়ে যের বলাতে থাকেন—সমস্ত দিন এ গৃহের বসে বসে শেরছি ছিছে—হাটির সঙ্গে মেশানো বন-ভুলশী আর ঘোঁরাফুলের গন্ধ। মনে হল, এবার যেন তার সঙ্গে এসে মিশেছে শব্দ-বৃন্দে—অমৃত-চন্দনের সৌগন্দ্য। মনে হল, দশ মন্ডর গৃহের দিক থেকে ডেসে আসছে একটি কণি সমবেত কণ্ঠের প্রার্থনা সুপাতি। বেশ বুঝতে পারছি প্রবল ক্লম এসেছে আমার। মাথাটা অত্যন্ত ভার, সর্বাপেক্ষা বেদনা—কিন্তু সে বোধকে অতিক্রম করে অনুভব করছি কী যেন একটি অশ্রুত স্থাপত্যের ঘটে আমার। স্বরতন্ত্র ভূমিশালায় এ যেহিঁ তারস করে আমি যেন অতীতের যুগে নিয়ে চলেছি উদ্ভ্রান্ত পথিকের মতো। ধীরে ধীরে চোখ মেলে বসি।

গৃহের ভিতর দীপাধারে প্রদীপ জ্বলছে। তারই আলোর প্রতিফলিত হারেই গৃহাচিহ্ন-গুহি। সেগুহির দিকে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম আমি। সব যেন বললে গেছে। কী আশ্চর্য! সব চিত্রই শিখর, নিপ্রাণ, আল—কিন্তু তারা যেন পূর্বে মূহুর্তেই সব সচল ছিল। যেন, আমি স্বতন্ত্রা গৃহাধিকায় ভরতুল এরা সজীব হয়ে পড়েছিল, যে মূহুর্তটিকে চেয়ে মেলে তাকিয়েছি আমি, অমনি যে যেমন ছিল আবার শির হয়ে গেছে। বৃষ্ণের প্রলোভন চিত্রে দেখছি—হাতির তিন কন্যা লঙ্কার মূখ লুকিয়ে ফিরে যাচ্ছে—শিবি-জাতকে মহারাজ শিবি ভুলান্দুটি নামিয়ে রেখেছেন ভূতলে, প্রণাম করছেন তিনি হৃদয়েশী খাঁজলক। কণ্ডলয়ের শব্দদ্বন্দ্ব শব্দ হয়েছে, আবার খোস মেলাজে গায়ে-গায়ে শব্দে আছে ওর স্তম্ভলবণ। আমার ঠিক সম্মুখে সেই কুল রাজকুমারীর কণিকা, চিঁটি—কিন্তু তার সম্মুখবর্তনী সেই অর্ধা-এলা-হাতে সহচরীটি অতীতের কণিকা, সেখান থেকে এক রাজপুত্রের চিত্র। তার মাথার হাঁস-পায়-পোষাফের মূহুর্ত, তার কণ্ঠে মূহুর্ত শব্দস্বরী। কুল রাজকুমারীর মূহুর্ত আর কিশোরীয়ে নর, পরমপ্রস্তুত আনন্দে প্রোম্বল; তাঁর দু'খনি আর মোঁসী-নিবন্ধ নর, কলোচ্ছ্ব তিনি তাকিয়ে আসেন ঐ রাজপুত্রের দিকে। রাজপুত্রের মূহুর্তিত মনে হল আমার অজান্তে পরিচিত। কোন গৃহের কোন প্রাচীরের কোন মূহুর্তিত সপে তার সাদৃশ্য আছে মনে করতে পারছি না, অতঃ মনে হচ্ছে এ আমার অজান্তে মোঁ, অজান্তে পরিচিত।

হঠাৎ অনুভব কণি গৃহের আমি একা নই। গৃহের অপরপ্রান্তে কে একজন আমার দিকে

শিখন ফিরে কীল ধাঁপালোকে কি করছেন। এগিরে গেলুম তার দিকে। লম্বা কিছুই দেখতে পেলুম না, তবু মনে হল, আমার দিকে শিখন ফিরে দেওয়ালে ছুঁলির টান দিচ্ছিলেন তিনি তাঁর পাঁজরানে গৈরিক কাষায়, তাঁর মস্তক হৃদিত, তাঁর মেহ থেকে বেনে একটা অশ্রুধীর জ্যোতিঃ বের হচ্ছে।

পদশব্দে বেনে তিনি শিখন ফিরে তরালেন, বেনে ধ্যানভঙ্গ হল তাঁর। কহরত-গোলা বাঁটি থেকে খানিকটা তরল রক্ত পড়ে জেল মাটিতে।

আমি সান্ট্রোপো প্রণাম করলুম তাঁকে। নীরবে তিনি বেনে একটি হাত বাড়িয়ে দিলেন আমার মাথার উপর, আশীর্বাদের ভঙ্গিতে।

বলি—প্রভু, আপনাকে চিনেছি। আপনাকে প্রণাম।

শ্মিত হাসলেন তিনি।

কি জানি কেন তাঁকে চেয়েই আমার মনের মধ্যে জেগে উঠল সেই বিক্ষুব্ধ প্রশ্নটা। বললুম—আপনি আমাকে বর্ণন দিয়ে কৃতার্থ করেছেন। হৃদয়টা মার্জনা করবেন প্রভু, তবু কল, আপনার বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ আছে।

শব্দ সমাহিত হৃদিতে কৌতুহল ছুটে গঠে।

আমি কলতে থাকি—সকলের পরিপাতি আপনি ঘেঁষেছেন, কিন্তু আমার মশাবারা মায়ের শেষ কথাটা বজতেই বা কেন ছুল হল আপনার? এমন মহিমময়ী মাতৃমর্তির উপসহারে নেই কেন অকল্যায়? তিনি কি ক্ষোভে গৃহে আচ্ছন্নতা করেছিলেন? তাই যদি করে থাকেন তা সে-কথাই বা কল গেলেন না কেন আপনি?

একটি হাত সম্মুখে প্রসারিত করে দিয়ে তিনি আমাকে ধামতে কললেন। কলত হলুম আমি। তাঁনি উঠে বাড়লেন, হাতের ইঙ্গিতে তিনি আমাকে অশেষ করলেন তাঁকে অনুসরণ করত। বাড়ির উত্তাপে আমার সর্বাঙ্গ পড়ে বসে, তবু অসীম আগ্রহে আমি টলুতে টলুতে বেরিয়ে এলাম তাঁর পিছনে শিখন। কাঁহরে তখন আবার কিঁরি কিঁরি বৃষ্টি নেমেছে। কত কালমায় ঢেকে গেছে দিক দিগন্ত। আগন্তবী পল্লববর্ষকে আমি দেখতে পাচ্ছি না—তবু পদশব্দ লক্ষ্য করে মনমুগ্ধের গড়ে তাঁকে অনুসরণ করে লেগি। মনে হচ্ছে কত মহাপ্রাপ্তর, নবনগী অতিক্রম করে হৃদ-হৃদ্যন্তর ধরে চলছি আমরা দুজন। বেনে সে চলার আর শেষ নেই।

সহসা আগন্তবী বৌদ্ধ প্রথম স্তম্ভ হলেন। আমিও বাড়িরে পড়ি। এ কোথায় এসেছি? সহসা আকাশ বিদীর্ণ করে বিবৃৎ চমক দিল, সেই অশ্রুজার আলোর দেখলুম আমরা এসে বাড়িরে আছি উনবিংশত গৃহ্য-হালিরের প্রবেশদ্বারে। কিলুতের আলোর দেখলুম অন্যরে বাড়িরে কছেন হুহাশিপা—তিনি তাঁর বক্ষিগলস্ত প্রসারিত করে প্রবেশ-কোরণের একটি বিশেষ স্থান নির্দেশ করলেন। কী আছে ওখানে? পারে পারে আমি এগিরে গেলুম সৌন্দিক; কিন্তু ঘন মেঘে আঁধার হয়ে গেছে দিক দিগন্ত। নীরব অলকালে কিছুই দেখা যায় না। ঠিক তখনই লম্বা বজ্রপাত হল কোথাও। আমি সজোহী হুয়ে বাড়িরে পড়ি পাকান বেনেতে। হীর্জা ইসমাইল আবার ধামলেন।

আমি বলি—তারপর?

—তারপর আর কিছু নেই। বশুদের কাছে শুনেনি সজোহী অলকায় পরদিন সকালে তারা আমাকে আবিষ্কার করেছিল উনিশ নম্বর গৃহার সামনে। একথা জেনেছিলাম দু' মাস পবে, আওকপাবাস হাসপাতালে। ডকল নিহুনিরা হয়েছিল আমার। বাঁচি এ আশা ছিল না।

বলি—অনুভূত গল্প জো?

ইসমাইল কলন—হ্যাঁ, নিছক কাষাড়ে গল্প। কিন্তু কাষাডি, ক্বাশপুরের গাঁওজোর মতো যদি আমি বলি, এ কোন গল্প নয়, এ আমার জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা?

আমি জড়োভাতি সামনে নিজে বলি—সে তো কেটেই। আপনি মতাই স্বপ্ন দেখেছিলেন সে রাতে ; তাহা বলব স্বপ্নটো বড় অশুভ!

—কিন্তু পরদিন অমাকে ওরা অতদূরে ঐ উনিশ নম্বরের সামনে দেখতে গেল কি করে? সেটা তো আর স্বপ্ন নয়?

—সেটা কিছু অসম্ভব নয়। হৃদয়ের ঘোরে মানুষের এরকম অনেকদূর হেঁটে যাওয়ার নজির আছে। ডাকে বলে—

বাঘা দিলে উনি কলেন—জানি, সোকরাহ্‌বলিসহ্‌।

মর্যাদাপূর্ণ বিদায় জানাতে গেলুম ইসমাইল সাহেবকে।

হেসে উনি বলেন, বাবা, গল্পটা আমার শেখ হয়েছিল, বাকি ছিল সামান্য উপসংহার। কিন্তু তা আমি বলব না। স্বয়ং এটুকু কাব, সূক্ষ্ম হলে আমি আবার এসে দাঁড়িয়েছিলুম সেই উনিশ নম্বর গৃহের প্রবেশপথে। কী দেখতে চেয়েছিলেন সেই মহান অজন্মত শিল্পী? নির্দেশিত মূর্তিটি খুঁজে পেতে কষ্ট হরনি জমার। স্বপ্নই কলেন, অব গল্পই কলেন, আমার এতদিনের সমস্যার সমাধান খুঁজে পেয়েছিলেন ঠিকই।

কোভ্‌হলী হয়ে বলি—কী দেখেছিলেন কলেন তো?

উনি লজ্জা দিলেন না। স্বত্বকরে ক্রান্তির করে স্বপ্ন ইসমাইল ধীরে ধীরে চলে গেলেন। নিতান্ত খেয়ালী মানুষ।

আমিও হুঁহুনিতে চলে আসি উনিশ নম্বর গৃহের প্রবেশপথে। নির্দেশিত মূর্তিটি খুঁজে বার করতে আমারও অসুবিধা হল না। প্রবেশপথের জনদিকে (চিত্র-৭১-র বামপ্রান্তের আঁকা মূর্তিটি) দেখলুম সেই রিলিফ কাজ। বৃক্ষদেব-গোপা ও গ্রাহুল। আশ্চর্য, এ মূর্তিটির যে বিশেষ ব্যঙ্গনা ছাড়া আরে আরে লক্ষ্য করিনি!

পরিকল্পনা ঠিক সেই সপ্তদশ গৃহের বিম্ব-বন্দিত ত্রৈলোক্যটির (চিত্র-৫৭) অন্দরস্থ। প্রভেদ এই যে, সেটি প্রাচীণীকৃত, এটি পাথরের রিলিফ কাজ। আরও সামান্য একটি প্রভেদ আছে—সে পার্থক্য এত ক্ষীণ যে মীর্জা ইসমাইল সাহেবের রহস্য-ধন ইপিগনটিক্‌ না জানা থাকলে নজরেই পড়ত না। মহাভিকুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন কেশধরা অর রাহুল। ইতিপূর্বে দেখেছিলেন মা কেশধরার অন্তরের শিখা-স্বন্দ, বৃত্ত হয়েছিল তাঁর দুটি হাতের কারাপট্টের মূহুর (চিত্র-৫৮)। এবার দেখছি, সন্তান সম্বন্ধে জননী'র মনে আর কোন শিখা-স্বন্দ নেই। রাহুলকে তিনি আর স্পর্শ করে নেই। তাঁর দুটি হাত বৃত্ত হলেছে নমস্কারের ভঙ্গিতে। গোভমবৃক্ষ তাঁর কাছে অর গৃহভাগী যুবরাজ নন—তিনি মহা-কারুণিক, মহালজ্জ। এবার বান পাতলে শুনতে পাব ভিক্‌সীর প্রাণনিষেধ—“মহাকারুণিকো নাথো হিভার সম্বর্ণাধিন পুত্রঃ পাতমী সন্ধ্যা পুত্রো সন্ধ্যাধিমুত্তমঃ”

মা কেশধরার হাতে এবার দেখছি একটি সন্ন্যাসবৃত্ত। ভিক্‌সী হয়েছেন তিনি।

মন্ডের উপরে ধর্মের একটি নিদান। সন্ন্যাসবৃত্তের পর্বে' ত্রিশূলোক্তি তিনটি ফুলক। না, ঠিক ত্রিশূল নয়। বৌদ্ধ ধর্মাবিশ্বাসে একে বলে ত্রিভুজ। স্বতঃ মীলোভাসের দিকে নির্দেশ করে ত্রিশূলের তিনটি ফলা জালির দিকে সিদ্ধার্থ-নারা বোধসত্ত্বার জীবনিক উপসংহার—বৃক্ষ শরণ গচ্ছামি, ধর্মঃ শরণ গচ্ছামি, সন্ধ্যা শরণ গচ্ছামি।

ফোর পথে ভাবিয়েলুম অজন্মতার অনেক-কিছুই দেখা হল, আবার অনেক-কিছুই রইল অজানা-অদেখা। মীর্জা ইসমাইলের দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন স্বপ্নে ; কিন্তু আরহত মনে এ স্বপ্নটি মনে যে প্রাণটি জেগেছে তার জীবন আমি খুঁজে পাইনি। কোন জিহ্মি প্রসে বৃক্ষ মীর্জা ইসমাইল পড়ে যাচ্ছে এই অজন্মতগৃহের। পাগলা মেয়েগুলির মতো আঁচা পড়ছেন পাথরের উত্তাপে হেসে। সে কি ঐ বদাগসা কৃষ্ণ অঙ্গনা? সে কি লিলা, সূমনা, নগকলা ইরানভাতি, প্রসাদনরতা স্বাক্ষরতা, নিরাপত্তা

মনোবিশ্বাসী, অনিন্দ্যকান্টিত মাত্রী, মরণহতা জনপলকন্যাসী? না কি সে ঐ প্রারম্ভে-আগরা কুলা রাজকুমারী? কুলা অঙ্গরাজকে দেখিবে তিনি কয়েছিলেন—মোহমরী, মনালসা; মাত্রীর প্রসঙ্গে অনুজ্ঞা করেছিলেন আমার গ্রন্থে কেন আতঙ্ককারের অবহেলায় প্রতিকার করি; স্বীকৃতির কথার জ্বলিরাছিলেন—রূপ ছিল ঐ মনোভাষিনীর অতিশয়। কিন্তু প্রতীকারতা কুলা রাজকুমারীর প্রসঙ্গে তিনি কিছু কয়েছিলেন কি? জ্বরের ঘোরে তিনি ঐ কুলা রাজকুমারীর সঙ্গমে দেখেছিলেন একটি রাজকুমারকে। কয়েছিলেন, রাজপুত্রের মৃৎকৃতি ঐ অতি পরিচিত মনে হয়েছিল। কিন্তু কোন্ প্রাচীরের কোন্ চিত্রটির সঙ্গে রাজপুত্রের সাদৃশ্য আছে তা তিনি মনে করতে পারেননি। যে কথাটা তিনি স্বীকার করেননি সেটা কি এই যে, ঐ রাজপুত্রের অতি-পরিচিত মৃৎকৃতি ঐ অজন্মজন্মহার কোন প্রাচীরে লেখেননি, দেখেছেন লক্ষণে? জানি না।

অজন্মতার অনেক-কিছুই অজ্ঞে, অজ্ঞাত, রহস্যময়। এতদ্ব্যতীত অজানা করে গেল অজ্ঞার কাছে। তা থাক। তবু তৃপ্ত আমি। এ করটি দিন অজানা অজেনা অতীত হৃৎকের বৌদ্ধ প্রাণের সঙ্গে হাসি-অশ্রুর এ মহানন্দমে হেসেছি আর কয়েছি। রসের অতলসদৃশে অবগাহনন্দন করেছি পরমানন্দে। যাবার বেলায় তাই বৃশী মনেই বলে দাব—

এই ভালো অজ্ঞ এ নগমে কায়ারসির গণ্য মনুনার  
চোঁ খেরেছি, চুব মিরেছি, খট জেরেছি, নিরেছি নিগার।

হে অজন্ম অশ্রুশ্রু! তোমাকে প্রণাম।

4237



boiRboi.net